স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী

সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এম. এ., ডি. ফিল.

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

SMRITI SHASTRE BANGALEE

(Contributions of Bengalee Scholars to Smrti Śastra)

By Dr. Suresh Chandra Bandyopadhyaya

Price Rs. 7·50 only

প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ : পৌষ, ১৩৬৭

মূল্য : টা. ৭·৫০ (সাত টাকা পঞ্চাশ ন.প.) মাত্র

প্রচ্ছদপট : শ্রীতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর
শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন সরকার
এম্‌এস্‌ প্রেস
৮৬।৩৮বি, রফি আহ্‌মেদ কিদোয়াই রোড, কলিকাতা—১৩

পরিচয়

যে উদ্দেশ্যে বর্তমান গ্রন্থটি রচিত, তাহা গ্রন্থকার স্নেহাস্পদ ডক্টর সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই ভূমিকায় বিবৃত করিয়াছেন। যাহা লিখিবার উদ্দেশ্য ও যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার দ্বারাই প্রত্যেক রচনা আপন পরিচয় আপনি বহন করে, অন্যের দ্বারা পরিচয় বাহুল্যমাত্র। তথাপি বাঙালী পাঠকের নিকট ইহাকে পরিচিত করিতে সাহসী হইয়াছি, তাহার কারণ এরূপ নির্ভরযোগ্য রচনার প্রয়োজন ও মূল্য আছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

যোগ্যতা, অনুরাগ ও অধ্যবসায়ের সহিত বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধের আলোচনায় গ্রন্থকার বহুকাল ব্যাপৃত আছেন। এরূপ ব্যাপক ও গভীর ভাবে আর কেহ আলোচনা বা তৎসম্বন্ধে পুস্তকরচনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। সংস্কৃতে লিখিত মূলগ্রন্থগুলির অধিকাংশ দুরূহ ও সাধারণ পাঠকের অজ্ঞাত, অনেকগুলি মুদ্রিত হয় নাই, তাহাদের পুঁথি বাংলাদেশেও দুষ্প্রাপ্য। গ্রন্থকার তাঁহার একাগ্র অনুশীলন ও অনুসন্ধানের ফল এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সহজবোধ্য গ্রন্থে যেরূপ আধুনিক পদ্ধতিতে বিবৃত করিয়াছেন, আশা করি তাহার যথাযোগ্য আদর হইবে। নব্যন্যায় সম্বন্ধে চর্চা হইয়াছে ও পুস্তক লিখিত হইয়াছে, কিন্তু নব্যস্মৃতির এরূপ বিশদ ও বিস্তৃত আলোচনা এ পর্যন্ত হয় নাই।

প্রথমে বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও ঐতিহাসিক পটভূমিকার আভাস দিয়া গ্রন্থকার স্মৃতিনিবন্ধের বিষয়বস্তুর আলোচনা করিয়াছেন। আচার, সংস্কার, প্রায়শ্চিত্ত, ব্যবহার, দায়ভাগ ও উত্তরাধিকার এইরূপ শীর্ষক বিভাগে ইহা বিন্যস্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে অধিকতর কৌতূহলজনক বলিয়া বিবাহ ও শ্রাদ্ধের বিবরণ বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর নিবন্ধের তাৎপর্য অবলম্বন করিয়া তৎকালীন

সমাজের চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। কতকগুলি মূল্যবান্ পরিশিষ্টে নিবন্ধকারদের গ্রন্থ ও পরিচয়, শব্দকোষ, গ্রন্থপঞ্জী ও নামসূচী বিস্তৃতভাবেই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

গ্রন্থকার আলোচ্য বিষয়ের প্রায় সকল দিকেরই বিবরণ দিয়াছেন। বাংলা ভাষায় লিখিত হওয়াতে কেবল সাধারণ বাঙালী পাঠকের নয়, সুলিখিত গ্রন্থটি টোলের ছাত্রদেরও উপকারে লাগিবে।

সকলে সকল বিষয়ে যে গ্রন্থকারের সহিত একমত হইবেন তাহা বলা যায় না। গ্রন্থের দোষগুণের বিচার এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের উদ্দেশ্য নয়, সে দায়িত্ব বিশেষজ্ঞের। আমি শুধু এইটুকু বলিয়া ক্ষান্ত হইব যে, বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধের মূল কথাগুলি বাঙালী পাঠকের গোচর করিবার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, এবং সে প্রয়োজন বর্তমান মূল্যবান্ গ্রন্থের দ্বারা সিদ্ধ হইবে বলিয়া আমি মনে করি।

কলিকাতা, ২৬।১।৫৮ ইং

শ্রীসুশীলকুমার দে

ভূমিকা

বাঙালীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মধ্যযুগীয় বাংলাদেশের কীর্তিস্তম্ভ তিনটি —নব্যন্যায়, নব্যস্মৃতি ও তন্ত্র। বহু কুশাগ্রবুদ্ধি নৈয়ায়িক তখন এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে রঘুনাথ শিরোমণি অগ্রগণ্য। বঙ্গীয় নব্যস্মৃতির সূত্রপাত খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতকেই হইয়াছিল; কিন্তু, ষোড়শ শতকে রঘুনন্দনের হস্তে এই শাস্ত্র পরিপূর্ণ রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

নব্যন্যায়ে বাঙালীর কীর্তি সম্বন্ধে ইতিহাস প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু, নব্যস্মৃতি ও তন্ত্র সম্বন্ধে মাসিক পত্রাদিতে প্রবন্ধাদি ব্যতীত আর কিছুই নাই। ঐ সকল প্রবন্ধ এই দুইটি শাস্ত্রের বিশেষ কোন দিকের আলোচনায় সীমায়িত। তাহা ছাড়া, কতিপয় উৎসাহী ব্যক্তি ভিন্ন উহাদের সন্ধান কেহ রাখে না।

নব্যস্মৃতির যে শাস্ত্রহিসাবেই শুধু মূল্য আছে, তাহা নহে। ইহার ঐতিহাসিক মূল্যও যথেষ্ট। হিন্দু সমাজে উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, ব্রত, পূজা প্রভৃতি যে সকল সংস্কার ও অনুষ্ঠানাদি নিত্যপ্রচলিত, উহাদের সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে স্মৃতিনিবন্ধগুলির আলোচনা অপরিহার্য। বর্তমানে ভারতে তথা বঙ্গদেশে সামাজিক রীতিনীতি তরল অবস্থায় বিদ্যমান। যাঁহারা শাস্ত্র মানেন না বা যাঁহারা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং আচার অনুষ্ঠান আঁকড়াইয়া থাকাকে অগ্রগতির পরিপন্থী মনে করেন, তাঁহারা সকলেই যে একরূপ নিয়মাবলী পালন করেন, তাহা নহে। যাঁহারা গোঁড়া, তাঁহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। যাঁহারা মধ্যপন্থা অনুসরণ করেন, তাঁহারা কিরূপে হিন্দুসমাজের বর্তমান কালোপযোগী সংস্কারাদি করিয়া সমাজের সংহতি বজায় রাখা যায়, সেই চিন্তায় আকুল। এই প্রসঙ্গে ডঃ রাধাকৃষ্ণণের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :—

We are to-day in the midst of a Hindu renaissance, wailing for a new Smṛti which will emphasise the essentials of the Hindu spirit and effect changes in its forms so as to make them relevant to the changing conditions of India and the world.

হিন্দুসমাজের এই নবজাগরণের যুগে সমাজ-সংস্কারক চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেই উক্ত দার্শনিকের সঙ্গে একমত হইবেন। তিনি যে-সংস্কারের কথা বলিয়াছেন, তাহা করিতে হইলে সমাজে প্রচলিত রীতিনীতির শুধু বহিরাবরণ দেখিলেই চলিবে না, উহাদের আন্তর তাৎপর্যও উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহার জন্য আবশ্যক স্মৃতিশাস্ত্রের, বিশেষতঃ আঞ্চলিক স্মৃতিনিবন্ধ-সমূহের, যথাযথ আলোচনা।

স্মৃতিশাস্ত্র যে অচলায়তন নহে, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আঞ্চলিক স্মৃতিনিবন্ধ-সমূহের উৎপত্তি। প্রাচীনস্মৃতির অনুশাসনগুলি যদি অবিকৃতভাবেই ভারতের সর্বস্থানে সর্বকালে পালিত হইত, তাহা হইলে নব্যস্মৃতির বঙ্গীয়, মৈথিল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইত না।

বর্তমান গ্রন্থে বাংলা দেশে স্মৃতিচর্চার ধারাবাহিক একটি বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে এই দেশে নব্যস্মৃতির উদ্ভব ও পরিপুষ্টি হইয়াছিল, তাহাও আলোচনা করা হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রে আলোচিত বিষয় বহুবিধ ও জটিল। উহাদের মধ্যে যে সকল বিষয়ে পাঠকসাধারণের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক এবং যেগুলি সামাজিক রীতিনীতির বিবর্তনধারার অনুসরণে সহায়ক, সেই বিষয়গুলি সম্বন্ধে বঙ্গীয় নিবন্ধকারগণের মতামত পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপনের প্রয়াস করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বঙ্গীয় নব্যস্মৃতিতে পুরাণ ও তন্ত্রের প্রভাব আলোচনা করা হইয়াছে। পরিশেষে স্মৃতিনিবন্ধে প্রতিফলিত সমাজের রূপরেখা অঙ্কিত করা হইয়াছে। প্রয়োজনবোধে বর্তমান গ্রন্থের সহিত কয়েকটি পরিশিষ্ট

সংযোজিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটিতে বঙ্গের বিস্মৃত নিবন্ধকারগণের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গীয় ও মৈথিল স্মৃতির পরস্পর সংযোগ ঘনিষ্ঠ; এই দুই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ একটি পরিশিষ্টের বিষয়বস্তু। বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধগুলিতে বহু সংখ্যক গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের উল্লেখ ও উহাদের বচনাদির উদ্ধৃতি আছে। একটি পরিশিষ্টে এইরূপ গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং উহাদের উল্লেখ-স্থান নির্দেশিত হইয়াছে। ইহা হইতে লেখকগণের কালের পৌর্বাপর্য (relative chronology) সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা করা যাইবে। তাহা ছাড়া, নব্যস্মৃতির বিভিন্ন সম্প্রদায়েব সঙ্গে বঙ্গীয় সম্প্রদায়ের সংযোগের আলোচনায়ও এই তালিকা কাজে লাগিবে। মূল গ্রন্থে যে সকল বঙ্গীয় স্মৃতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় নাই, তাঁহাদের পরিচয় ও গ্রন্থাবলীর বিবরণ 'সংযোজনে' লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

পণ্ডিতপ্রবর কানে তদীয় ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসে নব্যস্মৃতির অপরাপর সম্প্রদায়ের ন্যায় বঙ্গীয় সম্প্রদায়েরও আলোচনা সাধারণভাবে করিয়াছেন। শুধু বঙ্গদেশের স্মৃতিনিবন্ধেব বিস্তৃত আলোচনা তাঁহার গ্রন্থে আশা করা যায় না। এই অভাব, অন্ততঃ আংশিক রূপে, পূরণ করিবার উদ্দেশ্যেই বর্তমান গ্রন্থের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল।

বঙ্গদেশে রচিত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র স্মৃতিনিবন্ধের সংখ্যা বহু; টীকাটিপ্পনীর সংখ্যাও কম নহে। সকল নিবন্ধ ও টীকারই যে উল্লেখ এই গ্রন্থে করা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। তবে, আশা করা যায়, কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বাদ পড়ে নাই।

লেখকের পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে এই বিষয়ে গবেষণার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। এই গবেষণার ফলস্বরূপ বর্তমান গ্রন্থ লিখিত হইল।

এই গবেষণাত্মক গ্রন্থ রচনায় অধুনা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের

গবেষণা-বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক ডঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা মহাশয় সস্নেহ উপদেশ দানে লেখককে উৎসাহিত করিয়াছেন।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব স্মৃতির অধ্যাপক স্বর্গত হরেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ এবং বর্তমান স্মৃতির অধ্যাপক শ্রীযুত ভূপেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়দ্বয় বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য জানাইয়া লেখককে উপকৃত করিয়াছেন।

পূর্ববঙ্গের সোনার গাঁ (কৃষ্ণপুরা) নিবাসী, অধুনা ঢাকুরিয়া-(কলিকাতা) বাস্তব্য, শ্রীযুত রেবতীকুমার স্মৃতিতীর্থ মহাশয় লেখকের অধ্যাপককল্প। তিনি লেখকের স্মৃতিনিবন্ধপাঠের পথ অনেক স্থলে সুগম করিয়া দিয়াছেন।

এই গ্রন্থ বাঙালীর মনীষা ও মধ্যযুগীয় বঙ্গসমাজ সম্বন্ধে ধারণালাভে পাঠকের কিঞ্চিৎ সহায়তা করিলেও লেখকের শ্রম সার্থক হইবে।

এই গ্রন্থে কতক ইংরাজী পুস্তকের এবং ইংরাজী প্রবন্ধের নামোল্লেখ ইংরাজী অক্ষরেই করিতে হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, কোন কোন ইংরাজী নাম বাংলা অক্ষরে লিখিতে গেলে উহারা কিম্ভূতকিমাকার হইয়া যায়। ক্ষয়িষ্ণু যুগের নিবন্ধকারগণের নাম সঙ্কলন করিবার সময়ে দেবনাগর বর্ণানুক্রমে করা হইয়াছিল; এই গ্রন্থে উহার পরিবর্তন করা হয় নাই বলিয়া বর্গীয় ও অন্তঃস্থ এই উভয়প্রকার 'ব'ই রহিয়াছে।

গ্রন্থশেষে একটি শুদ্ধিপত্র সন্নিবেশিত হইল। ইহা সত্ত্বেও কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি গ্রন্থে রহিয়া গেল। তজ্জন্য সহৃদয় পাঠকের নিকট ত্রুটিস্বীকার করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। ইতি

কলিকাতা, শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীপঞ্চমী, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।

সূচীপত্র

পরিচয়

ভূমিকা

সঙ্কেত

সঙ্কেত

ই. হি. কো.	—	Indian Historical Quarterly.
এ্যা. ভ. ই	—	Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute.
জা. এ. সো.	—	Journal of Asiatic Society, Calcutta.
জা. ও. রি.	—	Journal of Oriental Research.
ঢা. ইউ.	–	Dacca University.
দা. ভ.	—	দায়ভাগ (জীমূতবাহন)।
নি. ই. এ্যা (অ্যা)		New Indian Antiquary.
নো. শা.	--	Notices of Skt. Mss. (Sastri).
নো. মি.	---	ঐ (Mitra).
প্রা. প্র.	--	প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ (ভবদেব), বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি।
প্রা. বি.	—	প্রায়শ্চিত্তবিবেক (শূলপাণি), সং জীবানন্দ বিদ্যাসাগর।
ব. সা. প.	—	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ, কলিকাতা।
বি. ই.	—	Bibliotheca Indica, Calcutta.
ব্য. মা.	—	ব্যবহারমাতৃকা (জীমূতবাহন), সং আশুতোষ মুখার্জি।
ম. স্মৃ.	—	মনুস্মৃতি, নির্ণয়সাগর প্রেস সংস্করণ।
যা. স্মৃ.	—	যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, নির্ণয়সাগর প্রেস্ সংস্করণ।
স্মৃ. ত.	—	স্মৃতিতত্ত্ব (রঘুনন্দন), সং জীবানন্দ বিদ্যাসাগর।
স্যা. ক.	—	Sanskrit College, Calcutta.
হি.এ্যা. স্যা	—	History of Ancient Sanskrit Literature (Max Muller).
হি.ধ.	—	History of Dharmasastra, P. V. Kane.
হি. বে.	—	History of Bengal. Vol. I (Dacca University).
I. L. R.	—	Indian Law Reporter.
Notices	—	Notices of Sanskrit Manuscripts.

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্মৃতিনিবন্ধের স্বরূপ ও উৎপত্তি

স্মরণাতীত কাল হইতে ধর্ম[১] ভারতবাসিগণের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে। শ্রুতি, সদাচার প্রভৃতির সহিত মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিকেও ধর্মের মূল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন[২]। স্মৃ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'স্মৃতি' পদটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ স্মরণ। ইহা শ্রু-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শ্রুতি (যাহা শোনা যায়) হইতে পৃথক্। 'স্মৃতি' পদে ধর্মকার্য সংক্রান্ত ও সামাজিক এবং ব্যক্তিগত সমস্ত বিধিনিষেধকেই বুঝায়। ইহার অপর নাম ধর্মশাস্ত্র। এই ধর্মশাস্ত্র হইতে ক্রমে কি করিয়া স্মৃতিনিবন্ধের সৃষ্টি হইল তাহা আমরা ইতঃপর আলোচনা করিব।

'নিবন্ধ' শব্দটি 'নি'-পূর্বক বন্ধনার্থক বন্ধ্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। এই শব্দটি বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে সাহিত্যিক রচনামাত্রই 'নিবন্ধ'পদে অভিহিত হইয়াছে[৩]। স্মৃতিশাস্ত্রে এই শাস্ত্রের সংক্ষিপ্তসার বুঝাইতে এই পদটি প্রযুক্ত হয়। প্রাচীন স্মৃতি-শাস্ত্রের গ্রন্থাদি বিপুলায়তন এবং উহাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় একত্র লিপিবদ্ধ আছে। সেই বিষয়গুলিকে প্রকরণ অনুযায়ী বিন্যস্ত করিয়া এবং বিরুদ্ধ মতবাদের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সংক্ষিপ্ত ও সহজ উপায়ে সাধারণের অধিগম্য করিবার প্রয়োজন দীর্ঘকাল পূর্বেই অনুভূত হইয়াছিল, কারণ, তখন হিন্দুসমাজের নেতৃবৃন্দ শাস্ত্রীয় নিয়ম বজায় রাখিবার জন্য সচেষ্ট

১ শুধু দেবদেবী সম্বন্ধে বিশ্বাস বা তাঁহাদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানাদিই ধর্ম নহে। মীমাংসাসূত্রকার জৈমিনি ধর্মের স্বরূপ নির্দেশ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ। অর্থাৎ, যে শ্রুতিবাক্য মানুষকে মঙ্গলজনক কার্যে প্রণোদিত করে তাহাই ধর্ম। 'ধর্ম' পদের বিভিন্ন অর্থের জন্য দ্রষ্টব্য হি.ধ., প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১।

২ মনুস্মৃতি ২। ১২; যা. স্মৃ. ১. ১. ৭।

৩ দ্রঃ—Sanskrit-English Dictionary (M. Williams)।

ছিলেন এবং সামাজিক ব্যক্তিগণেরও সাধারণতঃ ঐ নিয়মাবলী অনুসরণ করিবার প্রবণতা ছিল। এই সমস্ত কারণে দুরূহ গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রাদির পর্যালোচনা করিয়া তদানীন্তন স্মার্তপণ্ডিতগণ যে সমস্ত স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন, সেগুলিই স্মৃতিনিবন্ধশ্রেণীর অন্তর্গত। বহুবিস্তীর্ণ গ্রন্থরাশি হইতে তাঁহারা যে বিষয়গুলি স্বীয় আলোচনার্থ নির্বাচন করিলেন, উহাদিগকে প্রধানতঃ নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করিয়া লওয়া যায়ঃ—

(১) আচার—মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে আচরণ,

(২) প্রায়শ্চিত্ত—পাপক্ষালনার্থে অনুষ্ঠান,

(৩) ব্যবহার—আজকাল যাহাকে বলা হয় Law।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন। 'মনুস্মৃতি' ও 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি' প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থের যে বহুসংখ্যক টীকাভাষ্যাদি রচিত হইয়াছে, সেগুলি শুধু মূলের ব্যাখ্যাতেই সীমাবদ্ধ নহে। বিরুদ্ধমতের সমালোচনা ও সামঞ্জস্যবিধান করিয়া এবং নানা গ্রন্থ হইতে সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তির অবতারণা করিয়া এই টীকাকার ও ভাষ্যকারগণ একপ্রকার নিবন্ধ সাহিত্যেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সমস্ত টীকা ও ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই মহা-মহোপাধ্যায় কানে বলিয়াছেন—"There is no hard and fast line of demarcation between a tika and a nibandha"[১]; অর্থাৎ টীকা ও নিবন্ধের মধ্যে কোন পার্থক্যবোধক সীমারেখা নাই।

উল্লিখিত ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা স্মৃতিনিবন্ধগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি—

(১) বিশুদ্ধ নিবন্ধ—যথা, দেবণ ভট্টের 'স্মৃতিচন্দ্রিকা', রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব' ইত্যাদি।

(২) টীকানিবন্ধ—যথা, মেধাতিথির 'মনুভাষ্য', 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি'র উপরে বিজ্ঞানেশ্বরের 'মিতাক্ষরা' প্রভৃতি।

প্রথম শ্রেণীর নিবন্ধগুলির আবার নিম্নলিখিত দুইটি বিভাগ করা যাইতে পারেঃ—

১ হি.ধ., ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৭।

(ক) ব্যাখ্যামূলক—এই জাতীয় গ্রন্থে, বিশেষ কোন বিষয়ের উপরে বিভিন্ন স্মৃতিকারের মত উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং বিরুদ্ধমতের সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে; যেমন, জীমূতবাহনের 'কালবিবেক'।

(খ) সংক্ষিপ্তসার—এই জাতীয় নিবন্ধে নানা গ্রন্থ হইতে বচন প্রমাণাদি উদ্ধৃত হইয়াছে এবং উহাদের উপর নিবন্ধকারের নিজস্ব বিশেষ কোন মতামত লিপিবদ্ধ হয় নাই; যেমন হেমাদ্রির 'চতুর্বর্গচিন্তামণি'।

স্মৃতিনিবন্ধগুলিকে সাধারণতঃ নব্যস্মৃতি আখ্যা দেওয়া হয়। তৎপূর্ববর্তী মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি কর্তৃক শ্লোকাকারে রচিত স্মৃতিগ্রন্থ ও আপস্তম্ব, বৌধায়ন প্রভৃতি কর্তৃক সূত্রাকারে গ্রথিত ধর্মসূত্রগুলি প্রাচীন স্মৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

নব্যস্মৃতির বিভিন্ন সম্প্রদায় (school) ভারতের বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়; যথা—বঙ্গীয় স্মৃতি, মৈথিল স্মৃতি, ইত্যাদি। নব্যস্মৃতির এইরূপ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টির কারণ কি? একই প্রাচীন স্মৃতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেও স্মৃতিনিবন্ধের রচয়িতারা স্মৃতির বচন সমূহেরও বিধিনিষেধের ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই বিভিন্ন ব্যাখ্যার প্রধান কারণ সম্ভবতঃ দুইটি—প্রথমতঃ, তাঁহাদের নিজ নিজ প্রতিভা অনুযায়ী অভিনব ব্যাখ্যাকৌশল প্রদর্শনের প্রয়াস; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা যে যে অঞ্চলের লোক সেই সেই অঞ্চলের বিশেষ রীতিনীতির ও সামাজিক অবস্থার সহিত স্মৃতিশাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনীয়তা।

সমাজ-ও ধর্ম-জীবনে নিবন্ধগ্রন্থসমূহের প্রয়োজনীয়তা সম্যক্‌ভাবে অনুধাবন করিতে হইলে স্মৃতিশাস্ত্রের ক্রমবিবর্তনের ধারার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়; এই ধারাই বর্তমানে আমাদের আলোচ্য।

পূর্বে বলা হইয়াছে, যাহা শ্রুতি নহে তাহাই স্মৃতি। শ্রুতি, রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের মতে, ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণী এবং ঋষিগণ কর্তৃক শ্রুত। ব্যাপক অর্থে শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র, ব্যাকরণ প্রভৃতি সবই স্মৃতি। বৈদিক সংহিতাযুগের শেষভাগে বিশাল কর্মকাণ্ডের উদ্ভব হইয়াছিল; ইহার সাক্ষী

বিপুল ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহ। কালক্রমে এই ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি সংখ্যায় বহু হইয়া পড়িল এবং ইহাদের সংক্ষিপ্তসারের প্রয়োজন অনুভূত হইতে থাকিল। স্মৃতির সহায়ক সূত্রাকারে গ্রথিত এইরূপ সংক্ষিপ্তসারের নাম হইল কল্পসূত্র। সংক্ষেপে ও সহজে যাগযজ্ঞাদির ও অপরাপর অনুষ্ঠানের নিয়মাবলীগুলি এই জাতীয় গ্রন্থগুলিতে লিপিবদ্ধ হইল। এই কল্পসূত্রই অন্যতম বেদাঙ্গ। মানবসমাজ যতই অগ্রসর হয় ততই সামাজিক রীতিনীতির সংখ্যা ও জটিলতা বৃদ্ধি পায়। ক্রমপ্রসারী আর্যসমাজেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ক্রমে, কল্পসূত্রগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইল; যথা—(১) শ্রৌতসূত্র, (২) গৃহ্যসূত্র ও (৩) ধর্মসূত্র। বৈদিক যাগযজ্ঞের নিয়মপ্রণালী লিপিবদ্ধ হইল শ্রৌতসূত্রে। উপনয়নাদি সংস্কারগুলি গৃহ্যসূত্রের বিষয়ীভূত হইল এবং চতুর্বর্ণের ও চতুরাশ্রমের লোকেদের ব্যক্তিগত ও সমাজগত আচার আচরণের বিধি-নিষেধসমূহ লিপিবদ্ধ হইল ধর্মসূত্রে।

উক্ত ধর্মসূত্রেরই অপর নাম 'সাময়াচারিকসূত্র'[১]। 'সময়' অর্থাৎ 'পৌরুষেয়ী ব্যবস্থা'[২]; সুতরাং, 'সাময়াচারিক' শব্দে সেই আচারকেই বুঝায় যাহার ব্যবস্থা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা করিয়া দিয়াছেন। সময়াচারকে নিম্নলিখিত তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে[৩]:—

(১) বিধি, (২) নিয়ম ও (৩) প্রতিষেধ।

'ধর্মশাস্ত্র' বলিতে কিন্তু শুধু ধর্মসূত্রকেই বুঝায়না। এই শাস্ত্রের অধিকাংশই শ্লোকাকারে রচিত। সূত্রে বচিত গ্রন্থ ও শ্লোকাকারে প্রণীত গ্রন্থ—এই দুই শ্রেণীর গ্রন্থের রচনাকালের পৌর্বাপর্য লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রহিয়াছে। ম্যাক্‌স্‌মূলারের বদ্ধমূল ধারণা এই যে, শ্লোকাকারেব গ্রন্থগুলি সবই ধর্মসূত্রগ্রন্থসমূহের অর্বাচীন রূপ মাত্র।[৪] ম্যাক্‌স্‌মূলারের এই অনুমানের সমর্থনে নির্ভরযোগ্য প্রমাণের অভাবে কাণে এই প্রশ্ন অমীমাংস্য বলিয়াছেন,

১ অথাতঃ সাময়াচারিকান ধর্মান ব্যাখ্যাস্যামঃ—আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, ১।১।১

২ দ্রঃ—উক্ত সূত্রের উপর হরদত্তের টীকা।

৩ ঐ।

৪ হি এ্যা, স্যা, পৃঃ ৭০।

যদিও, তাঁহার অনুমান যে, শ্লোকে রচিত গ্রন্থই প্রাচীনতর[১]। অদ্যাবধি গৌতম, বৌধায়ন, আপস্তম্ব, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু, বৈখানস প্রভৃতি কয়েকখানি মাত্র ধর্মসূত্রগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সূত্রাকারে রচিত স্মৃতিবিষয়ক অসংখ্য বিধিনিষেধ বহু শাস্ত্রকারের নামাঙ্কিত হইয়া প্রসিদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থের টীকাতে ও নিবন্ধসমূহে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে[২]।

'যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি'তে (১।১।৪-৫) কুড়িজন ধর্মশাস্ত্রকারের নাম করা হইয়াছে। কিন্তু, পরবর্তী নিবন্ধাদিতে এই তালিকাবহির্ভূত অনেক স্মৃতিকারের নাম এবং তাঁহাদের রচনার বিস্তর উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। ধর্মশাস্ত্রের আয়তন যখন এত বিপুল হইয়া পড়িল তখন সহজপাঠ্য সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের প্রয়োজন বোধ স্বাভাবিক; ইহারই ফলে স্মৃতিনিবন্ধ সাহিত্যের উৎপত্তি।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, ভারতের সমাজ ও ধর্মজীবনের সম্বন্ধে ধারণার জন্য প্রাচীন স্মৃতিই যথেষ্ট; তাহা হইলে স্মৃতিনিবন্ধের আলোচনার প্রয়োজন কি? উত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রথমতঃ সমাজের একটি বিশেষ কোন দিকের পর্যালোচনার জন্য প্রাচীন স্মৃতি অনেক ক্ষেত্রেই উপযোগী নহে; কারণ, পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে ঐ জাতীয় গ্রন্থে অনেক বিষয় মিশ্রিত আছে এবং উহা হইতে বিভিন্ন বিষয় পৃথক্ করিয়া নেওয়া শ্রমসাপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিবন্ধকারেরা প্রাচীন স্মৃতির বচনগুলিকে, সামাজিক পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া, ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সুতরাং প্রাচীন স্মৃতি হইতে ক্রমপরিবর্তনশীল সমাজের ঠিক চিত্রটি পাওয়া যায় না।

১ হি. ধ., ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০।

২ এই জাতীয় সূত্রের সংগ্রহের জন্য দ্রষ্টব্য—জার্নেল অব্ ওরিয়েণ্ট্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট (বরোদা), ষষ্ঠ বর্ষ, সংখ্যা ২-৩।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধ
—উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

বঙ্গদেশীয় স্মৃতিশাস্ত্রের উৎপত্তিকাল অনিশ্চয়তার ঘনতমসাচ্ছন্ন। জনসাধারণের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, রঘুনন্দন ভট্টাচার্যই এই দেশীয় স্মৃতির প্রবর্ত্তক। কিন্তু, নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইবে, এই ধারণা অমূলক। রঘুনন্দনের বহুকাল পূর্বেই এই দেশে নব্যস্মৃতির সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অদ্যাবধি প্রকাশিত বঙ্গীয় নিবন্ধগুলির মধ্যে ভবদেব ভট্টের গ্রন্থসমূহই প্রাচীনতম। তাঁহারও পূর্বে যে বাংলার অনেক স্মৃতিকার প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ প্রসঙ্গক্রমে পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমানে সাধারণতঃ রঘুনন্দনকে বঙ্গীয় স্মৃতি-শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক মনে করিবার কারণ এই যে, এই দেশের স্মৃতিকার-গণের মধ্যে তিনিই সমধিক প্রতিভাবান্। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যাও যেমন সর্বাধিক, তাঁহার বিচারপদ্ধতিও তেমনই সর্বাপেক্ষা পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তদুপরি তিনি যে-যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সে-যুগে তাঁহার সমকালেই তন্ত্রশাস্ত্রে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ও ন্যায়শাস্ত্রে রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই তারকাত্রয় বঙ্গের শাস্ত্র-গগন এত সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, তৎপূর্ববর্তী লেখকগণ বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, প্রাক্-রঘুনন্দন যুগের স্মৃতিকারগণের বজ্র-সমুৎকীর্ণ স্মৃতিমণিতে রঘুনন্দন সূত্রাকারে প্রবেশ করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে অভূতপূর্ব যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ, তাঁহার পূর্বসূরিগণই এই দুর্গম পথের পথিকৃৎ। রঘুনন্দন কোন কোন

ক্ষেত্রে ইঁহাদের ঋণ স্বীকারও করিয়াছেন[১]। বর্তমান প্রসঙ্গে এই দেশের স্মৃতিনিবন্ধগুলির সংখ্যা ও স্বরূপ এবং উহাদের রচয়িতৃগণের জীবনী সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব[২]।

আজ পর্যন্ত এই দেশে যে নিবন্ধকারগণের গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত তিনটি যুগের অন্তর্ভুক্ত করা যায়:—

ক। প্রাক্-রঘুনন্দন যুগ,

খ। রঘুনন্দন-যুগ,

গ। ক্ষয়িষ্ণু স্মৃতির যুগ[৩]।

উল্লিখিত যুগের লেখকগণের মধ্যে কতকগুলি যুগবৈশিষ্ট্য দেখা যায়। রঘুনন্দন ও তৎপূর্ববর্তী লেখকগণের মধ্যে প্রথম ও প্রধান প্রভেদ এই যে, প্রাক্-রঘুনন্দন যুগের লেখকগণ অপেক্ষা রঘুনন্দন-যুগের লেখকগণ অনেক বেশী বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ববর্তী লেখকগণ অপেক্ষা পরবর্তী নিবন্ধকারেরা নিজ নিজ গ্রন্থে অধিকতর পরিমাণে পূর্বমীমাংসা[৪] ও ন্যায়ের যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। রঘুনন্দনের গুরু শ্রীনাথ আচার্যকে এই পদ্ধতির প্রবর্তক বলিলে অত্যুক্তি হয়না।

রঘুনন্দন যুগপ্রবর্তক নিবন্ধকার। কাব্যের ক্ষেত্রে যেমন কালিদাসকে লইয়াই কালিদাসের যুগ, বঙ্গীয় স্মৃতিসাহিত্যেও তেমন রঘুনন্দনই স্বীয়

১ যথা—প্রায়শ্চিত্তবিবেকাদাবন্যজ্জ্ঞেয়ং বিচক্ষণৈঃ—'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব' (বঙ্গবাসী সং), পৃঃ ৫।

২ এখানে আমরা বৈষ্ণব অথবা অন্য কোন সম্প্রদায় বিশেষের গ্রন্থের আলোচনা করিবনা। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের স্মার্তগ্রন্থসমূহের বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য S K De রচিত Vaisnava Faith and Movement নামক গ্রন্থ। বর্তমানে আলোচ্য লেখকগণের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য :—

(১) জা এ.সো., ১১শ খণ্ড, ১৯১৫, পৃঃ ৩১০-৩৬২,

(২) হি.ধ, ১ম খণ্ড,

(৩) হি.বে, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩১৮-৩২৫, ৩৫১-৩৫৭। এই সকল লেখকের স্মৃতি ভিন্ন অন্য বিষয়ের গ্রন্থ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিবনা।

৩ এই যুগকে রঘুনন্দনোত্তর যুগ বলা যায় না; কারণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সকল লেখকই যে রঘুনন্দনের পরবর্তী তাহার নিশ্চিত প্রমাণ নাই।

৪ স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় মীমাংসাশাস্ত্রের যুক্তির অপরিহার্যতা রঘুনন্দন স্বীকার করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ লক্ষণীয় 'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব' (বঙ্গবাসী সং,পৃঃ ২১২-২১৩)।

নামাঙ্কিত যুগের প্রসিদ্ধতম লেখক। গোবিন্দানন্দের জীবনকাল নিশ্চিতরূপে নিরূপিত না হইলেও, নানা যুক্তিবলে তাঁহাকে রঘুনন্দনের সমসাময়িক বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং, তাঁহাকেও আমরা রঘুনন্দন-যুগের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিবন্ধকারের রচনায় না আছে বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, না আছে বিচারপদ্ধতির মৌলিকতা। ইঁহাদের গ্রন্থপাঠে মনে হয় যে, যাঁহারা পাণ্ডিত্য-পূর্ণ নিবন্ধগুলির যুক্তিজাল ভেদ করিয়া তথ্য উদ্ধারে অসমর্থ, তাঁহাদের জন্য পূর্ববর্তী লেখকগণের গ্রন্থসমূহের সহজ সংক্ষিপ্তসার রচনাই ইঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ইঁহাদেব কতক গ্রন্থ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পদ্ধতিমাত্র অবলম্বনে রচিত।

ক। প্রাক্-রঘুনন্দন যুগ

১। ভবদেব ভট্ট

উড়িষ্যা প্রদেশের ভুবনেশ্বর নামক স্থানে অনন্তবাসুদেবের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ প্রশস্তি হইতে ইঁহার সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। ঐ প্রশস্তির ভবদেবই যে আমাদেব নিবন্ধকার ভবদেব তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, উভয়ের নামের পরেই 'বালবলভীভুজঙ্গ' এই পরিচয়টি লিখিত আছে।

ভবদেব ছিলেন রাঢ়ের সিদ্ধল গ্রামের অধিবাসী এবং রাজা হরিবর্ম-দেবের 'সান্ধিবিগ্রহিক' মন্ত্রী।

ইঁহার জীবনকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। স্বর্গত আর্. এল্. মিত্র উক্ত প্রশস্তিতে লিখিত বাচস্পতিকে প্রসিদ্ধ ন্যায়-গ্রন্থপ্রণেতা বাচস্পতির সহিত অভিন্ন মনে করিয়া ভবদেবকে খৃঃ ১১শ শতাব্দীর লেখক বলিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

লিপির সাক্ষ্যের বলে কীল্‌হর্ণ সাহেব উক্ত প্রশস্তিকে খৃঃ ১৩শ শতকের পূর্ব ভাগে স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু, এই যুক্তি অবিসংবাদিত নহে।

অনিরুদ্ধ ভট্টের 'কর্মোপদেশিনীপদ্ধতি' বা 'পিতৃদয়িতা' নামক গ্রন্থে ভবদেবের উল্লেখ আছে। অনিরুদ্ধ বঙ্গেশ্বর বল্লালসেনের গুরু; বল্লালের

কাল খৃঃ দ্বাদশ শতক। সুতরাং, ভবদেব যে ইহার পরবর্তী কালের লেখক নহেন—এ কথা বলা যায়।

ভবদেবের গ্রন্থে যে সমস্ত স্মৃতিকারের উল্লেখ আছে তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকরের[১] কাল আনুমানিক খৃঃ ৮০০ হইতে ১০৫০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়ে এবং 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি'র 'বালক্রীড়া' নাম্নী টীকার রচয়িতা বিশ্বরূপ খৃঃ ৭৫০ হইতে ১০০০ অব্দের মধ্যবর্তী কোন কালে জীবিত ছিলেন।

উল্লিখিত যুক্তিসমূহের বলে মনে করা যাইতে পারে যে, ভবদেব খৃঃ ৮০০ হইতে ১১০০ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে জীবিত ছিলেন। তাঁহার কালের উক্ত নিম্ন সীমার সমর্থনে হেমাদ্রি, মিসরু মিশ্র ও হরিনাথ প্রভৃতি কর্তৃক ভবদেবের উল্লেখ লক্ষণীয়[২]।

এস্থলে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ঠিক এই নামে আরো লেখক ছিলেন।[৩] অপরাপর ভবদেব হইতে এই ভবদেব পৃথক্‌ভাবে স্মরণীয়।

ভবদেবের গ্রন্থাবলী :

রঘুনন্দন 'স্মৃতিতত্ত্বে' (দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ২০৭) ভবদেবের 'ব্যবহারতিলক' নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উহা অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত। ইহা ছাড়াও, তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত স্মৃতিগ্রন্থগুলি বর্তমান আছে :—

(১) কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি[৪]

ইহা 'দশকর্মপদ্ধতি', 'সংস্কারপদ্ধতি' এবং 'ছন্দোগপদ্ধতি' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। * * সামবেদিগণের সংস্কারসমূহের অনুষ্ঠানপদ্ধতি এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

(২) প্রায়শ্চিত্ত-নিরূপণ[৫] (বা,—প্রকরণ)

বিবিধ পাপ ও তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

১ ইনি শ্রীনাথ আচার্যচূড়ামণির পিতা শ্রীকর হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

২ হি. ধ., ১, পৃঃ ৩০৫-৩০৬।

৩ ঐ।

৪ অনেক সংস্করণই আছে। আমরা শ্যামাচরণ কবিরত্নের (কলিকাতা, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) সংস্করণ ব্যবহার করিয়াছি।

৫ রাজসাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত (১৯২৭)।

(৩) সম্বন্ধবিবেক[১]

পাত্র ও পাত্রীর বিবাহযোগ্যতা ও বিবাহ-সংক্রান্ত অপরাপর কতক বিষয় সম্বন্ধে লিখিত।

(৪) শবসূতিকাশৌচপ্রকরণ।

ইহা নবাবিষ্কৃত গ্রন্থ ; বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ই. হি. কো., ৩২শ বর্ষ, সংখ্যা ১, পৃঃ ১-১৪।

২। জীমূতবাহন

ইঁহার গ্রন্থাদিতে ইনি মহামহোপাধ্যায় ও পারিভদ্রীয় বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে, রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে 'পারিগাঁ'ই ঐ 'পারিভদ্রীয়' কুল হইতেই সম্ভূত। অনুমান করা হয়, জীমূতবাহন রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন।

ইঁহার নাম ও ইঁহার রচিত 'কালবিবেক' নামক গ্রন্থের উল্লেখ শূলপাণির 'দুর্গোৎসববিবেকে' পাওয়া যায়। শূলপাণি আনুমানিক খৃঃ চতুর্দশ শতকের লোক। সুতরাং, এই তারিখই জীমূতবাহনের কালের নিম্নতর সীমারেখার নির্দেশক।

জীমূতবাহন ধারেশ্বর ভোজদেবের উল্লেখ করিয়াছেন। আনুমানিক ১১শ শতকে ভোজের আবির্ভাব হয়; অতএব জীমূতবাহন ঐ শতকের পূর্বেকার লেখক হইতে পারেন না।

পণ্ডিত জলি ও বুলারের মতে, এই নিবন্ধকার খৃঃ ১৩শ শতকের পূর্ববর্তী হইতে পারেন না। কিন্তু, ইঁহাদের এই মতের সমর্থনে অকাট্য প্রমাণ নাই। জীমূতবাহনের গ্রন্থাবলী :

(১) কালবিবেক[২]

বিবিধ ধর্মকার্যের অনুষ্ঠানোপযোগী কাল সম্বন্ধে আলোচনা ইহাতে আছে।

১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫২৮৩ সংখ্যক খণ্ডিত পুঁথি অবলম্বনে বর্তমান গ্রন্থকার কর্তৃক সম্পাদিত ও ইংরাজীতে অনূদিত। (দ্রষ্টব্য :—নি. ই. এ্যা., ষষ্ঠ বর্ষ, পৃঃ ৯৭,২৫২)

২ বি. ই. সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯০৫।

(২) ব্যবহারমাতৃকা[১]

ইহাতে বিবাদের বিষয় ও বিচারপদ্ধতি (Judicial Procedure) আলোচিত হইয়াছে।

(৩) দায়ভাগ[২]

পিতৃপিতামহ হইতে প্রাপ্ত সম্পত্তির ও স্ত্রীধন প্রভৃতির ভাগ ও উত্তরাধিকার ইহার বিষয়বস্তু। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বিজ্ঞানেশ্বরের 'মিতাক্ষরা' যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, বাংলা দেশে 'দায়ভাগে'রও সেই স্থান।

'কালবিবেক' ও 'দায়ভাগ' এই দুই গ্রন্থের সমাপ্তিসূচক বাক্য[৩] হইতে মনে হয় যে, 'ধর্মরত্ন' নামে একটি বৃহত্তর গ্রন্থের এইগুলি অংশমাত্র।

৩। অনিরুদ্ধ ভট্ট

ইঁহার গ্রন্থ হইতে ইঁহার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে ইনি ছিলেন গঙ্গাতীরবর্তী বিহারপাটকের অধিবাসী এবং মীমাংসক কুমারিল ভট্টের মতবাদে বিশেষ অভিজ্ঞ। আরো জানা যায় যে, তিনি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও ধর্মাধ্যক্ষ বা ধর্মাধিকরণিক।

'দানসাগর' গ্রন্থে বল্লালসেন অনিরুদ্ধকে স্বীয় গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

অনিরুদ্ধের গ্রন্থে ভোজদেব ও গোবিন্দরাজের উল্লেখ হইতে তাঁহার কালের উর্ধ্বসীমারেখা খৃঃ ১১০০ অব্দে টানা যায়। রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দ কর্তৃক অনিরুদ্ধের উল্লেখ হইতে ইঁহার কালের নিম্নসীমা খৃঃ ১৬শ শতকের কাছাকাছি স্থাপিত হইতে পারে। রুদ্রধরের 'শুদ্ধিবিবেকে' ও

১ সং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল কর্তৃক প্রকাশিত।

২ এই গ্রন্থের বহু সংস্করণের মধ্যে নিম্নলিখিত সম্পাদকগণের সংস্করণগুলি উল্লেখযোগ্য:

(১) ভরত শিরোমণি, কলিকাতা, ১৮৬৩ (ছয়টি টীকা সহ)।

(২) জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কলিকাতা, ১৮৯৩।

(৩) নীলকমল বিদ্যানিধি, কলিকাতা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

৩ ধর্মরত্নে কালবিবেকঃ সমাপ্তঃ। ধর্মরত্নেদায়ভাগঃ সমাপ্তঃ।

চণ্ডেশ্বরের 'শুদ্ধিরত্নাকরে' ইঁহার গ্রন্থের উল্লেখ থাকায় অনিরুদ্ধের কালের নিম্নতর সীমা খৃষ্টীয় ১৫শ, এমন কি ১৪শ শতকেও স্থাপন করা যাইতে পারে।

অনিরুদ্ধের গ্রন্থ :

(১) হারলতা[১]

ইহা অশৌচসংক্রান্ত গ্রন্থ।

(২) পিতৃদয়িতা[২]

ইহার অপর নাম 'কর্মোপদেশিনীপদ্ধতি।' ইহাতে বিবিধ অনুষ্ঠানের, বিশেষত: বিভিন্ন প্রকার শ্রাদ্ধের, আলোচনা আছে।

উক্ত গ্রন্থ দুইটি ছাড়াও, 'চাতুর্মাস্যপদ্ধতি'[৩] নামক একটি গ্রন্থ অনিরুদ্ধ রচিত বলিয়া মনে করা হয়।

৪। বল্লাল সেন[৪]

বল্লাল বঙ্গদেশের অন্যতম বিখ্যাত রাজা। নিজ নামের সহিত ইনি 'আররাজনিঃশঙ্কশঙ্কর' এই দৃপ্ত উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। সমাজ সংস্কারক হিসাবেও তাঁহার সমধিক প্রতিষ্ঠা ছিল; কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্তন তাঁহার একটি স্মরণীয় কীর্তি। অনিরুদ্ধ ভট্টের অধ্যাপনায় তিনি নানা শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন।

বল্লালকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের রাজা বলিয়া মনে করা হয়।

বল্লাল-রচিত গ্রন্থরাজি :

(১) দানসাগর[৫]

দানের যোগ্য বস্তু ও ব্যক্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ইহাতে আছে। রঘুনন্দন 'স্মৃতিতত্ত্বে' (২য় ভাগ, পৃঃ ৪৪) বলিয়াছেন :—দানসাগরে অনিরুদ্ধভট্টেনাভিহিতত্বাৎ। ইহা হইতে

১ বি. ই. সং, কলিকাতা, ১৯০৯।
২ সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ সিরিজ, সংখ্যা ৬, কলিকাতা।
৩ হি. ধ., ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪০।
৪ বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—হি. বে., ১ম ভাগ, পৃঃ ২১৬–২১৮
৫ বি. ই., কলিকাতা, ১৯৫৩।

মনে হয় যে, তাঁহার মতে অনিরুদ্ধই এই গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা।

(২) অদ্ভুতসাগর[১]—শুভাশুভনিমিত্ত এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

(৩) প্রতিষ্ঠাসাগর,

(৪) আচারসাগর।

শেষোক্ত গ্রন্থ দুইটির উল্লেখ 'দানসাগরে'র ৫৫ ও ৫৬ শ্লোকে যথাক্রমে আছে। 'দানসাগরে'র স্থানে স্থানে (পৃঃ ৫২ ও ৫৯) তদ্রচিত 'ব্রতসাগর' নামক একটি গ্রন্থেরও উল্লেখ দেখা যায়।

৫। হলায়ুধ

ইঁহার রচিত 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' নামক গ্রন্থের প্রারম্ভিক শ্লোক হইতে জানা যায় যে, হলায়ুধ ছিলেন ধর্মাধ্যক্ষ এবং বাৎস্যগোত্রীয় ধর্মাধ্যক্ষ ধনঞ্জয়ের পুত্র। হলায়ুধের দুই ভ্রাতা পশুপতি এবং ঈশানও নাকি স্মৃতিনিবন্ধকার ছিলেন। উক্ত গ্রন্থের পুষ্পিকায় তিনি 'আবসথিক' বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন, এই শব্দে সম্ভবতঃ গৃহ্যাগ্নির রক্ষক গৃহীকে বুঝান হইয়াছে[২]।

তাঁহার গ্রন্থে লক্ষ্মণসেনের উল্লেখ হইতে বুঝা যায়, হলায়ুধ ঐ রাজার সমকালীন লেখক, তাহা হইলে ইঁহার আবির্ভাবকাল খৃঃ ১২শ হইতে ১৩শ শতকের মধ্যবর্তী কোন সময়।

হলায়ুধের গ্রন্থ[৩]:

'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' বা 'কর্মোপদেশিনী'[৪] তাঁহার অদ্যাবধি আবিষ্কৃত একমাত্র গ্রন্থ। 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব'-এর ১৯ সংখ্যক প্রারম্ভিক শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, গ্রন্থকার মীমাংসাশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

১ সং মুরলীধর ঝা বারাণসী ১৯০৫।

২ দ্রঃ—Sanskrit English D[illegible]tionary, M. W[illegible]ms

৩ কেহ কেহ 'সংবৎসরপ্রদীপ' নামক একটি গ্রন্থকে হলায়ুধের রচিত বলিয়া মনে করেন। মতান্তরে ইহা ধনঞ্জয়ের অথবা শূলপাণির রচিত। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ই. হি. কো., ২১শ খণ্ড পৃঃ ৪৯ ৫৫ ১৪৫ ১৪৭। হলায়ুধের নামাঙ্কিত অন্যান্য গ্রন্থের জন্য Pre-Sayana Vedic Commentator of Bengal Our Heritage, Vol [illegible] দ্রষ্টব্য।

৪ সং (১) তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ কলিকাতা ১৩৩১ বঙ্গাব্দ (২) নীলকমল বিদ্যানিধি, কলিকাতা ১৩০১ বঙ্গাব্দ।

'দ্বিজনয়ন' ও 'শ্রাদ্ধপদ্ধতিটীকা' নামে দুইটি গ্রন্থ হলায়ুধের নামের সহিত যুক্ত দেখা যায়; কিন্তু, ঐ হলায়ুধ ও বর্তমান হলায়ুধ অভিন্ন কিনা সেই সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।[১]

৬। শূলপাণি[২]

ইনি বঙ্গীয় স্মৃতিতে অন্যতম খ্যাতনামা লেখক। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে ইঁহার জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তাঁহার গ্রন্থের সমাপ্তি-সূচক বাক্যে 'মহামহোপাধ্যায়' ও 'সাহুড়িয়ান'—এই দুইটি মাত্র পবিচয় জ্ঞাপক শব্দ আছে। 'সাহুড়িয়ান' শব্দে সম্ভবতঃ বাংলা দেশের রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণের একটি শাখাকে বুঝান হইয়াছে।

শূলপাণির আবির্ভাব-কাল নিশ্চিতভাবে নিরূপণ করিবার উপায় নাই। নানা যুক্তিপ্রমাণ বলে তাঁহাব কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ যে সমস্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে খৃঃ একাদশ হইতে পঞ্চদশ শতকের মধ্যবর্তী কোন কালে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, ইহার অধিক কিছু দৃঢ়ভাবে বলা যায় না।

শূলপাণির গ্রন্থনিচয়[৩] :

স্মৃতিশাস্ত্রের ইতিহাসে এই নামের একাধিক গ্রন্থকার দেখা যায়। বঙ্গীয় শূলপাণির রচিত গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে পণ্ডিতগণেব মধ্যে মতভেদ আছে। বিভিন্ন মতানুসারে, নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিব বচয়িতা বাঙ্গালী শূলপাণি :—

(অ-কারাদিক্রমে)

(১) অনুমরণবিবেক, (২) একাদশীবিবেক[৪],

(৩) কালবিবেক, (৪) চতুরঙ্গদীপিকা[৫],

১ জা. এ. সো., ১৯১৫ পৃঃ ৩৩১।

২ বিস্তারিত বিবরণের জন্য বর্তমান গ্রন্থকারের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য নি. ই. এ্যা. ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৫।

৩ প্রকাশিত গ্রন্থগুলির সংস্করণের পরিচয় ও অপ্রকাশিত গ্রন্থসমূহের পুথি কোথায় আছে তাহা লিখিত হইল। কতক গ্রন্থের উল্লেখমাত্র গ্রন্থান্তরে পাওয়া যায়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—নি. ই. অ্যা., ৫, পৃঃ ১৪৫।

৪ নো. শা. ১, সংখ্যা ৩৭ ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথিসংখ্যা II. 563r

৫ ইহা দাবাখেলা সম্বন্ধে লিখিত বলিয়া এই প্রসঙ্গে অবান্তর।

(৫) তিথিবিবেক[১],
(৬) তিথিদ্বৈতপ্রকরণ[২],
(৭) দত্তকপুত্রবিধি[৩],
(৮) দত্তকবিবেক,
(৯) দীপকলিকা[৪],
(১০) দুর্গোৎসববিবেক[৫],
(১১) দুর্গোৎসবপ্রয়োগবিবেক,
(১২) দোলযাত্রাবিবেক[৬],
(১৩) পর্ণনরদাহবিবেক,
(১৪) প্রতিষ্ঠাবিবেক[৭],
(১৫) প্রায়শ্চিত্তবিবেক[৮],
(১৬) রাসযাত্রাবিবেক[৯],
(১৭) বাসন্তীবিবেক[১০],
(১৮) ব্রতকালবিবেক[১১],
(১৯) শুদ্ধিবিবেক,
(২০) শ্রাদ্ধবিবেক[১২],
(২১) সময়বিধান[১৩],
(২২) সংক্রান্তিবিবেক[১৪],
(২৩) সম্বন্ধবিবেক[১৫],
(২৪) সম্বৎসবপ্রদীপ[১৬]।

১ সং S. C. Banerji, Poona Orientalist, Oct., 1941 ও Jan., 1942.

২ নো. শা. II. no. 86, IX, no. 3155 ।

৩ Aufrechtএর Catalogus Catalogorum দ্রষ্টব্য।

৪ সং J. R. Gharpure, Bombay, 1939. ইহা 'যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি'র টীকা। ইহার স্বরূপ The Dipakalika of Sulapani ইত্যাদি শীর্ষক প্রবন্ধে বর্তমান গ্রন্থকার কর্তৃক আলোচিত হইয়াছে।
(নি. ই. অ্যা., ৫, পৃঃ ৩১)।

৫ সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ (সিরিজ সংখ্যা ৭), কলিকাতা, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ।

৬ সং S. C. Banerji, 'A Volume of Studies in Indology' presented to Kane, Poona, 1941.

৭ কলিকাতা Asiatic Societyর Govt. Collection. MS. No. 114.

৮ সং জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কলিকাতা, ১৮৯৩।

৯ সং সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, কলিকাতা, Oct., 1941.

১০ সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ (সিরিজ সংখ্যা ৭), কলিকাতা, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ।

১১ সং S. C. Banerji ই. হি. কো., ডিসেম্বর, ১৯৪১।

১২ সং (১) চারুকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, কলিকাতা, ১৮৬১ (পর্বদাসপ্রকরণ পর্যন্ত),
(২) চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, কলিকাতা, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ।

১৩ A Catalogue of Sanskrit MSS. in the private libraries of N. W. Provinces, I, No. 94, Benares, 1874.

১৪ ইহার সংস্করণ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য ভারতবর্ষ (মাঘ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৯০)।

১৫ সং J. B. Chaudhury, কলিকাতা, ১৯৪২।

১৬ ঢা. ইউ. পুথিসংখ্যা ৪৬৩২ এবং A Catalogue of Palm-leaf and selected paper MSS. belonging to Durbar Library, Nepal, I. No. 1475 (খ)।

উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত এগারটি সর্বসম্মতিক্রমে বঙ্গীয় শূলপাণির রচনা :—(১) একাদশীবিবেক, (২) তিথিবিবেক, (৩) দত্তকবিবেক, (৪) দুর্গোৎসববিবেক, (৫) দোলযাত্রাবিবেক, (৬) প্রায়শ্চিত্তবিবেক, (৭) ব্রতকালবিবেক, (৮) রাসযাত্রাবিবেক, (৯) শ্রাদ্ধবিবেক, (১০) সংক্রান্তিবিবেক, (১১) সম্বন্ধবিবেক।

'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান' নামক গ্রন্থে (পৃঃ ৬৩) স্বর্গত দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয় কতক প্রমাণবলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই শূলপাণি "ন্যায়দর্শনেও কৃতবিদ্য ও গ্রন্থকার ছিলেন।"

৭। বৃহস্পতি রায়মুকুট[১]

(১) স্মৃতিরত্নহার[২], (২) রায়মুকুটপদ্ধতি।

প্রথম গ্রন্থে পূর্বাচার্যগণের যে সমস্ত গ্রন্থের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে প্রধান 'কালবিবেক', 'তিথিবিবেক', 'শ্রাদ্ধবিবেক,' ইত্যাদি।

রায়মুকুটের গ্রন্থ হইতে তাঁহার নিম্নলিখিত পরিচয় পাওয়া যায়:—ইনি মহিন্তা গাঁই-এর রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। বঙ্গেশ্বর গণেশের পুত্র জালাল-উদ্দিনের সময় রায়মুকুট পণ্ডিতগণের অগ্রগণ্য ছিলেন।

তিনি সম্ভবতঃ খৃঃ ১৫শ শতকের প্রথম ভাগে তাঁহার গ্রন্থগুলি রচনা করেন। মুসলমানগণ কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পরে ইনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চা আরম্ভ করেন। রঘুনন্দন 'মলমাসতত্ত্ব,' 'শ্রাদ্ধতত্ত্ব', শুদ্ধিতত্ত্ব' ও 'তিথিতত্ত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থে রায়মুকুটের উল্লেখ করিয়াছেন।

১ বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য :—ই. হি. কো., ১৭শ বর্ষ. পৃঃ ৩৩২-৩৫৫ ও ৪৫৬-৪৭১।
২ এশিয়াটিক সোসাইটির পুথির তালিকা, ৩য় ভাগ, ২১৩৮।

৮। শ্রীনাথ আচার্যচূড়ামণি

বঙ্গদেশীয় নব্যস্মৃতিসৌধের দৃঢ়তম স্তম্ভ স্মার্ত রঘুনন্দনের অধ্যাপক স্বরূপে শ্রীনাথের নাম সুবিখ্যাত। রঘুনন্দন প্রায়ই 'গুরুচরণাঃ', 'গুরুপাদাঃ' প্রভৃতি শব্দের সাহায্যে শ্রীনাথের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু, পরিতাপের বিষয় এই যে, যে স্মার্তপ্রদীপের জ্ঞানশিখায় রঘুনন্দনদীপ প্রজ্বলিত হইয়া সমগ্র বাংলাদেশকে সমুদ্ভাসিত করিয়াছিলেন সেই শ্রীনাথের নাম অবহেলার প্রগাঢ় অন্ধকারে বিলুপ্তির প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। শ্রীনাথের রচিত বহু গ্রন্থ পুঁথি আকারে এখনও নানা স্থানে রক্ষিত আছে; একমাত্র 'দুর্গোৎসববিবেক' নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

রঘুনন্দনের কাল খৃঃ ১৬শ শতকের মধ্যভাগ বা তাহার নিকটবর্তী সময়। সুতরাং, শ্রীনাথের আবির্ভাব ও কীর্তিকাল খৃঃ ১৫শ শতকের শেষভাগ হইতে ১৬ শতকের প্রথম ভাগ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

শ্রীনাথের গ্রন্থাবলী[১]:

ইঁহার গ্রন্থসমূহকে নিম্নলিখিত শ্রেণীভুক্ত করা যায়:—

(ক) টীকা

(১) সারমঞ্জরী
—নারায়ণ-কৃত 'ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশে'র টীকা।

(২) তাৎপর্য-দীপিকা বা তিথিবিবেকটীকা
—শূলপাণির 'তিথিবিবেকে'র টীকা।

(৩) শ্রাদ্ধবিবেকব্যাখ্যা (বা, ০ টীকা)
—শূলপাণির 'শ্রাদ্ধবিবেকে'র টীকা।

(৪) দায়ভাগটিপ্পনী
—জীমূতবাহনের 'দায়ভাগে'র টীকা।

(খ) অর্ণব-বর্গ

(১) বিবেকার্ণব, (২) কৃত্যতত্ত্বার্ণব,
(৩) শুদ্ধিতত্ত্বার্ণব, (৪) 'বাহতত্ত্বার্ণব[২]।

১ বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য জা. এ. সো. ১৯১৫, পঃ ৩৪৫-৩৪৯।
২ সং সুরেশ ব্যানার্জি—এ্যা. ভা. ই. ১৯৫১।

(গ) দীপিকা-বর্গ

(১) গূঢ়-দীপিকা,

(২) শ্রাদ্ধদীপিকা,

(ঘ) চন্দ্রিকা-বর্গ

(১) আচারচন্দ্রিকা,

(২) শ্রাদ্ধচন্দ্রিকা,

(৩) দানচন্দ্রিকা।

(ঙ) বিবেকবর্গ

(১) দুর্গোৎসববিবেক,

(২) প্রায়শ্চিত্তবিবেক,

(৩) শুদ্ধিবিবেক।

রঘুনন্দন-যুগ

রঘুনন্দন বাংলাদেশের নব্যস্মৃতিতে প্রদীপ্ত ভাস্কর। এই ভাস্করের তেজে বাংলার স্মার্ততারকাগণের প্রভা ম্লান হইয়া গিয়াছে। এখনও পর্যন্ত 'স্মার্তাঃ' এই ক্ষুদ্র পদটি দ্বারাই রঘুনন্দনকে বুঝান হইয়া থাকে। ইঁহার জন্ম ও শিক্ষা হয় নবদ্বীপে। বন্দ্যঘটীয় ও হরিহরভট্টাচার্যাত্মজ বলিয়া ইনি স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন।

রঘুনন্দনের গ্রন্থে শূলপাণি ও রায়মুকুটের উল্লেখ পাওয়া যায়, ইহা হইতে মনে হয়, তিনি খৃঃ ১৫০০ অব্দের পূর্ববর্তী ছিলেন না। 'বীর-মিত্রোদয়' গ্রন্থে ও নীলকণ্ঠ কর্তৃক রঘুনন্দনের মত সমালোচিত হইয়াছে বলিয়া ইঁহার কাল খৃঃ ১৬০০ অব্দের পরে হইতে পারেনা।

রঘুনন্দনের গ্রন্থাবলী :

রঘুনন্দনের লিখিত 'মলমাসতত্ত্বে'র প্রারম্ভে[১] ইঁহার রচিত অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বের উল্লেখ আছে। এইগুলি ছাড়াও, রঘুনন্দন নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী রচনা করিয়াছিলেন :—

১ স্মৃতিতত্ত্ব, প্রথমভাগ, পৃঃ ৭৩৬।

(১) দায়ভাগটীকা[১]

জীমূতবাহনের 'দায়ভাগে'র টীকা।

(২) তীর্থযাত্রাতত্ত্ব[২] (বা, তীর্থতত্ত্ব)

বারাণসী, গয়া, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থযাত্রার পূর্বে ও তীর্থস্থানে করণীয় অনুষ্ঠানের আলোচনা।

(৩) দ্বাদশযাত্রাতত্ত্ব[৩] (বা, যাত্রাতত্ত্ব)

জগন্নাথ দেবের বার মাসে বারটি যাত্রা অবলম্বনে রচিত।

(৪) গয়াশ্রাদ্ধপদ্ধতি[৪],

(৫) রাসযাত্রাপদ্ধাত[৫],

(৬) ত্রিপুষ্করশান্তিতত্ত্ব[৬],

(৭) গ্রহযাগতত্ত্ব (বা, গ্রহযাগপ্রমাণতত্ত্ব[৭])

গ্রহশান্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানাদির আলোচনা ইহাতে আছে।

গোবিন্দানন্দ[৮]

গ্রন্থমধ্যে তাঁহার আত্মপরিচয় হইতে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন বাগ্ড়ী (=মেদিনীপুরের অন্তর্গত প্রাচীন ব্যাঘ্রতটী[৯]) নিবাসী গণপতিভট্টের পুত্র ও 'কবিকঙ্কণাচার্য' উপাধিধারী।

১ ভরত শিরোমণির 'দায়ভাগে'র সংস্করণে প্রকাশিত। ইহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কোলব্রুক সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। (দ্রষ্টব্য—'মিতাক্ষরা' ও 'দায়ভাগে'র কোলব্রুককৃত ইংরাজী অনুবাদ, ভূমিকা, পৃঃ ৬)।

২ সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ সিরিজ, সংখ্যা ১২, কলিকাতা।

৩ ঐ, সংখ্যা ১৬, কলিকাতা।

৪ দ্রঃ—হি. ধ. ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪১৭।

৫ ঐ

৬ ঐ

৭ সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ সিরিজ, সংখ্যা ১০, কলিকাতা, ১৯২৫।

৮ বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য :—(১) বর্ষক্রিয়াকৌমুদী (বি. ই. সং)—ভূমিকা ;
(২) জা. এ. সো, ১৯১৫ ;,
(৩) জা ও রি, ১৮শ বর্ষ, ২য় ভাগ।

৯ দ্রঃ—হি. বে., ১ম ভাগ, পৃঃ ১১৭।

স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় গোবিন্দানন্দকে খৃঃ ১৬শ শতকের মধ্যভাগের লেখক বলিয়া মনে করেন। রঘুনন্দনের অনেক গ্রন্থে প্রযুক্ত 'বর্ষকৃত্য' শব্দটি, কাহারও কাহারও মতে[১], গোবিন্দানন্দের 'বর্ষক্রিয়া-কৌমুদী' নামক গ্রন্থকে বুঝায়; অতএব তাঁহাদের ধারণা যে গোবিন্দানন্দ রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী। কিন্তু, অপর পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, এই শব্দে বৎসরে করণীয় অনুষ্ঠানকেই বুঝায়, কোন গ্রন্থবিশেষকে বুঝায় না।

বাংলাদেশের নিবন্ধসাহিত্যে 'বর্ষকৃত্য' শব্দটির প্রয়োগ যে যে স্থলে আছে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান:—

শূলপাণির 'দুর্গোৎসববিবেক' (পৃঃ ২৬)—দিগ্‌বিশেষে ফলবিশেষমাহ বর্ষকৃত্যে।

রঘুনন্দনের 'মলমাসতত্ত্বে' (স্মৃতিতত্ত্ব, ১, পৃঃ ৭৭৬)—বর্ষকৃত্যে মাসদ্বয়স্থ।

" ঐ (ঐ, পৃঃ ৮২৩)—বিদ্যাপতিকৃতবর্ষকৃত্যে।

" 'তিথিতত্ত্ব' (ঐ, পৃঃ ১০৩)—বর্ষকৃত্যে বিত্তংব্রহ্মণি ইত্যাদি।

" " (ঐ, পৃঃ ১৪১)—বর্ষকৃত্যধৃতগর্গবচনাৎ।

" একাদশীতত্ত্ব (ঐ, ২, পৃঃ ১০০)—বর্ষকৃত্যে পাঠঃ।

" দুর্গাপূজাতত্ত্ব (পৃঃ ৪৬)—বর্ষকৃত্যে বিত্তংব্রহ্মণি ইত্যাদি।

উল্লিখিত স্থলগুলির কোথায়ও গোবিন্দানন্দের উল্লেখ নাই; বরঞ্চ এক স্থলে রঘুনন্দন 'বর্ষকৃত্য'কে বিদ্যাপতি-কৃত বলিয়াছেন।

রঘুনন্দনের 'আহ্নিকতত্ত্বে' (স্মৃতিতত্ত্ব, ১, পৃঃ ৩৪৩) 'ক্রিয়াকৌমুদী'র উল্লেখ হইতে কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, গোবিন্দানন্দ রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী লেখক। তাঁহাদের মতে গোবিন্দানন্দের 'ক্রিয়াকৌমুদী' নামে বৃহত্তর গ্রন্থের অংশবিশেষই 'বর্ষক্রিয়াকৌমুদী' প্রভৃতি গ্রন্থ; কিন্তু এই সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। 'শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী'তে গোবিন্দানন্দ স্বয়ং 'ক্রিয়াকৌমুদী'র উল্লেখ করিয়াছেন বটে[২], কিন্তু ইহা যে তাঁহার নিজের রচিত এমন কথা বলেন নাই।

১ দ্রঃ—বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, ভূমিকা, পৃঃ ২।

২ প্রয়োগস্তু ক্রিয়াকৌমুদ্যাং দ্রষ্টব্যঃ—শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী, পৃঃ ৫৩।

গোবিন্দানন্দের গ্রন্থাবলী :

(১) দানক্রিয়াকৌমুদী[১],
(২) শুদ্ধিকৌমুদী[২]
(৩) শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী[৩],
(৪) বর্ষক্রিয়াকৌমুদী[৪]
(৫) তত্ত্বার্থকৌমুদী[৫] (শূলপাণিকৃত 'প্রায়শ্চিত্তবিবেকে'র টীকা),
(৬) অর্থকৌমুদী[৬] (শ্রীনিবাসের 'শুদ্ধিদীপিকা'র টীকা)।

উক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও গোবিন্দানন্দ সম্ভবতঃ শূলপাণির 'শ্রাদ্ধবিবেকে'র উপরেও একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন। ইহার নানারূপ নামকরণই দেখা যায়; যথা—'তত্ত্বার্থকৌমুদী,' 'শ্রাদ্ধবিবেককৌমুদী' বা 'অর্থকৌমুদী'[৭]।

গ। ক্ষয়িষ্ণু স্মৃতির যুগ

নানাস্থানের পুঁথিশালায়[৮] সংরক্ষিত পুঁথির তালিকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য স্মৃতিগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি গ্রন্থকে নিঃসন্দেহে বঙ্গদেশীয় বলা যাইতে পারে; কারণ ইহাদের অনেক রচয়িতা খাঁটি বাঙ্গালী নামধারী। তাহা ছাড়া, এই সমস্ত অনেক গ্রন্থে প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী নিবন্ধকারের, বিশেষতঃ রঘুনন্দনের উল্লেখ আছে। আবার কোন কোন গ্রন্থের পুঁথি শুধু বঙ্গাক্ষরে বাংলাদেশেই রক্ষিত আছে।

১ বি. ই. সং, কলিকাতা, ১৯০৩।
২ ঐ, ১৯০৫।
৩ ঐ. ১৯০৪।
৪ ঐ, ১৯০২।
৫ জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত শূলপাণির 'প্রায়শ্চিত্তবিবেকে'র সহিত মুদ্রিত।
৬ দ্রঃ—হি. ধ., ১, পৃঃ ৪১৫।
৭ দ্রঃ—জা. ও. রি, ১৮শ বর্ষ, পৃঃ ১০৩।
৮ যে সমস্ত পুঁথিশালার পুঁথির তালিকা এই সম্পর্কে ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রধান :—
(১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; (২) স্ত্যা. ক; (৩) এসিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা; (৪) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই যুগের সমস্ত লেখকই যে রঘুনন্দনের পরবর্তী তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। সুতরাং, এই যুগের উর্ধ্ব সীমারেখা যথাযথরূপে নির্ধারণ করা সম্ভবপর নহে। আমরা প্রসঙ্গক্রমে দেখিব যে, এই যুগের নিম্ন সীমারেখাকে বর্তমান শতাব্দীতেই স্থাপন করা যায়।

এই যুগের গ্রন্থগুলির বৈশিষ্ট্য আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি। এই নিবন্ধসমূহের রচয়িতৃগণের মৌলিকত্বের অভাবের উদাহরণস্বরূপ রঘুনন্দনোত্তর জনৈক নিবন্ধকারের 'সম্বন্ধনির্ণয়' নামক গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত বাক্যটি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে:—

সম্বন্ধোঽয়ং গোপালেন কৃতঃ স্মার্তস্য বর্ত্মনা। অর্থাৎ, এই 'সম্বন্ধনির্ণয়' গ্রন্থ গোপাল কর্তৃক স্মার্তের (রঘুনন্দনের) প্রদর্শিত পদ্ধতিতে রচিত হইল। এই উক্তি হইতে গোপালের উদ্দেশ্য ও তৎপ্রণীত নিবন্ধের স্বরূপ স্পষ্টই বুঝা যায়। বস্তুতঃ, অপরাপর রঘুনন্দনোত্তর নিবন্ধকারেরা স্মার্তকুল শিরোমণির ঋণ এইরূপে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার না করিলেও তাঁহারা অনুরূপ আদর্শেই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

নিম্নে সংগৃহীত নিবন্ধগুলি ছাড়া এই জাতীয় গ্রন্থ এই যুগে রচিত হয় নাই, এমন কথা বলা যায়না। তবে, আশা করা যায়, আর কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নাই:—

ক্ষয়িষ্ণু যুগের লেখক ও নিবন্ধ:

(লেখকগণের নাম অ-কারাদিক্রমে লিখিত হইল)

১। অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ

(১) সহানুমরণবিবেক[১],

(২) বিবাদচন্দ্রিকা[২]

প্রথম গ্রন্থের সমাপ্তিসূচক বাক্যে গ্রন্থকার মহামহোপাধ্যায় রামচরণ ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র বলিয়া স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থের শেষ ভাগে স্মার্ত ভট্টাচার্য ও 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি'র শূলপাণিকৃত টীকার উল্লেখ আছে।

১ নো. মি., ৭ম খণ্ড, ২৪৬৮।
২ ইণ্ডিয়া অফিস ক্যাটালগ (এগেলিং), ৩য় খণ্ড, ১৫৩০।১২৭৮৬।

২। আনন্দবন

—রামার্চনচন্দ্রিকা[১]।

গ্রন্থসমাপ্তিসূচক বাক্যে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য মুকুন্দবনের শিষ্য বলিয়া গ্রন্থকারের পরিচয় আছে। নো. শা. র প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় (পৃঃ ১১) স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, যে সম্প্রদায়ের ইহা একখানি প্রমাণ্য গ্রন্থ তাহা এখনও বাংলা দেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। কাশীনাথ শর্মা

—প্রায়শ্চিত্তসারসংগ্রহ বা ০ কদম্ব[২]।

৪। কৃপারাম

—নব্যধর্মপ্রদীপ[৩]।

ওয়ারেন হেষ্টিংস কর্তৃক 'বিবাদার্ণবসেতু' নামক গ্রন্থের সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত পণ্ডিতগণের অন্যতম ছিলেন কৃপারাম। এই 'বিবাদার্ণবসেতু'রই ইংরাজী অনুবাদ Halhed's Gentoo Law নামে খ্যাত। কথিত আছে যে, বৃদ্ধবয়সে কাশীবাসকালে, উক্ত হেষ্টিংসএর বিচারের সময়ে, তাঁহার পক্ষে পার্লামেণ্টে দরখাস্ত দাখিলের ব্যাপারে ইনিই ছিলেন অগ্রণী[৪]।

৫। কৃষ্ণমোহন ন্যায়ালঙ্কার

—প্রায়শ্চিত্তলক্ষণবিচার[৫]।

৬। কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য

—কৃত্যপল্লবদীপিকা বা ষট্‌কর্মদীপিকা[৬]।

১ এসিয়াটিক সোসাইটি (কলিকাতা)র ক্যাটালগ, ৩য় খণ্ড, ২৮৩১—২৮৩৩।
২ ঢা ইউ. ক্যাটালগ, ২২৭১ ; ব. সা. প. ক্যাটালগ, ১৬০ জি।
৩ কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি, ৩য় খণ্ড, ২২২৩ ; ব. সা. প., ১৫২৬, ১৬০২।
৪ দ্রঃ এসিয়াটিক সোসাইটির ক্যাটালগ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৯।
৫ ব. সা. প, ১৩২৭।
৬ ঢা. ইউ., ৫৫৫ জি।

৭। গুণানন্দ

—স্মৃতিসার[১]।

৮। গোপাল সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য

(১) বিবাহব্যবস্থাসংক্ষেপ[২],

(২) ব্যবহারালোক[৩]।

৯। গোপাল ন্যায়পঞ্চানন[৪]

(১) অশৌচনির্ণয় বা নির্ণয়মালা

[ঢা. ইউ., ১১৩ বি; ব. সা. প., ১৫২৩; এসিয়াটিক সোসাইটি (কলিকাতা) ক্যাটালগ, ৩য় খণ্ড, ২২৮৮]

(২) আচারনির্ণয়

(ঢা. ইউ., ১৮৮১, এসিয়াটিক সোসাইটি, ২১০৫)।

(৩) কালনির্ণয়

(ঢা. ইউ., ৫৩৭ এ, এসিয়াটিক সোসাইটি, ২১০৫)।

(৪) তিথিনির্ণয়

(ঢা. ইউ., ৩২৭ জি, এসিয়াটিক সোসাইটি, ২১০৫)।

(৫) দায়ভাগনির্ণয় বা দায়নির্ণয়

(ঢা. ইউ., ৩২৭ জে; এসিয়াটিক সোসাইটি, ৩৬৯২)।

(৬) দুর্গোৎসবনির্ণয়

(ঢা. ইউ., ৩৭৭০)।

(৭) প্রায়শ্চিত্তনির্ণয়

(ঢা. ইউ., ৩২৭)।

১ ঢা. ইউ., ১২৯ ডি।

২ ঐ, ১১৩ সি, ২০১ ডি।

৩ স্টা. ক. ক্যাটালগ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৩।

৪ ইঁহার জীবনী সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থকারের প্রবন্ধ — Post-Raghunandana Smriti-writers of Bengal—নি. ই. এ্যা., ৭ম বর্ষ, সংখ্যা ৫, ৬। ব. সা. প. ক্যাটালগ ১০৩১ সংখ্যক পুথিটির নাম 'স্মৃতিনির্ণয়'। এই নিবন্ধকারের গ্রন্থনামগুলি 'নির্ণয়' শব্দান্ত বলিয়া, 'স্মৃতিনির্ণয়' নামক একটি গ্রন্থের অস্তিত্ব অনুমেয় হইলেও এই বিষয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই।

(৮) প্রেতাধিকারনির্ণয়
(ঢা. ইউ., ৫২৪ বি)।

(৯) মলমাসনির্ণয় বা মলমাসাদিকালনির্ণয় (ঐ, ৫৩৭এ)।

(১০) যাগবিচারনির্ণয়
(ঢা. ইউ. ক্যাটালগে ইহার সংখ্যা দেওয়া নাই)।

(১১) বিচারনির্ণয়
(ঢা. ইউ., ৩২৭ আই)।

(১২) বিবাদনির্ণয়
(ঐ, ৩২৭ আই ; এসিয়াটিক সোসাইটি, ২১০৪)।

(১৩) বৃষোৎসর্গকৃত্যনির্ণয়
(ঢা. ইউ. ক্যাটালগে ইহার সংখ্যা দেওয়া নাই)।

(১৪) ব্যবস্থানির্ণয়
(ঢা. ইউ. ক্যাটালগে ইহার সংখ্যা দেওয়া নাই)।

(১৫) শুদ্ধিনির্ণয়
(ঢা. ইউ., ২১৩৮ ডি ; এসিয়াটিক সোসাইটি, ২১০২, ২১০৩)।

(১৬) শ্রাদ্ধনির্ণয়
(ঢা. ইউ., ৩২৭ এইচ্ , এসিয়াটিক সোসাইটি, ২১০৫)।

(১৭) সংক্রান্তিনির্ণয়
(ঢা. ইউ., ৫২৯ বি , এসিয়াটিক সোসাইটি, ২১০৮)।

(১৮) সম্বন্ধনির্ণয়[১]
(এসিয়াটিক সোসাইটির ২৭২২ সংখ্যক পুঁথির নাম 'উদ্বাহনির্ণয়'। ইহা 'সম্বন্ধনির্ণয়ে'র নামান্তর।

১০। চতুর্ভুজ ভট্টাচার্য

(১) অশৌচসংগ্রহ[২] (বা,—প্রকাশ)।

১ সং সুরেশ ব্যানার্জি, পুণা ওরিয়েণ্টাল সিরিজ, সংখ্যা ৮৫।
২ নো. মি., ৫ম ভাগ, ২০৭১ ; নো. শা. (সেকেণ্ড সিরিজ), ১ম ভাগ ; ঢা. ইউ. ২১৪৩এ।

(২) গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী[১]।

গ্রন্থকার মহাচার্য বা আচার্য বলিয়া স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থের পুঁথিটি ১৬৩২ শকাব্দে (=১৭১০ খৃষ্টাব্দে) লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

১১। চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য

(১) ধর্মদীপিকা বা স্মৃতিপ্রদীপিকা[২],
(২) স্মৃতিপ্রদীপ[৩],
(৩) স্মৃতিদুর্গভঞ্জন[৪] বা দুর্গভঞ্জন,
(৪) স্মৃতিসারসংগ্রহ[৫],
(৫) দ্বৈতনির্ণয়[৬]।

উক্ত গ্রন্থগুলির প্রারম্ভিক শ্লোক ও সমাপ্তিসূচক বাক্যগুলি হইতে জানা যায় যে, বাচস্পতি উপাধিধারী চন্দ্রশেখর নবদ্বীপের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলের বিদ্যাভূষণ উপাধিভূষিত একজন পণ্ডিতের অধস্তন তৃতীয় পুরুষ ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় গোকুলনাথ নামক জনৈক পণ্ডিত 'দ্বৈতনির্ণয়ে'র 'দ্বৈতনির্ণয়প্রদীপ' নামে একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

১২। জগদানন্দ

—কৃত্যকৌমুদী[৭]।

১ নো. মি. ৭ম ভাগ, ২৭৭৫।
২ নো. মি., ২, ৬৫০ ; নো. শা. (সেকেণ্ড সিরিজ), ১ম ভাগ ; ইণ্ডিয়া অফিস ক্যাটালগ (এগেলিং), ৩য় ভাগ, ১৫৭০ ; ঢা, ইউ, ২৭৯৫।
৩ নো. মি. ষষ্ঠ ভাগ, ২২১৮।
৪ নো. শা. ১০ম ভাগ, ৪০৫৫ ; ঢা. ইউ., ২২৯১ (তিথিদুর্গভঞ্জন) ; এসিয়াটিক সোসাইটি ক্যাটালগ, ৩য় ভাগ, ২৮১৯ ; নো. মি, ২য় ভাগ, ৯৩৭ ; স্টা ক, ২য় ভাগ, ৩৮৪.
৫ স্টা. ক. ২য় ভাগ, ২০৩, ২০৪.
৬ ঐ, ৭৯।
৭ ঢা. ইউ., ২০৮০।

১৩। ধনঞ্জয়

—ধর্মপ্রদীপ[১]।

১৪। নারায়ণ শর্মা

(১) শুদ্ধিকারিকা বা শুদ্ধিতত্ত্বকারিকা[২];

(২) ব্যবস্থাসারসঞ্চয়[৩]।

১৫। পশুপতি

(১) কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি[৪],

(২) বাজসনেয়ি-পদ্ধতি বা দশকর্মপদ্ধতি[৫]।

ইঁহার উপাধি দেখা যায় 'রাজপণ্ডিত'।

১৬। প্রাণকৃষ্ণ

—প্রাণকৃষ্ণক্রিয়াম্বুধি[৬]।

১৭। বলদেব তর্কবাগীশ ভট্টাচায

—দায়ভাগসিদ্ধান্ত[৭]।

গ্রন্থের সমাপ্তিসূচক বাক্যে গ্রন্থকারের উক্ত নাম থাকিলেও প্রারম্ভিক শ্লোকে শ্রীধরের নাম দেখা যায়। সুতরাং, প্রকৃত গ্রন্থকর্তা কে তাহা বলা কঠিন।

১৮। ভট্টভবদেব

—গ্রহযাগপদ্ধতি[৮]।

ইনি 'বালবলভিভুজঙ্গ' ভবদেব হইতে সম্ভবতঃ পৃথক্ ব্যক্তি।

১ ঢা. ইউ, ৩৯৬০।

২ ঢা. ইউ., ২৭২৭; এসিয়াটিক সোসাইটি ক্যাটালগ, ২১০০—২১০১; ব. সা. প., ১৫২৪। এসিয়াটিক সোসাইটির ২২৯৩ সংখ্যায় ঠিক এই নামের একটি গ্রন্থ রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারের নামাঙ্কিত দেখা যায়।

৩ ব. সা. প., ১৫২১; এসিয়াটিক সোসাইটি, ২০৯৯।

৪ ঢা. ইউ., ৩৭৫৮।

৫ ঢা. ইউ., ৪৪৫৫।

৬ ব. সা. প., ১৩৭৬।

৭ ইণ্ডিয়া অফিস ক্যাটালগ (এগেলিং) ৩য় ভাগ, ১৫২৯।১৩৮৬ সি।

৮ ঢা. ইউ., ৪৫৭১।

১৯। ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য

(১) স্মৃতিচন্দ্র[১],

(২) তীর্থসার[২],

(৩) নবগ্রহযাগপদ্ধতি[৩]।

ইণ্ডিয়া অফিসের এগেলিং ক্যাটালগ, ৩য় ভাগ, ১৪৮২ সংখ্যক পুঁথিতে গ্রন্থকারের নিম্নলিখিত বংশপরিচয় দেওয়া আছে :—

গঙ্গাদাস বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য
(গঙ্গাতীরবাসী)
|
শিবকৃষ্ণ ন্যায়পঞ্চানন
|
হরিহর তর্কালঙ্কার
|
ভবদেব।

'স্মৃতিচন্দ্রে'র 'শ্রাদ্ধকলা' নামক অংশে (উক্ত ইণ্ডিয়া অফিস ক্যাটালগ, ১৪৮৩ সংখ্যক পুঁথি) রঘুনন্দনের উল্লেখ আছে। 'শ্রাদ্ধকলা' ও 'শুদ্ধিকলার' পুঁথির লিপিকাল দেওয়া আছে যথাক্রমে শকাব্দ ১৬৪১ (=১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দ) ও ১৬৪৩ (=১৭২১ খৃষ্টাব্দ)। 'তীর্থসারে'র লিপিকাল দেওয়া আছে ১৬৫৩ শকাব্দ (=১৭৩১ খৃষ্টাব্দ)। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে গ্রন্থকারকে অন্ততঃ খৃঃ সপ্তদশ শতকের শেষভাগের লেখক মনে করা অযৌক্তিক নহে।

১ এসিয়াটিক সোসাইটি ক্যাটালগ, ৩য়, ২০৯৪-২০৯৫ ;
ইণ্ডিয়া অফিস ক্যাটালগ, ৩য় ভাগ, ১৪৮২-৮৪।
প্রারম্ভিক শ্লোক হইতে মনে হয়, 'তিথিকলা', 'শ্রাদ্ধকলা' প্রভৃতি ষোলটি কলা বা অংশে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল।

২ এসিয়াটিক সোসাইটি, ২০৯৬।

৩ ঐ, ২৬০৪।

২০। মধুসূদন চট্টবাচস্পতি

—অশৌচসংক্ষেপ[১]।

২১। মধুসূদন বাচস্পতি ভট্টাচার্য

(১) অশৌচনির্ণয়[২], (২) অশৌচসংগ্রহ[৩]।

২২। মহেশ্বর পঞ্চানন

—স্মৃতিসার[৪]। (ইহাতে বিদ্যাসাগরের পুত্র বলিয়া গ্রন্থকারের পরিচয় দেওয়া আছে।)

২৩। যাদবেন্দ্র শর্মা

—শূদ্রাহ্নিকসাগরসার[৫]। (গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, 'গৌড়মহীমহেন্দ্র রঘুপতি'র অনুপ্রেরণায় গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল।)

২৪। রঘুনাথ সার্বভৌম

(১) স্মার্তব্যবস্থার্ণব[৬], (২) সৎক্রিয়ামুক্তাবলী[৭], (৩) প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা[৮]। এই গ্রন্থগুলি হইতে জানা যায় যে, গ্রন্থকার ছিলেন মহা মহোপাধ্যায়, বন্দ্যঘটীয় বংশসম্ভূত এবং নবদ্বীপান্তর্গত উলানিবাসী। আরও জানা যায়, গ্রন্থকার নদীয়া রাজ-পরিবারের 'রায় রাঘব নৃপতি'র পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটির ক্যাটালগ, ৩য় ভাগ, ২৭৫০ সংখ্যক পুথিতে এই রাজার নাম কামদেব।

১ ঢা. ইউ., ২৬৯৮; এসিয়াটিক সোসাইটি, ২২৮৫—২২৮৭।

২ ঢা. ইউ., ২২৩১ বি।

৩ ঢা. ইউ., ২৯০৮; এসিয়াটিক সোসাইটি, ২২৮৪। এই মধুসূদন ও মধুসূদন চট্টবাচস্পতি এক ব্যক্তি কিনা বলা কঠিন হইলেও, মনে হয় 'অশৌচসংগ্রহ' চট্টবাচস্পতিরই রচনা; কারণ ইহার প্রারম্ভিক শ্লোকে গ্রন্থকারের নামের পূর্বে 'চট্ট' শব্দটির প্রযোগ আছে।

৪ ঢা. ইউ. ৪৫৮১।

৫ ঐ, ২৬৭।

৬ ঢা. ইউ., ১৩৩ বি; ব. সা. প, ৫৯৪, ১০৩৫, ১৫৩৮; এসিয়াটিক্ সোসাইটি, ২০৭৫-২০৮২।

৭ ব. সা. প., ৭৩১; এসিয়াটিক্ সোসাইটি, ২৭৫০-২৭৫৪।

৮ ব. সা. প. ১২৭৭।

২৫। রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি

(১) প্রায়শ্চিত্তরহস্য[১], (২) স্মৃতিরত্নাবলী[২], (৩) স্মৃতিরহস্য, (৪) সময়রহস্য, (৫) সম্বন্ধরহস্য, (৬) শ্রাদ্ধরহস্য, (৭) সংস্কাররহস্য, (৮) যজ্ঞরহস্য, (৯) দায়রহস্য, (১০) সংস্কারপদ্ধতিরহস্য, (১১) ধার্মিক-কর্মরহস্য, (১২) স্মৃতিপরিভাষাটীকা, (১৩) সামগমন্ত্রব্যাখ্যান, (১৪) শুদ্ধ্যাদি সংগ্রহ, (১৫) দুর্গাপূজাপদ্ধতি।

২৬। রাধামোহন শর্মা

কৃষ্ণমূর্তিপ্রতিষ্ঠাপ্রয়োগ।[৩]

'অদ্বৈতকুলজাত' বলিয়া গ্রন্থকারের পরিচয় ইহাতে আছে।

২৭। রাধামোহন গোস্বামী ভট্টচায[৪]

(১) স্বত্বনির্ণয়,[৫] (২) প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থানির্ণয়।

এই গ্রন্থ দুইটি ছাড়াও, রঘুনন্দনের 'শুদ্ধি-','মলমাস-','দায়-','একাদশী-', ও 'প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বের', উপর ইঁহার রচিত টীকা বা টিপ্পনী আছে[৬]।

গোস্বামীর গ্রন্থসমাপ্তিসূচক বাক্যগুলিতে 'কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশসম্ভব' বলিয়া তাঁহার পরিচয় আছে। সুতরাং মনে হয় ইঁনি ও পূর্বোক্ত রাধামোহন শর্মা অভিন্ন ব্যক্তি।

ইনি শান্তিপুরের গোস্বামী ভটাচায নামে খ্যাত। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন[৭] যে, রাধামোহন পাশ্চাত্ত্য

১ ঢা. ইউ., ৩৩৫সি।
২ ২-১৫ সংখ্যক গ্রন্থের জন্য দ্রষ্টব্য 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান'।
৩ ঢা. ইউ., ১৪৩০ ডি।
৪ ইঁহার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য 'বাঙ্গালীর সারস্বত-অবদান,' পৃঃ ২৩৭-২৪১।
৫ ঢা. ইউ., ২০৬১ ডি।
৬ বিভিন্ন তন্ত্রের উপর ইঁহার রচিত টীকাটিপ্পনীর জন্য দ্রষ্টব্য—নো. মি., ৩য় ভাগ, সংখ্যা ১১৪৯-১১৫০; ৫ম ভাগ, সংখ্যা ২১১৬; নো. শা., ১০ম ভাগ, সংখ্যা ৩৩৭৪; এসিয়াটিক্ সোসাইটির ক্যাটলগ, ৩য় ভাগ, সংখ্যা ১৯৬৭ ইত্যাদি।
৭ নো. শা., ১০ম ভাগ, (৩৩৭৪ সংখ্যক পুথির বিবরণ প্রসঙ্গে)।

পণ্ডিত কোলব্রুকের (খৃঃ ১৮শ-১৯শ শতক) বন্ধু ছিলেন। রাধামোহন ন্যায়, ব্যাকরণ, ছন্দ, সাহিত্য ও বৈষ্ণব সাহিত্য প্রভৃতিতে সুপণ্ডিত ছিলেন।

২৮। রামগোবিন্দ শর্মা।

ব্যবস্থাসারসংগ্রহ[১]।

(গ্রন্থকারের পরিচয় –বালিচামত গ্রামনিবাসী চট্ট-কুলোদ্ভব রামগোপালের পুত্র।)

২৯। রামচন্দ্র শর্মা।

স্মৃতিকৌমুদী[২]।

৩০। রামচন্দ্র ভট্টাচার্য

(১) স্মৃতিতত্ত্বসংগ্রহ[৩],

(২) দায়ভাগটীকা (ভরতশিরোমণি সম্পাদিত দায়ভাগের সংস্করণে প্রকাশিত)।

৩১। বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য

দুর্গাপূজাপদ্ধতি[৪]।

৩২। বেণীনাথ শর্মা।

দুর্গাপূজাপদ্ধতি[৫]।

(গ্রন্থকারের পরিচয়—নারায়ণ ও শ্রীমতীর পুত্র এবং লম্বোদরের প্রপৌত্র)।

৩৩। বেদাচার্য

স্মৃতিরত্নাকর[৬]।

১ ঢা. ইউ., ১৭২৩।

২ ঢা ইউ, ১৪৪১।

৩ ঐ, ৬৬১ এ। বঙ্গদেশীয় একাধিক লেখকের এই নাম ছিল (দ্রষ্টব্য—ই. হি. কো, ১৯শ বর্ষ, ১৯৪৩)।

৪ ঐ, ২২৫৮।

৫ ঐ, ৩৭৯৫।

৬ ঐ ৭৩৪।

৩৪। শ্রীনিবাস পণ্ডিত

—শুদ্ধিদীপিকা[১]।

'মহিন্তাপনীয়' বলিয়া গ্রন্থকারের পরিচয় দেওয়া আছে।

৩৫। হরিনারায়ণ শর্মা

—শুদ্ধিতত্ত্বকারিকা[২]।

৩৬। হলায়ুধ

—দশকর্মমন্ত্রব্যাখ্যা[৩]।

এই যুগের গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'বিবাদভঙ্গার্ণব'[৪] গ্রন্থখানিও উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে যে, বৃটিশ বিচারকগণের হিন্দু আইন সম্যক্‌ভাবে বুঝিবার জন্য স্যর উইলিয়ম জোন্সের উৎসাহে ত্রিবেণীনিবাসী রুদ্রতর্কবাগীশের পুত্র সুপণ্ডিত জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন এই গ্রন্থের সংকলন করেন। এই গ্রন্থের উত্তরাধিকার (succession) ও সংবিদ্‌ (contract) অংশ কোলব্রুক কর্তৃক ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছিল; এই অনুবাদই Colebrooke's Digest নামে খ্যাত। তদানীন্তন বৃটিশ বিচারালয়ে এই গ্রন্থের প্রভূত প্রভাব ছিল।

বর্তমান শতকে পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্গত ময়মনসিংহ জেলার স্বর্গত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের রচিত 'উদ্বাহচন্দ্রালোক', 'শুদ্ধিচন্দ্রালোক' ও 'ঔর্ধ্বদেহিক চন্দ্রালোক' নামে তিনখানি স্মৃতিনিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

ক্ষয়িষ্ণু যুগে উক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও প্রসিদ্ধ গ্রন্থের বহু টীকাটিপ্পনী রচিত হইয়াছিল; এইগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত টীকাটিপ্পনীসমূহ প্রধান।[৫]

১ ব. সা. প. ৭৯৪, ২৬৪২-২৬৪৫।

২ এসিয়াটিক সোসাইটি, ২২৯১-২২৯২।

৩ ঢা. ইউ., কে ৫৫৪।

৪ বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—হি. ধ., ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৫-৪৬৬।

৫ যে সমস্ত লেখক শুধু টীকাই রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের নামই এখানে হইল। এই যুগের যে লেখকেরা টীকা এবং অন্য গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম পূর্বেই লিখিত হইয়াছে।

(টীকাকারগণের নাম অ-কারাদিক্রমে লিখিত হইল)

১। অচ্যুত চক্রবর্তী

(১) দায়ভাগসিদ্ধান্তকুমুদচন্দ্রিকা[১]

ইহা জীমূতবাহনের 'দায়ভাগে'র টীকা।

(২) সন্দর্ভসূচিকা[২]

অনিরুদ্ধের 'হারলতা'র এই টীকা অচ্যুতের রচিত বলিয়া মনে করা হয়।

(৩) শ্রাদ্ধবিবেকটিপ্পনী ('দায়ভাগে'র স্ব-রচিত টীকায় তিনি এই টিপ্পনীর উল্লেখ করিয়াছেন[৩]।)

২। কাশীরাম বাচস্পতি

ইনি রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে অনেক তত্ত্বের টীকা রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত তত্ত্বগুলির টীকাই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) মলমাসতত্ত্ব[৪], (২) তিথিতত্ত্ব[৫], (৩) উদ্বাহতত্ত্ব[৬], (৪) শুদ্ধিতত্ত্ব[৭], (৫) শ্রাদ্ধতত্ত্ব[৮], (৬) প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব[৯], (৭) দায়তত্ত্ব[১০], (৮) একাদশীতত্ত্ব[১১], (৯) জন্মাষ্টমীতত্ত্ব[১২], (১০) দুর্গোৎসবতত্ত্ব[১৩]।

১ পূর্বোক্ত ভরত শিরোমণি-সম্পাদিত 'দায়ভাগে'র সহিত প্রকাশিত। এই টীকায় প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম এই যে, ইহাতে প্রারম্ভিক শ্লোক নাই।

২ হি. ধ., ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৯।

৩ অস্মৎকৃত শ্রাদ্ধবিবেকটিপ্পন্যামনুসন্ধেয়ম্—উপরি-উক্ত দায়ভাগটীকা, পৃঃ ৪৪।

৪ এই গ্রন্থের বঙ্গবাসী সংস্করণে প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

৫ ,, ,, ,, ,, ,, ,, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ।

৬ চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণের (কলিকাতা, ১৩১২ বঙ্গাব্দ) ও রাজকুমার স্মৃতিবেদতীর্থের (কলিকাতা, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ) সংস্করণে প্রকাশিত।

৭ বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

৮ বঙ্গবাসী সংস্করণে (কলিকাতা, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ) ও চারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্যের সংস্করণে (কলিকাতা, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত।

৯ ঢা. ইউ., ৩৮৭০।

১০ নো. মি, ৩য় ভাগ. ১১৪৩।

১১ ঐ, ১১৪৫।

১২ ইণ্ডিয়া অফিস ক্যাটালগ (এগেলিং), ৩য় ভাগ. ১৪২১।

১৩ ঐ।

এই টীকাগুলির প্রারম্ভিক শ্লোকসমূহ হইতে জানা যায় যে, কাশীরামের পিতা ও পিতামহের নাম ছিল যথাক্রমে রাধাবল্লভ ও রামকৃষ্ণ।

৩। কাশীনাথ তর্কালঙ্কার

(১) তিথিতত্ত্ব-টীকা[১],

(২) প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বটীকা[২]।

৪। গঙ্গাধর

—শ্রাদ্ধতত্ত্বভাবার্থদীপিকা[৩]।

৫। গুরুপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ ভট্টাচার্য।

—শুদ্ধিতত্ত্বব্যাখ্যা[৪]।

৬। জগদীশ

—ভাবার্থদীপিকা[৫]।

ইহা শূলপাণির 'শ্রাদ্ধবিবেকে'র টীকা।

৭। মহেশ্বর ভট্টাচার্য

ভরত শিরোমণিকৃত 'দায়ভাগে'র সংস্করণে ১০।১ পর্যন্ত মহেশ্বরের একটি টীকা প্রকাশিত হইয়াছে।

৮। রতিকান্ত তর্কভূষণ

—তত্ত্বপ্রবোধিনী[৬]।

ইহা রঘুনন্দনের 'মলমাসতত্ত্বে'র টীকা।

৯। রামচন্দ্র

—তিথিতত্ত্বটীকা[৭]।

১ নো. শা (সেকেণ্ড সিরিজ), ১ম ভাগ, সংখ্যা ১৫০।
২ ঐ, সংখ্যা ২৩৮।
৩ ইণ্ডিয়া অফিস ক্যাটালগ (এগেলিং), ৩য় ভাগ. সংখ্যা ১৪৩৭।
৪ নো. শা. (সেকেণ্ড সিরিজ), ১ম ভাগ,, সংখ্যা ৩৬৮।
৫ নো. মি., ৬ষ্ঠ ভাগ, সংখ্যা ২০৮০।
৬ ঢা. ইউ., ৬৪৮ ইউ।
৭ ঐ, ৫১৪।

১০। রামকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য

—শ্রাদ্ধবিবেককৌমুদী[১]।

ইহা শূলপাণির 'শ্রাদ্ধবিবেকে'র টীকা।

১১ রামকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য

—শ্রাদ্ধবিবেক ব্যাখ্যা[২]।

শূলপাণির শ্রাদ্ধবিবেকের ব্যাখ্যা।

১২ রামচন্দ্র তর্কাচায ন্যায়বাচস্পতি

—প্রদীপ[৩]।

শূলপাণির 'শ্রাদ্ধবিবেকে'র টীকা। টীকাটি হইতে জানা যায়, টীকাকারের অপর নাম হরিদাস এবং তাঁহার পিতা ছিলেন চণ্ডীশরণ ভট্টাচার্য।

১৩। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার

(১) দায়ভাগপ্রবোধিনী[৪]।

জীমূতবাহনকৃত 'দায়ভাগে'র সর্বাধিক পরিচিত ও প্রামাণ্য টীকা।

(২) শ্রাদ্ধবিবেকবিধিটীকা বা শ্রাদ্ধবিবেকবিবৃতি[৫]।

ইহা শূলপাণির 'শ্রাদ্ধবিবেকে'র টীকা।

উক্ত টীকাগুলি ছাড়াও, ভবদেব ভট্টের 'কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি'র 'সংসার-পদ্ধতিরহস্য' নামে একটি টীকা আছে[৬]।

১ নো, শা. (সেকেণ্ড সিরিজ), ২য় ভাগ, সংখ্যা ২২৮।

২ ঐ।

৩ ব. সা. প., ক্রমিক সংখ্যা ১৫৯১।

৪ 'দায়ভাগে'র নিম্নলিখিত সংস্করণগুলিতে মুদ্রিত :—

(১) ভরতশিরোমণির সংস্করণ (পূর্বোক্ত),

(২) জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮৯৩,

(৩) নীলকমল বিদ্যানিধির সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

৫ মূলসহ সম্পাদিত—চারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য. কলিকাতা, ১৮৬১ শকাব্দ।

৬ হি. ধ., ১ম ভাগ, পৃঃ ৩০৬ (.টীকাকারের নামোল্লেখ নাই)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধসাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমি[১]।

কোন দেশের সাহিত্য সেই দেশের সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাদ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হইয়া থাকে। এই কথা স্মৃতিনিবন্ধের ক্ষেত্রে সবিশেষ প্রযোজ্য; কারণ, এই জাতীয় গ্রন্থের রচয়িতারা শুধু পাণ্ডিত্যপ্রদর্শনের প্রয়াসই করেন নাই, সামাজিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মূল স্মৃতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সময়োপযোগী আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টাও করিয়াছেন। অতএব, যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বাংলাদেশে এই বিপুল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার পর্যালোচনার প্রয়োজন। এই সাহিত্যের ক্রমবিকাশের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে, মোটামুটি খৃঃ ১১শ হইতে ১৬শ শতক পর্যন্ত কালকে এই সাহিত্যের সৃষ্টিযুগ (creative period) বলা চলে। বর্তমান পরিচ্ছেদে বাংলার এই পাঁচশত বৎসরের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালবংশের পতনের পরে এই দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পোষক সেনগণের রাজত্ব স্থাপিত হয়। বিজয় সেন হইতে আরম্ভ করিয়া কেশব সেন পর্যন্ত, অর্থাৎ খৃঃ ১১শ হইতে ১৩শ শতকের প্রথম পাদ অবধি, সেনরাজগণ বঙ্গসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সূক্ষ্মভাবে বলিতে গেলে সামন্ত সেনই এই বংশের প্রথম রাজা। কিন্তু, সামন্ত সেন ও তৎপুত্র হেমন্ত সেনের নাম ছাড়া আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন এই প্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্রোহী শাসকগণকে পরাভূত করিয়া সমগ্র প্রদেশের উপর স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন এবং 'অরিরাজবৃষভশঙ্কর' উপাধি ধারণ করেন।

১ বর্তমান প্রসঙ্গে হি. বে., ১ম ও ২য় ভাগ, সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রাজ্যের বিস্তার করিয়া ইনি 'অরিরাজনিঃশঙ্কশঙ্কর' উপাধিতে নিজকে ভূষিত করেন। তাঁহাকে আমরা শুধু রাজা হিসাবেই জানিনা। তাঁহার নামাঙ্কিত প্রকাণ্ড ও প্রামাণ্য স্মৃতিনিবন্ধগুলির[১] মধ্যে কোন্‌টি তাঁহার স্বরচিত এবং কোন্‌টি তাঁহার গুরু অনিরুদ্ধ-প্রণীত তাহা নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও এই গ্রন্থগুলি বল্লালের জ্ঞানানুরাগ ও বিদ্যোৎসাহিতার সাক্ষ্য বহন করে, সন্দেহ নাই। সমাজসংস্কারক স্বরূপেও তিনি বঙ্গদেশে সুবিদিত। যে সমস্ত সমাজসংস্কার তিনি করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়, তন্মধ্যে কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্তনই সমধিক উল্লেখযোগ্য।

বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ সেন বাংলার শেষ হতভাগ্য স্বাধীন হিন্দুরাজা। পূর্বপুরুষগণের শৈবমত ত্যাগ করিয়া তিনি বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। 'বঙ্গের রবি জয়দেব কবি' ইঁহারই রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, ধোয়ী, উমাপতিধর, শরণদেব ও গোবর্ধনাচার্য[২] প্রভৃতি কবি ও পণ্ডিতকুলাবতংস এই বিদ্যোৎসাহী রাজার সভা ভূষিত করিয়াছিলেন এবং অক্ষয় কীর্তিস্বরূপ স্ব স্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্যতম স্তম্ভ হলায়ুধ[৩] ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের প্রধান মন্ত্রী ও ধর্মাধ্যক্ষ।

শাসক এবং বিজেতা হিসাবেও লক্ষ্মণের কীর্তি নগণ্য নহে। গৌড়, কামরূপ, কলিঙ্গ ও কাশী প্রভৃতি অঞ্চলের শাসকগণকে পরাস্ত করিয়া তিনি 'অরিরাজমদনশঙ্কর' উপাধি ধারণ করেন। কিন্তু তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে রাজ্যে নানাপ্রকার অশান্তি দেখা দেয়। আঞ্চলিক প্রধান পুরুষেরা তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন; ফলে রাষ্ট্র দুর্বল হইয়া পড়ে। এই সুযোগে তুর্কী যোদ্ধা বখ্‌তিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে একদল মুসলমান বাংলাদেশ আক্রমণ করে। এই দুর্ধর্ষ শত্রুকে প্রতিরোধ করিবার মত রাজশক্তি বা জাতীয়তাবোধে দেশবাসীর ঐক্যবন্ধন ছিল না। অসহায় রাজা পূর্ববঙ্গে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু

১ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বল্লাল সেনের প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।
২ ইনি লক্ষ্মণ সেনের সভাশ্রিত ছিলেন কিনা সেই বিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ পোষণ করেন।
৩ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হলায়ুধ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

আত্মমর্যাদা হারাইয়া ফেলিলেন। খৃঃ ১৩শ শতকের প্রথম দশকে কোন সময়ে তিনি মৃত্যুর ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করিলেন। মুস্‌লিম রাহুর কবলিত বঙ্গের গৌরবরবি চিরতরে অস্তমিত হইল।

লক্ষ্মণ সেনের দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন নামেমাত্র অল্পকালের জন্য রাজা ছিলেন; খৃঃ ১৩শ শতকের মধ্যভাগে হিন্দুরাজত্ব বঙ্গদেশ হইতে নির্মূল হইয়া গেল।

সেনরাজগণের রাজত্বকাল্ বাংলার গৌরবময় যুগ। সমগ্র প্রদেশে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া তাঁহারা যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন, তেমনি যে-বৌদ্ধধর্ম হিন্দুর সমাজ ও ধর্ম-জীবনের আমূল পরিবর্তন সাধন করিতেছিল তাহাকে প্রতিরোধ করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

নবদ্বীপ-বিজয়ের পরে মুসলমানেরা গৌড় ও বরেন্দ্রকে পদানত করিল। অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র বঙ্গভূমি বিজেতার বশ্যতা স্বীকার করিল। এই সময়ে বহু হিন্দুকে ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত করা হইল এবং হিন্দুর মঠ মন্দির ধ্বংস করিয়া সেই সকল স্থানে মস্‌জিদ স্থাপিত হইল।

বখ্‌তিয়ার আলি মর্দান কর্তৃক নিহত হইলে বঙ্গে অরাজকতা দেখা দিল। খৃঃ ১২২৭ হইতে ১২৮৭—এই ষাট বৎসরের মধ্যে অন্যূন পনরজন শাসনকর্তা ক্রমে এই দেশ শাসন করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে দশজন ছিলেন দিল্লীর মাম্‌লুক। এই মাম্‌লুকগণের শাসনকাল নিরবচ্ছিন্ন অন্তর্দ্রোহ, একের দ্বারা অপরের অধিকারলোপ ও হত্যার কাহিনীতে কণ্টকিত।

তুঘ্‌রল খাঁ নামক এক ব্যক্তি দিল্লীর স্থলতান গিয়াস্‌ উদ্দিন বল্‌বনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে স্থলতান তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া স্বীয় পুত্র বুঘ্‌রা খাঁকে বাংলার শাসনকার্যে নিযুক্ত করেন।

বল্‌বনদের রাজত্বকালে হিন্দু সমাজে নিপীড়িত বহু নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং বৌদ্ধ ও হিন্দুগণের দেবায়তন প্রভৃতির ধ্বংসস্তূপের উপরে মুসলমানগণের দরগাদি স্থাপিত হয়।

ইহার পর হইতে ইলিয়াস্‌ শাহী বংশের অভ্যুত্থান পর্যন্ত বাংলাদেশ নানা অবস্থা অতিক্রম করে। প্রথমে হয় বাংলার উপরে মাম্‌লুক

সুলতানদের প্রভুত্বের বিলোপ; তৎপর, সুলতান মহম্মদ তুঘ্‌লক্‌ কর্তৃক হয় স্বীয় সাম্রাজ্যে বাংলার অন্তর্ভুক্তি এবং অবশেষে তুঘ্‌লক প্রভাবের অবসান।

ইলিয়াস্‌ শাহী বংশের শাসনকালে বাংলাদেশে আফ্রিকাবাসী পর্যটক ইব্‌ন্‌ বাতুতা আসিয়া তাৎকালিক আর্থিক অবস্থা ও নৈসর্গিক দৃশ্যের এক মনোজ্ঞ বর্ণনা রচনা করেন।

এই বংশের রাজত্বকালের পরে নির্বাপিত হিন্দুশিখা ক্ষণকালের জন্য পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়াছিল। রাজা গণেশ বা দনুজমর্দনদেব অতি অল্প-কালের জন্য রাজত্ব করিবার পরে, তৎপুত্র জয়মল বা যদু ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হিন্দুধর্মে পুনর্দীক্ষিত হওয়ার পরেও তিনি উক্ত ধর্ম পুনরায় গ্রহণ করেন এবং জালাল উদ্দিন নামে পিতার উত্তরাধিকারী হন। ইনি সংস্কৃত বিদ্যা ও ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রচর্চার যে পোষকতা করিতেন, তাহার প্রমাণ বিদ্যমান। তাঁহারই দরবারে থাকিয়া সুপণ্ডিত বৃহস্পতি রায়মুকুট স্মৃতিগ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন। সম্ভবতঃ খৃঃ ১৪৩১ অব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে জালাল উদ্দিন পরলোক গমন করেন।

তৎপর দ্বিতীয় পর্যায়ের ইলিয়াস্‌ শাহী বংশ খৃঃ ১৫শ শতকের শেষ পর্যন্ত এই দেশ শাসন করেন। ইহার পরে হুসেন শাহী বংশ খৃঃ ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বঙ্গসিংহাসনে অধিষ্ঠান করেন। এই বংশের হুসেন শাহ্‌ ও তৎপুত্র নুসরৎ শাহ্‌-এর শাসনাধীনে বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়[১]।

১ নিদর্শনস্বরূপ বলা যায়, হুসেনের অধীনে কর্মরত অবস্থায় রূপগোস্বামী কয়েকটি সংস্কৃতকাব্য রচনা করেন; অবশ্য, তাঁহার গ্রন্থে গৌড়েশ্বর হুসেনের নামোল্লেখ নাই। গৌড়দরবারের কর্মচারী যশোরাজ খান স্ব-রচিত একটি পদের ভণিতায় 'শ্রীযুত হুসন জগতভূষণ' বলিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। হুসেনের অপর এক কর্মচারী বিদ্যাপতি একটি পদে লিখিয়াছেন—শাহ হুসেন ভৃঙ্গসম নাগর মালতী শ্রেণীক জুইা। তিনি নুসরৎ সম্বন্ধেও লিখিয়াছেন— কবিশেখর ভন অপরূপ রূপ দেখি।
রায় নসরৎ শাহ্‌ ভুললি কমলমুখি॥ ইত্যাদি।
হুসেনের সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর বাংলা ভাষায় 'মহাভারত-কাব্য' রচনা করেন। পরাগলের পুত্র ছুটিখাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী জৈমিনি-সংহিতা অশ্বমেধপর্বের বঙ্গানুবাদ করেন।

ইহার পর বাংলার শাসনভার পড়ে আফগানদের হাতে। ইঁহারা খৃঃ ষোড়শ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত এই দেশ শাসন করেন এবং তাহার পরে মুঘল প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

উল্লিখিত রাজনৈতিক পটভূমিকায় বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধ সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছিল। সম্প্রতি সমাজ-ও ধর্ম-জীবনের পটভূমি আমাদের আলোচ্য।

যে সাহিত্য[১] হইতে মধ্য যুগীয় বঙ্গদেশের সমাজ-চিত্র অঙ্কিত করা যায়, তাহা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; যথা—সংস্কৃত ও বাংলা। যে সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থে এই যুগের সামাজিক অবস্থা প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রধান 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'[২] ও 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'[৩]। এই দুই গ্রন্থ যে বাঙ্গালীর রচনা, সেই বিষয়ে যুক্তিপ্রমাণের অভাব নাই। সম্ভবতঃ খৃঃ ১২শ হইতে ১৪শ শতকের মধ্যে কোন কালে এই দুই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল[৪]।

যে সমস্ত বাংলা গ্রন্থের সাহায্যে এই যুগের সমাজ-ও ধর্ম-জীবন সম্বন্ধে ধারণা করা যায়, তাহাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য:—

(১) বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' (খৃঃ ১৫শ শতক)[৫],

(২) বংশীবদনের (বা, বংশীদাসের) 'মনসামঙ্গল' (খৃঃ ১৬শ শতক[৬],)

(৩) মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' (খৃঃ ১৬শ শতকের শেষ ভাগ),

(৪) বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' (আঃ খৃঃ ১৬শ শতকের মধ্যভাগ),

১ বাংলার তদানীন্তন সমাজ-জীবনের সম্যক্ ধারণা লাভে উৎকীর্ণ লিপিমালা (epigraphy) ও মূর্তিশিল্প (iconography) যথেষ্ট সাহায্য করে। কিন্তু, ঐ দুইটি বিদ্যা বিশেষজ্ঞের অধিগম্য বলিয়া আমরা সাহিত্যের সাক্ষ্যেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিব।

২ বি. ই. সংস্করণ, কলিকাতা।

৩ বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা।

৪ এই দুই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য ও রচনাকাল সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য হি. বে., ১ম ভাগ, অধ্যায় ১৫ এবং 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' পৃঃ ২৫৯-২৬০।

৫ এই গ্রন্থকে সুকুমার সেন আরো অর্বাচীন মনে করেন।

৬ সুকুমার সেনের মতে, এই গ্রন্থ ১৭শ শতকেরও পরবর্তীকালের রচনা।

(৫) রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' (খৃঃ ১৭শ শতক),

(৬) 'ময়নামতীর গান' (খৃঃ ১৭শ শতক)।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলির রচনাকাল অধিকাংশ স্থলেই নিঃসন্দিগ্ধ নহে। তবে, ইহা অবিসংবাদিত যে, ১২০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন নাই। এই যুগ তুর্কী বিজয়োত্তর ধ্বংসের যুগ এবং বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, সাহিত্য ইতিহাস নহে। সুতরাং, এই সমস্ত গ্রন্থে অতিশয়োক্তি অতিরঞ্জন প্রভৃতি থাকিবারই কথা। কিন্তু, ইহাদের সাক্ষ্যকে একেবারে অমূলক বলিয়া বর্জন করাও সমীচীন নহে।

বাংলা কুলজী গ্রন্থসমূহে সামাজিক জীবনের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু, উহাদের ঐতিহাসিকত্ব নিঃসন্দিগ্ধ নহে বলিয়া উহাদিগকে বর্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত করা হইল না।

পূর্বে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, এই দেশে স্মৃতিনিবন্ধ সাহিত্যের পত্তন হইয়াছিল পালরাজ বংশের পতন ও সেন বংশের অভ্যুত্থানকালে। তখন বৌদ্ধধর্ম নানাভাবে বঙ্গসমাজে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং এই প্রভাব কতক পরিমাণে নিবন্ধসাহিত্যের ক্রমবিকাশকাল ব্যাপিয়াই বিদ্যমান ছিল। বৌদ্ধপ্রভাবের সাহিত্যিক প্রমাণ 'শূন্যপুরাণে' এবং খেলারাম, রূপরাম প্রভৃতি কর্তৃক রচিত বহু ধর্মমঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায়।

স্মৃতিনিবন্ধযুগের প্রথমভাগে যখন ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থান হইতেছিল, তখন ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বৌদ্ধগণের নিপীড়ন সম্বন্ধে 'শূন্যপুরাণ'[১]-এর নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি কয়টি প্রণিধানযোগ্য :—

বলিষ্ট হৈল বড় দস বিস হয়্যা জড়
সদ্ধর্মিরে করএ বিনাস॥

(সদ্ধর্মী = বৌদ্ধ)

১ নগেন্দ্র বসুর সংস্করণ, ১৩১৪, পৃঃ ১৪০। গ্রন্থের এই অংশটি, স্বর্গত দীনেশ সেন মহাশয়ের মতে, প্রক্ষিপ্ত।

এই যুগের শেষভাগে মুসলমানগণ কর্তৃক হিন্দুদের ধর্মকার্যে বিঘ্নসৃষ্টি প্রভৃতি নানাপ্রকার উৎপীড়নের কথা অনেক বাংলা গ্রন্থেই পাওয়া যায়। উক্ত 'শূন্যপুরাণে'[১] এই উৎপীড়নের নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা আছে:—

জতেক দেবতাগণ হয়্যা সভে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর।
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিয়া ধর্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিসম গণ্ডগোল।

'গণ্ডগোলে'র বর্ণনার কিয়দংশ নিম্নে দেওয়া গেল:

ব্রাহ্মণের জাতিধ্বংস হেতু নিরঞ্জন
সাম্বাইল জাজপুরে হইয়া যবন।
* * *
হাতে পুঁথি কর‍্যা যত দেয়াসী পালায়।
ভালের তিলক যত পুঁছিয়া ফেলিল
ধর্মের গাজনে ভাই যবন আইল।

অনুরূপ চিত্র মৈথিল বিদ্যাপতির অবহট্‌ঠে লেখা 'কীর্তিলতা'তেও পাওয়া যায়। মিথিলায় মুসলমান অত্যাচারের কাহিনী বাংলার পক্ষেও প্রযোজ্য।

বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গলে' যবন কর্তৃক অত্যাচারের নিম্নলিখিত রূপ বর্ণনা আছে:—

* * *
তথায় যবন বসে দুই বেটা শঠ॥
* * *
যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাৎ।
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজীর সাক্ষাৎ॥

১ উক্ত সংস্করণের ১৪২ পৃঃ।

বৃক্ষতলে থুইয়া মারে বজ্রকিল।
যে যে ব্রাহ্মণের পৈতা দেখে তারা কান্ধে।
পেয়াদা বেটা লাগ পাইলে তার গলায় বান্ধে॥
ব্রাহ্মণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে।
তার পৈতা ছিড়ি ফেলে থু দেয় মুখে॥

বংশীদাসের 'মনসামঙ্গলে' এইরূপ অত্যাচারের বর্ণনা ছাড়াও, মুসলমান কর্তৃক বলপূর্বক হিন্দুর জাতিনাশের কথা আছেঃ—

ব্রাহ্মণের জাতিনাশ করিবার ছলে।
কর্ণেতে কলিমা পড়ে যবন সকলে॥

কিন্তু, ব্রাহ্মণ্যধর্মের এমনই প্রাণশক্তি যে, বৌদ্ধধর্মের সঙ্ঘাতে এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বিগণের আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টায়ও এই ধর্মের মূল উৎপাটিত হয় নাই। বর্ণাশ্রমধর্মের যে ভিত্তিতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম যুগ যুগ ধরিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই ভিত্তির দৃঢ়তা এই যুগেও শিথিল হয় নাই। 'ময়নামতীর গানে' দেখা যায়, গোপীচাঁদের মাতা তাঁহাকে নীচকুলজাত হাড়ি সিদ্ধাকে গুরুত্বে বরণ করাইতে বহু চেষ্টা করিলেও গোপীচাঁদ নিম্নলিখিতরূপে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেনঃ—

যখন ধর্মী রাজা হাড়ির নাম শুনিল।
রাধাকৃষ্ণ রামনাম কর্ণে হস্ত দিল॥
ওগো মা জননী ডুবালু মা জাতিকুল আর সব গাও।
বাইশ দণ্ড রাজা হঞা হাড়ির ধরব পাও॥

খৃঃ ১৩শ-১৪শ শতকে বর্ণধর্মের কঠোরতার বর্ণনা 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'ও 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত পুরাণে[১] ষোলটি প্রধান ও কুড়িটি সংকরবর্ণ মোট ছয়ত্রিশটি বর্ণের কথা আছে। বর্ণের নামে ও সংখ্যায় 'ব্রহ্মবৈবর্তে'[২] কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও 'বৃহদ্ধর্মো'ক্ত অনেক বর্ণই ইহাতে আছে। মধ্যযুগের বাংলাদেশে যে বর্ণধর্মের দৃঢ়বন্ধন ছিল, তাহার ভূরি

১ ২।১৩।৩৯, ৪৯।
২ ব্রহ্মখণ্ড—১০।১৬-২১।

ভূরি প্রমাণ অনেক বাংলা গ্রন্থে আছে। হরিরামের 'চণ্ডীকাব্যে' (আঃ খৃ: ১৬শ শতাব্দী) বঙ্গদেশের অধিবাসীকে গৌড়জ, বঙ্গজ, বারেন্দ্র ও রাঢ়ী প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণ বর্ণান্তর্গত প্রায় ত্রিশটি উপবর্ণের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে, ব্রাহ্মণেতর বর্ণকে বলা হইয়াছে কায়স্থ এবং ইহাদের বৃত্তি অনুযায়ী ইহাদিগকে সুবর্ণবণিক, শঙ্খবণিক্ প্রভৃতি দ্বাদশাধিক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে'ও বর্ণের ভাগবিভাগগুলি প্রায় অনুরূপ।

বৈষ্ণব[১] ও তান্ত্রিক ধর্মের প্রসঙ্গ আলোচনা না করিলে এই যুগের বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা ও ধর্মজীবনের চিত্রটি সম্পূর্ণ হয় না। কোন্ সুদূর অতীতে বৈষ্ণব ধর্ম এই দেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে, একথা সত্য যে, শ্রীচৈতন্যের বহুকাল পূর্ব হইতেই এই ধর্ম এদেশে প্রচলিত ছিল। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্ম নবরূপ লাভ করিল এবং বঙ্গভূমি নবভাবরসে আপ্লুত হইল। খৃঃ ১১শ হইতে ১৬শ শতকের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম যে বঙ্গবাসীর হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ রহিয়াছে বৈষ্ণবধর্মপ্রভাবিত বহু সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থে। এই জাতীয় সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য যথাক্রমে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এবং চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' ও চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত অসংখ্য পদাবলী। সমাজ বৈষ্ণবধর্মের যে যুগান্তকারী প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ চৈতন্যভক্ত যবন হরিদাসের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা এবং আলাওল ও সৈয়দ মর্তুজা প্রভৃতি কর্তৃক বৈষ্ণবধর্ম প্রভাবিত বাংলা কাব্যের রচনা। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে সুপ্রাচীন বর্ণধর্মের প্রতি একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী সমাজের একাংশে দেখা দিয়াছিল। 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ' (চৈতন্যচরিতামৃত)—এই জাতীয় উক্তি এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক।

১ বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্মের বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য :—
Early History of the Vaisnava Faith and Movement (S. K. De)।

তান্ত্রিক প্রভাব বাংলাদেশে ছিল অতি ব্যাপক। তন্ত্রের বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত প্রভৃতি সমস্ত রূপের অস্তিত্বই এ যুগের বাংলাদেশে বিদ্যমান ছিল[১]। দীর্ঘকাল পূর্ব হইতেই তন্ত্রগ্রন্থ বঙ্গদেশে রচিত হইয়া আসিতেছিল এবং তন্ত্রোক্ত শক্তিপূজা, রহস্যময় মণ্ডল, মুদ্রা ও যন্ত্র প্রভৃতি হিন্দুর ধর্মজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল।

ঈদৃশ রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকায় বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধ সাহিত্যের জন্ম ও পরিপুষ্টি হইয়াছিল। এই যুগে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান রাজগণের আবির্ভাব, দ্রুত উত্থানপতন এবং ধর্মজীবনে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইস্‌লাম প্রভৃতি নানা ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। এইরূপ অবস্থায় স্মার্ত পণ্ডিতগণ নিয়মের নিগড়ে সমাজ-সংরক্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় এই যুগে এই বিশাল সাহিত্যের ও উহার টীকাটিপ্পনীগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল।

১ বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত রচিত Obscure Religious Cults নামক গ্রন্থ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধের বিষয়বস্তু[1]

বাংলাদেশের স্মৃতিনিবন্ধসাহিত্যে আলোচিত বিষয়গুলিকে মোটামুটি ভাবে নিম্নলিখিত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়:—

(ক) আচার,

(খ) প্রায়শ্চিত্ত,

(গ) ব্যবহার।

আচারাংশে এমন বিষয় নাই যে সম্বন্ধে এ দেশের নিবন্ধকারেরা আলোচনা করেন নাই। রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের নামগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে সামাজিক ও ধর্মজীবন সংক্রান্ত কোন আচার-অনুষ্ঠানকেই তাঁহারা উপেক্ষা করেন নাই। বর্তমান গ্রন্থের পরিসরে সমস্ত গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তুর আলোচনা সম্ভবপর নহে। সুতরাং, এখানে আমরা এমন বিষয়গুলিই আলোচনা করিব যেগুলি হিন্দুসমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত এবং তদানীন্তন সমাজের চিত্র অঙ্কনে ও ঐতিহ্যবোধে সর্বাপেক্ষা অধিক সহায়ক। এই বিষয়গুলি নিম্নলিখিতরূপ:—

১। বিবাহ, ৩। শ্রাদ্ধ,

২। অন্যান্য সংস্কার, ৪। ব্রত ও পূজা।

প্রায়শ্চিত্তাংশও বিশাল। পাপের ভাগবিভাগ ও প্রায়শ্চিত্তের বিধি-নিষেধ অতি জটিল। প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে বঙ্গীয় স্মার্তগণের মতামত সাধারণ ভাবে আলোচিত হইবে।

১ এখানে বক্তব্য এই যে, এই সাহিত্যের আলোচনায় স্মৃতির প্রমাণাংশই আমাদের বিবেচ্য; সুতরাং প্রয়োগ পদ্ধতির আলোচনা এখানে করা হইবে না; কারণ, সামাজিক চিত্রাঙ্কনই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

ব্যবহারাংশ সকলের পক্ষেই কৌতূহলোদ্দীপক। ইহার প্রধান কারণ এই যে, সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির 'দায়ভাগ' নামক টীকা বাঙ্গালী জীমূতবাহনের রচনা; ইহা ভারতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে এবং আধুনিক যুগ অবধি বাঙ্গালীসমাজকে একটি অতি অপরিহার্য বিষয়ে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে[১]। এই অংশে বাঙ্গালীর দান কতটুকু ও কিরূপ তাহার আলোচনা যথাস্থানে করা হইবে।

(ক) আচার

১। বিবাহ

বিবাহ একটি সংস্কার। তথাপি ইহা সর্বাপেক্ষা প্রধান সংস্কার এবং এই বিষয়ে বিবিধ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে—এইসব কারণে, বিবাহের আলোচনা পৃথক্‌ভাবে করা যাইতেছে।

বিবাহবিষয়ক নিবন্ধ

বিবাহবিষয়ক প্রধান নিবন্ধগুলি নিম্নলিখিতরূপ :—

(১) ভবদেবের 'সম্বন্ধবিবেক',

(২) শূলপাণির 'সম্বন্ধবিবেক',

(৩) শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণির 'বিবাহতত্ত্বার্ণব' ও

(৪) রঘুনন্দনের 'উদ্বাহতত্ত্ব'।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলির নাম কালানুক্রমে লিখিত হইল। রঘুনন্দনোত্তর যুগেও বিবাহ সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই যুগের গ্রন্থগুলিতে নূতনত্ব কিছুই নাই। গোপাল ন্যায়পঞ্চানন স্বীয় 'সম্বন্ধনির্ণয়ে' স্পষ্টই বলিয়াছেন—সম্বন্ধোঽয়ং গোপালেন কৃতঃ স্মার্তস্য বর্ত্মনা। 'উদ্বাহব্যবস্থা', 'উদ্বাহসংক্ষেপ' প্রভৃতির নাম হইতেই উহাদের স্বরূপ বুঝা যায়। 'বিবাহবাদার্থ', 'বিবাহবিচার' প্রভৃতি গ্রন্থে 'বিবাহ' পদটির

১ ভারত স্বাধীন হইবার পর অবশ্য হিন্দুর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন কানুন আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে।

নিরুক্তি ও বিবাহ-ব্যাপারের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনাই প্রধান। সুতরাং, এই সমস্ত গ্রন্থে গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্যের পরিচয় থাকিলেও, সামাজিক অবস্থার উপরে ইহারা কোন আলোকপাতই করে না। 'স্মৃতিসাগর' নামক গ্রন্থটি বিবাহবিষয়ক প্রধান নিবন্ধনিচয়ের সংগ্রহ মাত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত ইহার অংশটি রঘুনন্দনের 'উদ্বাহতত্ত্ব' ছাড়া আর কিছুই নহে। এই যুগের লেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ শূদ্রের বিবাহ সম্বন্ধে নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু, ঐ সমস্ত নিবন্ধ শুধু বিবাহের প্রয়োগপদ্ধতি লইয়াই রচিত। পশুপতির নামাঙ্কিত 'শূদ্রবিবাহপদ্ধতি' এই জাতীয় গ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণের (?) 'উদ্বাহকৌমুদী'তে বিবাহের সম্বন্ধে প্রমাণাংশের আলোচনা কিছু থাকিলেও তাহা গতানুগতিক।

বাচস্পতিমিশ্রের নামাঙ্কিত 'সম্বন্ধচিন্তামণি'[১] গ্রন্থটি বাংলাদেশের কিনা সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তাহা ছাড়া, এই গ্রন্থেও অভিনবত্ব কিছু নাই।

পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জিলার স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের 'উদ্বাহ-চন্দ্রালোকে'[২] গ্রন্থকার গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করেন নাই। তিনি প্রচলিত অনেক ধারণা ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু, তিনি নিতান্তই আধুনিক লেখক এবং তাঁহার মতবাদ সমাজে গৃহীতও হয় নাই।

উল্লিখিত কারণাধীনে, বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা শুধু ভবদেব, শূলপাণি, শ্রীনাথ ও রঘুনন্দনের গ্রন্থের উপরেই নির্ভর করিতেছি। ভবদেবের 'সম্বন্ধবিবেকে'র সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় না। বর্তমান প্রসঙ্গের সূচনায় যে সংস্করণের উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত একটি অতি ক্ষুদ্র পুঁথি অবলম্বনে প্রকাশিত; ঐ পুঁথি সম্ভবতঃ মূল গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্তসারমাত্র। ভবদেবের 'কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি'তে সংস্কার হিসাবে বিবাহের আনুষ্ঠানিক দিকটি আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং, উহা আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের সহায়ক নহে।

১ সং সুরেশ ব্যানার্জি—ই হি. কো., ৩২, সংখ্যা ৪।
২ ময়মনসিংহ জিলার টাউন সেরপুর হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত।

বিবাহ কাহাকে বলে ?

বাংলাদেশের নিবন্ধকারগণের মধ্যে রঘুনন্দনই সর্বপ্রথম বিবাহের স্বরূপ স্পষ্টভাবে নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রাহ্মবিবাহের সংজ্ঞাবোধক মনুসংহিতার শ্লোকে[১] প্রযুক্ত 'দান' শব্দটির পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়া এবং নিপুণ যুক্তিবলে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বরকর্তৃক কন্যার ভার্যাত্বসম্পাদক গ্রহণের নামই বিবাহ[২]। বিবাহের এই সংজ্ঞা 'বিবাহ' পদের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থের অনুকূল। বিশেষভাবে এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে কন্যার বহনই এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ। 'সম্বন্ধনির্ণয়ে' গোপালের সংজ্ঞায়[৩] বিবাহের ভার্যাত্বসম্পাদকত্বরূপ যে তাৎপর্য তাহারই উল্লেখ নাই। আইনের চক্ষে এবং ধর্মানুষ্ঠানের পক্ষে ভার্যাত্বসম্পাদকত্বই বিবাহে প্রধান ব্যাপার।

পাত্রের যোগ্যতা

পাত্রের বিবাহযোগ্য বয়স সম্বন্ধে কেহই কিছু বলেন নাই। তবে, শ্রীনাথের ন্যায় রঘুনন্দনও সংবর্তের যে বচন[৪] উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায় .য, ছাত্রাবস্থার সমাপ্তিই াববাহের উপযুক্ত কালনির্দেশক। ইহা হইতে বিবাহযোগ্য বয়স স্পষ্ট বুঝা যায় না; কাবণ, প্রাচীনকালে গুরুগৃহে বাসের প্রথা দীর্ঘকাল পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে। উপনয়নান্তর যে বেদাধ্যয়ন আরব্ধ হয় তাহার সমাপ্তিই সাধারণতঃ বিবাহের সময় বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু, উপনয়নের বয়স বর্ণভেদে বিভিন্ন[৫]।

পাত্রের যোগ্যতা সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিধি না থাকিলেও, অনুমান করা যায় যে, সদ্‌গুণাবলীব অধিকারী না হইলে কোন ব্যক্তি সমাজে যোগ্যপাত্র বলিয়া বিবেচিত হইত না। পাত্রীর বিবাহযোগ্য বয়স সম্বন্ধে

১ ৩।২৭।
২ ভার্যাত্বসম্পাদকং গ্রহণং বিবাহঃ—স্মৃতিতত্ত্ব, ২, পৃঃ ১০৬।
৩ পিত্রাদিকর্তৃককন্যোৎসর্গানন্তরং বরস্বীকারো বিবাহঃ।
৪ অতঃপরং সমাবৃত্তঃ কুর্যাদ্ দারপরিগ্রহম্—স্মৃতিতত্ত্ব, ২, পৃঃ ১০৬।
৫ দ্রঃ—মনুস্মৃতি, ২।৩৬।

স্পষ্ট বিধি থাকা সত্ত্বেও বঙ্গীয় নিবন্ধকারেরা মনুর বচন[১] সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, নির্গুণ পাত্রে কন্যাসম্প্রদান অপেক্ষা অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার আজীবন পিতৃগৃহে বাসও শ্রেয়। 'উৎকৃষ্ট' পাত্র পাইলে অপ্রাপ্ত-বয়স্কা কন্যাকেও তাঁহার সহিত বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে—মনুর এই শ্লোকের[২] সমর্থন করিয়াছেন রঘুনন্দন। 'উৎকৃষ্ট' শব্দের অর্থ কুলাচার প্রভৃতিতে প্রশংসনীয়। ইহা হইতে মনে হয় যে, পাত্রের কুলশীলের উৎকর্ষ সর্বাপেক্ষা অধিক বিচার্য বিষয় ছিল।

রঘুনন্দন ও গোপাল প্রভৃতি পরবর্তী লেখকগণ কর্তৃক উদ্ধৃত বচনাদি হইতে মনে হয় যে, বধিরতা, উন্মাদ, জড়তা, এমন কি ক্লীবত্ব প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক বিকারযুক্ত পাত্রেরও বিবাহে নিষেধ ছিল না। জীমূতবাহন 'দায়ভাগে'[৩] নিয়োগপ্রথার উল্লেখ করিয়া ক্লীবের বিবাহ সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হয়ত তাঁহার যুগে ঐ প্রথা বঙ্গসমাজে প্রচলিত ছিল। কিন্তু, তৎপরবর্তী কালে ইহার প্রচলন ছিল কিনা তাহার কোন প্রমাণ নাই।

বহুবিবাহ

'উদ্বাহতত্ত্ব'-ধৃত একটি বচনে বলা হইয়াছে যে, যিনি তিনবার বিবাহ করিয়াছেন তিনি অবশ্য চতুর্থবার বিবাহ করিবেন[৪]। এই বিধি 'তিন' সংখ্যার অমঙ্গলত্ব সম্বন্ধে কোন সংস্কারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিতই হউক, বা ইহার কোন নিগূঢ় কারণই থাকুক, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ঐ যুগে বহু নারী বিবাহ করিবার প্রথা শাস্ত্রসম্মত ছিল। একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে জীমূতবাহন 'আধিবেদনিক' নামে একপ্রকার স্ত্রীধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন; পতি পত্ন্যন্তর গ্রহণ করিলেই পূর্বপত্নীকে যে অর্থাদি অবশ্য

১ ৯।৮৯।
২ ৯।৮৮।
৩ ৫।১৮।
৪ স্মৃতিতত্ত্ব, ২, পৃঃ ১১৫।

দান করিবেন তাহারই নাম 'আধিবেদনিক'। লক্ষ্য করা যায় যে, জীমূতবাহনের পরবর্তী কোন বাঙ্গালী নিবন্ধকারই ইহার উল্লেখ করেন নাই। এমন কি 'দায়তত্ত্বে' স্ত্রীধনের আলোচনাতেও রঘুনন্দন আধিবেদনিক সম্বন্ধে নীরব। নীরবতার যুক্তিতে (argumentum ex silentio) কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না বটে। কিন্তু, জীমূতবাহনোত্তর সমস্ত নিবন্ধেই আধিবেদনিকের অনুল্লেখকে নিতান্ত আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করা যায় না। এমন হইতে পারে যে, জীমূতবাহনোত্তর অধিকাংশ প্রধান নিবন্ধকার বল্লালসেনের (খ্রীঃ দ্বাদশ শতক) পরবর্তী; সুতরাং তৎপ্রবর্তিত কৌলীন্যের ফলে যখন বহুবিবাহ ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়াছিল তখন সম্ভবতঃ আধিবেদনিকের বিধি বিশেষ কেহই মানিত না বলিয়া নিবন্ধকারেরাও ইহার কোন ব্যবস্থা করেন নাই।

পরিবেত্তা

জ্যেষ্ঠভ্রাতার পূর্বে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ পাতিত্যজনক। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'পরিবেত্তা' এই নিন্দাসূচক আখ্যা লাভ করিবেন। এই পাপের গুরুত্ব এত অধিক যে, এইরূপ বিবাহের সঙ্গে সংযুক্ত সকলেই, এমন কি পুরোহিত পর্যন্ত, পতিত হইবেন। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার একদিনে বিবাহও রঘুনন্দনের অভিপ্রেত নহে[১]। এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুককর নিয়ম এই যে, চতুর্বর্ণের বহির্ভূত লোকের জ্যেষ্ঠত্ব জন্মকালের দ্বারা নির্ধারিত হইবে না। ভ্রাতাদের মধ্যে যে অধিকতর গুণবিশিষ্ট সে-ই জ্যেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা যদি নিম্নলিখিতরূপ[২] হয়, তাহা হইলে তাহার পূর্বে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ অশাস্ত্রীয় নহে:—

প্রবাসী, ক্লীব, 'একবৃষণ', বৈমাত্রেয়, বেশ্যাসক্ত, পতিত, শূদ্রতুল্য,

১ একোদরপ্রসূতানামেকস্মিন্নেব বাসরে।
বিবাহো নৈব কর্তব্যো গর্গস্য বচনং যথা॥—স্মৃতিতত্ত্ব, ২, পৃঃ ১২০।

২ স্মৃতিতত্ত্ব, ২, পৃঃ ১২০।

'অতিরোগী'[১], জড়বুদ্ধি[২], মূক, অন্ধ, বধির, কুব্জ, বামন, 'কুণ্ঠক'[৩], অতিবৃদ্ধ, 'অভার্য'[৪], রাজার কৃষিকর্মে নিযুক্ত, কুসীদজীবী, স্বেচ্ছাচারী[৫], 'কুলট'[৬], উন্মত্ত অথবা চোর।

রাজসেবা, কৃষিকর্ম প্রভৃতিতে নিযুক্ত বা প্রবাসী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বিবাহযোগ্য বয়স প্রাপ্ত হইলেও, অন্ততঃ তিন বৎসরকাল অপেক্ষা করিবে। প্রবাসী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিরুদ্দেশ হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার জন্য মাত্র এক বৎসরকাল অপেক্ষা করিয়া বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু, তৎপরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফিরিয়া আসিলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা পরিবেদনরূপ পাপের বিহিত প্রায়শ্চিত্তের এক চতুর্থাংশ সম্পাদন করিয়া পাপমুক্ত হইতে পারিবে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা যদি জ্ঞান, পুণ্য বা ধনার্জনের জন্য বিদেশবাসী হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চতুর্বর্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যথাক্রমে বার, দশ, আট ও ছয় বৎসব অপেক্ষা করিবে। সাধারণ অবস্থায় জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতার বিবাহের পৌর্বাপর্য যে তৎকালে মানিয়া চলা হইত তাহা রঘুনন্দনেব 'বিবাহস্ত্বনুমত্যাপি দোষায়'[৭] এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়।

ভবদেবের মতে, সন্ন্যাসী, রোগার্ত, প্রবাসী, ক্লীব ও মহাপাতকী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পূর্বে বিবাহ করিলে কনিষ্ঠ ভ্রাতার কোন দোষ হয় না। শূলপাণি ও শ্রীনাথ এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করেন নাই।

পাত্রীর যোগ্যতা

হিন্দুর বিবাহ একটি সংস্কার, চুক্তি (contract) নহে; সুতরাং, পাত্রী নাবালিকা হইলে কোন দোষ নাই, বরংচ নাবালিকা অবস্থায় বিবাহই নিবন্ধকারগণের মতে শ্রেয়। রঘুনন্দন কর্তৃক উদ্ধৃত প্রায় সমস্ত

১ জীবনসংশয়কর বা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিগ্রস্ত।
২ ভালমন্দ বিচারের শক্তিহীন।
৩ 'সর্বক্রিয়ালসঃ'।
৪ শাস্ত্রমতে বিবাহের অযোগ্য; যেমন বানপ্রস্থ।
৫ শ্রুতি ও স্মৃতির বিরুদ্ধ কর্ম যে করে।
৬ দত্তকপুত্র (কুলাৎ অটতি—স্বকুলাৎ পরকুলং গচ্ছতি)।
৭ স্মৃতিতত্ত্ব, ২, পৃঃ ১২৩।

শাস্ত্রবাক্য অনুসারেই পাত্রীর বয়স আট বৎসরের কম বা বার বৎসরের বেশী নহে। এই নিয়মের ব্যতিক্রমবশতঃ কন্যা পিতৃগৃহে রজোদর্শন করিলে তাহার পিতামাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নরকগামী হইবেন এবং তাহাকে যে বিবাহ করিবে সে শূদ্রতুল্য বলিয়া সমাজে পরিগণিত হইবে। ইহা হইতে মনে হয়, তিন বর্ণের পক্ষেই এই নিয়ম প্রযোজ্য এবং ইহার ব্যতিক্রমে শূদ্রের পক্ষে কোন দোষ নাই। 'মহাভারত' হইতে একটি প্রথার উল্লেখ করিয়া রঘুনন্দন যেন বলিতে চাহেন যে, বার বৎসরের অধিককালও কন্যা পিতৃগৃহে বাস করিতে পারে যদি ততদিনেও তাহার রজোদর্শন না হয়। এই সমস্ত কারণে মনে হয়, তদানীন্তন বঙ্গসমাজে কন্যার বয়স যাহাই হউক তাহার রজোদর্শনের পূর্বেই বিবাহ অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। রঘুনন্দন কিন্তু এই নিয়মের অন্ধ আনুগত্য অনুমোদন করেন নাই। মনুর একটি বচন অবলম্বনে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, নির্গুণ পাত্রে কন্যার সমর্পণ অপেক্ষা তাহার আজীবন পিতৃগৃহে বাসও শ্রেয়। তিনি আরো বলিয়াছেন যে, উপযুক্ত পাত্র পাইলে অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্বেও কন্যার বিবাহে কোন দোষ নাই। এই দেশের অন্যান্য নিবন্ধকারেরা এই বিষয়ে কিছু আলোচনা না করিয়া শুধু আভাস দিয়াছেন যে, পাত্র অপেক্ষা পাত্রী বয়ঃকনিষ্ঠা হইবে।

সাতপ্রকার 'পৌনর্ভবা'[১] কন্যা এবং নিম্নলিখিতরূপ কন্যা বিবাহে বর্জনীয়া:—(১) পিঙ্গলবর্ণা, (২) অধিকাঙ্গী, (৩) রোগগ্রস্তা, (৪) অঙ্গে অধিক রোমযুক্তা বা রোমহীনা, (৫) মুখরা, (৬) নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, সর্প, পক্ষী প্রভৃতির নামধারিণী বা ভীতিজনক নামযুক্তা।

পাত্র যদি নিজের মাতার নামধারিণী কোন কন্যাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহাকে পাপমুক্ত হইতে হইবে।

১ সপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্যা বর্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ।
বাচা দত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা॥
উদকস্পর্শিতা যা তু যা চ পাণিগৃহীতিকা।
অগ্নিং পরিগতা যা চ পুনর্ভূপ্রভবা চ যা॥
রঘুনন্দন-ধৃত কাশ্যপের বচন (স্মৃতিতত্ত্ব, ২, পৃঃ ১১৯)।

বাগ্‌দানের পরে এই ব্যাপার জানা গেলে, কন্যার পিতার অনুমতিক্রমে ব্রাহ্মণগণ তাহার নাম পরিবর্তন করিলে সে বিবাহযোগ্যা হইবে।

অশুভ কর- বা পদ-চিহ্নযুক্ত কন্যার বিবাহে নিষেধ দেখা যায় না। রঘুনন্দনের মতে ঈদৃশী কন্যা ঐহিক অমঙ্গলজনক হইতে পারে, কিন্তু পাতিত্যাদি দোষ পারত্রিক অশুভের সূচক। সুতরাং, পাতিত্যাদি দোষ-রহিতা কন্যার হস্তপদে অশুভ চিহ্ন থাকিলে সে বিবাহের অযোগ্যা নহে।

ভবদেব পাত্রীর উক্তপ্রকার দোষের কোন উল্লেখ করেন নাই। শূলপাণি ও শ্রীনাথ রোগ ছাড়া কন্যার অন্য দোষের আলোচনা করেন নাই। রোগের মধ্যে যে সমস্ত রোগের চিকিৎসা নাই সেইরূপ রোগাক্রান্তা কন্যা বর্জনীয়া।

উক্ত উভয় নিবন্ধকারই যাজ্ঞবল্ক্যের মত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, পাত্রী 'কান্তা'[১] হওয়া প্রয়োজন। কান্তা পদের ব্যাখ্যায় শ্রীনাথ আপস্তম্বের মতের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

> বোঢুর্মনশ্চক্ষুষোরানন্দকরীং, যস্যাং মনশ্চক্ষুষোর্নিবন্ধস্তস্যাং ঋদ্ধিরিত্যাপস্তম্বস্মরণাৎ।

অর্থাৎ, যে পাত্রীকে দেখিলে পাত্রের নয়নমন তৃপ্ত হয়, তাহাকে বিবাহ করা উচিত।

শ্রীনাথ পাত্রীর লক্ষণগুলিকে 'বাহ্য' ও 'আভ্যন্তরীণ' ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। উল্লিখিত লক্ষণগুলি বাহ্য ও সহজে জ্ঞেয়। কিন্তু, তাঁহার মতে, বুদ্ধি, নৈতিক চরিত্র প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ লক্ষণগুলি 'দুর্বিজ্ঞেয়'। পাত্রীর আভ্যন্তরীণ লক্ষণের জ্ঞানার্থে আশ্বলায়নের মতানুসারে শ্রীনাথ একটি কৌতুককর পদ্ধতির কথা লিখিয়াছেন। উহা এইরূপ। নিম্নলিখিত স্থানগুলি হইতে মাটি সংগ্রহ করিতে হইবে:—

১ অনন্যপূর্বিকাং কান্তাম্—ইত্যাদি ; যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, ১।৩।৫২।

উর্বরাভূমি, গোচারণভূমি, বেদি, 'বিক্রয়স্থান' বা বাজার, হ্রদ, 'ঈরিণক্ষেত্র' বা ঊষরভূমি, চতুষ্পথ ও শ্মশান ।

প্রত্যেক প্রকার মাটি দিয়া এক একটি পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া পিণ্ডগুলি পর পর সাজাইয়া রাখিতে হইবে। তৎপর, উপযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক প্রস্তাবিতা পাত্রীর আভ্যন্তরীণ গুণাগুণ প্রকাশের জন্য ঐ মৃৎপিণ্ডগুলির নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। ইহার পর, পাত্রীকে যে কোন একটি পিণ্ড লইতে বলা হইবে। কোন্ পিণ্ড গ্রহণে পাত্রীর কি কি দোষগুণ সূচিত হয় তাহা নিম্নে লিখিত হইল:—

উর্বরাভূমি	—	ধনধান্যবতীত্ব,
গোচারণভূমি	—	গৃহপালিত জন্তুর উপর অধিকার,
বেদিভূমি	—	অগ্নিশুশ্রূষা,
বিক্রয়স্থানের ভূমি	-	বিবেক, বুদ্ধি ও জনপ্রিয়তা,
হ্রদ[1]		
ঊষরভূমি	—	বন্ধ্যাত্ব,
চতুষ্পথ	—	অসতীত্ব,
শ্মশান	—	পতিনাশ।

যে কন্যার পিতা অজ্ঞাত সে বিবাহের অযোগ্যা। নিবন্ধকারগণের ব্যবস্থা অনুযায়ী সবর্ণ অথচ অসগোত্রা কন্যা বিবাহযোগ্যা। কন্যার বর্ণ ও গোত্র নির্ধারণ করিতে হইলে, তাহার পিতৃপরিচয় স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

পুত্রিকাপুত্র

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের মত অনুসরণ করিয়া শূলপাণি ও শ্রীনাথ ভ্রাতৃহীনা কন্যাকে বিবাহের অযোগ্যা বলিয়াছেন। ইহার কারণ শূলপাণি স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন—

ভ্রাতৃমতীমিতি গুপ্তপুত্রিকাশঙ্কানিরাসার্থম্[2]।

১ 'বিবাহতত্ত্বার্ণবে'র এই অংশ অস্পষ্ট।

২ সম্বন্ধবিবেক, পৃঃ ৭।

অর্থাৎ, কন্যার গুপ্তপুত্রিকাত্বের আশঙ্কা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃমতী কন্যাকে বিবাহ করা উচিত। 'মিতাক্ষরা'র মতে[১], পুত্রিকাপুত্র দুই প্রকার হইতে পারে; যথা—(১) কন্যার পুত্র, (২) পুত্ররূপে মনোনীতা কন্যা। পুত্রহীন ব্যক্তি নিজের সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও পারলৌকিক কার্যাদির জন্য হয় কন্যাকে মনোনীত করিতেন, না হয় কন্যার ভাবী পুত্রকে স্বীয় পুত্ররূপে নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিতেন[২]। এই বিষয়ে রঘুনন্দন কিছু বলেন নাই; ইহার কারণ এমন হইতে পারে যে, তাঁহার সময়ে এই রীতি সমাজে আর প্রচলিত ছিল না। শূলপাণি এবং শ্রীনাথের কালেও সম্ভবতঃ এই প্রথা শিথিল হইয়া আসিতেছিল; কারণ, প্রাচীন স্মৃতিতে ভ্রাতৃহীনা কন্যা বিবাহার্থে নিষিদ্ধা হইলেও, এই নিবন্ধকারেরা ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, পুত্রিকাপুত্রত্বের আশঙ্কা না থাকিলে এইরূপ কন্যা বিবাহযোগ্যা বটে[৩]। গোপালের গ্রন্থে ভ্রাতৃহীনা কন্যার নিষেধ আছে। প্রাচীন স্মৃতির বচনের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তিনি এই নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সময়ে পুত্রিকাপুত্রত্ব বঙ্গসমাজে প্রচলিত ছিল বলিয়া কোন আভাস তিনি দেন নাই। বস্তুতঃ, বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা যে যুগের সমাজের আলোচনা করিতেছি, সেই যুগের বহু পূর্বেই, বাংলায় কেন, সমগ্র ভারতেই যে এই প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছিল তাহার যুক্তিপ্রমাণ আছে[৪]।

দিধিষু, অগ্রেদিধিষু

জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর বিবাহের পূর্বে কনিষ্ঠার বিবাহ নিষিদ্ধ। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠার বিবাহ হইলে তাহাকে বলা হইবে 'অগ্রেদিধিষু' এবং জ্যেষ্ঠার নাম হইবে 'দিধিষু'। অগ্রেদিধিষুপতি দ্বাদশরাত্র কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপমুক্ত হইবেন এবং দিধিষুপতির পাপক্ষালন হইবে

১ দ্রষ্টব্য—Hindu Law and Usage—Mayne (১০ম সংস্করণ), পৃঃ ১১৩।

২ 'অস্যাং যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবিষ্যতি' ইত্যাদিরূপ।

৩ অভ্রাতৃকাপি পুত্রিকাশঙ্কাশূন্যা বিবাহ্যা এব—শূলপাণির 'সম্বন্ধবিবেক', পৃঃ ৭। যদি কেনাপি প্রকারেণ সা শঙ্কা নিবর্ত্তেত তদা অভ্রাতৃকাপি পরিণয়েৎ—বিবাহতত্ত্বার্ণব।

৪ দ্রঃ—শ্রীনরেশ সেনগুপ্তের 'পুত্রিকা' নামক প্রবন্ধ (জা. এ. সো., ১৯৩৮)।

কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রের দ্বারা। ইহা ছাড়াও, তাঁহাদিগের পরস্পর পত্নীবিনিময় করিতে হইবে। এই বিনিময় সম্ভবতঃ কেবল মন্ত্রদ্বারা হইত এবং একজনের অনুমতিক্রমে অপরজন স্বীয় বিবাহিতা পত্নীকে পুনরায় গ্রহণ করিতেন[১]। এই বিষয়ে লক্ষণীয় এই যে, কুরূপের জন্য জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে বিলম্ব হইলে কনিষ্ঠার বিবাহে কোন দোষ হয় না; ইহা বাঙ্গালী নিবন্ধকার-গণের মধ্যে একমাত্র রঘুনন্দনই বলিয়াছেন। পূর্বে হয়ত জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের পৌর্বাপর্যের নিয়ম অবশ্যপালনীয় ছিল। কিন্তু সামাজিক কল্যাণ ও পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য সম্ভবতঃ রঘুনন্দন এই নিয়মের প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

বাগ্দান ও বিবাহ

সাধারণতঃ এক পাত্রের উদ্দেশ্যে বাগ্দত্তা কন্যার অপরের সহিত বিবাহ হইতে পারে না। এই নিয়মলঙ্ঘনকারী পিতা চোরেব ন্যায় দণ্ডনীয় হইয়া থাকেন। কিন্তু, বাগ্দানের পরে যদি প্রস্তাবিত পাত্রের নিম্নলিখিত কোন দোষ আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে পাত্রান্তরের সহিত ঐ বাগ্দত্তা কন্যার বিবাহে কোন দোষ হয় না:—

নিন্দিত কুলশীল, সগোত্রত্ব, পাতিত্য, ক্লীবত্ব,
কুৎসিত রোগ, অপর কোনপ্রকার অযোগ্যতা।

সাধারণ অবস্থায়, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব—এই পাঁচ প্রকার বিবাহে একবার বাগ্দানের পরে অপর পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ হইতে পারে না। কিন্তু, আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ—এই তিন প্রকার বিবাহে, বাগ্দানের পরেও যোগ্যতর পাত্র পাইলে তাহার সহিতই পাত্রীর বিবাহ হইতে পারে।

বাগ্দানের পরে, প্রস্তাবিত পাত্রের মৃত্যু হইলে, বাগ্দত্তা কন্যাকে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করিতে কোন বাধা নাই। রঘুনন্দনের মতে, এরূপ ক্ষেত্রে পূর্বপাত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কন্যা, ইচ্ছা করিলে, পতিত্বে বরণ করিতে

১ দ্রঃ—হি, ধ, ২য় খণ্ড, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৫৪৭।

পারে। এখানে রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে, কন্যার পাণিগ্রহণ একবার হইয়া গেলে তাহাকে অন্য পাত্রে সম্প্রদান করা যায় না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি বিধবাবিবাহ সমর্থন করিতেন না। ইহাও মনে হয় যে, তাঁহার মতে, অবস্থাবিশেষে, বাগ্‌দান হইতে পাণিগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত, যে কোন সময়ে একের উদ্দেশ্যে বাগ্‌দত্তা কন্যার অপরের সহিত বিবাহে কোন বাধা নাই।

কন্যাশুল্ক বা কন্যার উদ্দেশ্যে অপর কিছু দ্রব্য দান করিয়া যদি কোন পাত্র বিদেশে যায়, তাহা হইলে এক বৎসরকাল অপেক্ষা করিয়া পাত্রীকে অন্য পাত্রে সম্প্রদান করা চলে। পূর্বব্যক্তির প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা থাকিলে অবশ্য তিন বৎসর অপেক্ষা করা বিধেয়।

যদি কোন কারণবশতঃ কোন কন্যা একের অধিক পাত্রের নিকট বাগ্‌দত্তা হইয়া থাকে এবং সকল পাত্রই বিবাহের জন্য এককালে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, কন্যাকে প্রথম পাত্রে সম্প্রদান করিয়া অপরাপর পাত্রের প্রদত্ত কন্যাশুল্ক প্রভৃতি ফিরাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু, পাত্রান্তরের সহিত কন্যার বিবাহের পরে যদি প্রথম পাত্র উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বিবাহ অসিদ্ধ হইবে না; প্রথম পাত্রকে তৎপ্রদত্ত কন্যাশুল্ক প্রভৃতি ফিরাইয়া দিতে হইবে।

বাগ্‌দত্তা কন্যার বিনাদোষে যদি পাত্র তাহাকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হয়, তাহা হইলে সেই পাত্রের আর্থিক দণ্ড তো হইবেই; উপরন্তু, ঐ কন্যাকে তাহার বিবাহ করিতে হইবে।

যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া বাগ্‌দত্তা কন্যাকে সম্প্রদান না করিলে পিতা সামাজিকভাবে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অলঙ্কার প্রভৃতিতে বর-পক্ষ যে টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহা সুদসহ ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকিবেন।

বাগ্‌দানের পরে কন্যার মৃত্যু হইলে, বরপক্ষ যাহা কন্যাকে দিয়াছিলেন তাহা ফেরৎ নিবেন।

উল্লিখিত নিয়মগুলিতে সমাজে শৃঙ্খলাস্থাপন, কন্যার মঙ্গল ও সকলের প্রতি সুবিচারের প্রয়াস দেখা যায়।

সগোত্রা কন্যা

প্রাচীন স্মৃতির বিবিধ বচন উদ্ধৃত করিয়া বঙ্গীয় নিবন্ধকারেরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ক্ষেত্রে সগোত্রা ও সমানপ্রবরা কন্যার বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন। রঘুনন্দনের মতে, গোত্র শব্দে বংশপরম্পরায় প্রসিদ্ধ আদিপুরুষ ব্রাহ্মণকে বুঝায়[১]। তৎকর্তৃক উদ্ধৃত একটি বচন অনুযায়ী গোত্র আটটি[২]। কিন্তু, রঘুনন্দন নিজেই ঐ গোত্রতালিকার বহির্ভূত 'বাৎস্য' ও 'সাবর্ণ' গোত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমানেও ঐ আট গোত্র ব্যতীত অন্য অনেক গোত্র সমাজে দেখা যায়। সুতরাং, মনে হয়, ঐ আটটি গোত্র শুধু উদাহরণস্বরূপ দেওয়া হইয়াছে।

'প্রবর' শব্দে বুঝায় গোত্রপ্রবর্তক মুনির সহচর এমন মুনিগোষ্ঠী যাহার দ্বারা ঐ গোত্রকে অপর গোত্র হইতে পৃথক্‌ভাবে বুঝা যায়[৩]। একই গোত্রের বিভিন্ন প্রবর থাকিতে পারে, আবার বিভিন্ন গোত্রের একই প্রবর থাকিতে পারে। দুই ব্যক্তিকে তখনই সমানপ্রবর বলা হয় যখন তাহাদের উভয়েরই প্রবরের সংখ্যা ও নাম একরূপ[৪]।

আদিপুরুষ ব্রাহ্মণ যদি গোত্র হয়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গোত্র এবং প্রবর কিরূপ হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে, তাহাদের পুরোহিতের গোত্রপ্রবরই তাহাদের নিজস্ব গোত্রপ্রবর[৫]। শূলপাণি ও শ্রীনাথ বলিয়াছেন যে, অসগোত্রা কন্যার বিবাহত্ব ব্রাহ্মণাদিবর্ণত্রয়ের পক্ষে প্রযোজ্য[৬]। শ্রীনাথ স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, শূদ্রের কোন গোত্র নাই[৭]।

১ স্মৃতিতত্ত্ব, ২, পৃঃ ১১১।

২ জমদগ্নির্ভরদ্বাজো বিশ্বমিত্রাত্রিগোতমাঃ।
বশিষ্ঠকশ্যপাগস্ত্যা মুনয়ো গোত্রকারিণঃ ॥ স্মৃতিতত্ত্ব, ২, পৃঃ ১১০।

৩ প্রবরস্তু গোত্রপ্রবর্তকস্য মুনের্ব্যাবর্তকো মুনিগণঃ। ঐ।

৪ সংজ্ঞাসংখ্যয়োরন্যূনানতিরিক্তত্বেন।

৫ পৌরোহিত্যান্ রাজন্যবিশাং প্রাবৃণীত—রঘুনন্দনের 'উদ্বাহতত্ত্ব'-ধৃত আশ্বলায়নের বচন।

৬ অসমানার্ষগোত্রজামিতি ব্রাহ্মণাদিবর্ণত্রয়বিষয়ম্—শূলপাণির 'সম্বন্ধবিবেক', পৃঃ ৮।

৭ অসমানার্ষগোত্রজামিতি তু ত্রৈবর্ণিকপরং শূদ্রস্য গোত্রাসত্ত্বাৎ—বিবাহতত্ত্বার্ণব।

রঘুনন্দন কিন্তু এই কথা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার যুক্তি এই যে, শূদ্রের যদি গোত্রই না থাকিবে তাহা হইলে সে শ্রাদ্ধের অধিকারী হয় কিরূপে? শ্রাদ্ধে গোত্রোল্লেখ অপরিহার্য। 'বৈশ্যবচ্ছৌচকল্পশ্চ' —মনুর (৫।১৪০) এই উক্তির 'চ'-হইতে রঘুনন্দন অনুমান করিয়াছেন যে, বৈশ্যের ন্যায় পিতৃ-পুরুষের পুরোহিতের গোত্রই শূদ্রের নিজস্ব গোত্র বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। তাঁহার মতে, শূদ্রের পক্ষে সগোত্রা ও সমানপ্রবরা কন্যার বিবাহ যে নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহার কারণ এই নহে যে, শূদ্রের গোত্র নাই। প্রকৃত কারণ এই যে, শূদ্রের গোত্র 'অতিদিষ্টাতিদিষ্ট'। প্রথমে ব্রাহ্মণের গোত্র বৈশ্যের ক্ষেত্রে 'অতিদিষ্ট' হইয়াছে; পুনরায় বৈশ্যগোত্র শূদ্রপক্ষে 'অতিদিষ্টাতিদিষ্ট' হইয়াছে। আশ্বলায়নের যে বচনানুসারে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গোত্রের কথা বলা হইয়াছে সেই বচনে অতিদিষ্টগোত্রের বিধান আছে; কিন্তু, অতিদিষ্টাতিদিষ্ট গোত্রের ব্যবস্থা নাই।

গোলাপ শাস্ত্রী বলিয়াছেন[১] যে, ব্রাহ্মণেতর বর্ণের নিজস্ব গোত্র নাই—এই কথা অযৌক্তিক। তাঁহার প্রধান যুক্তিগুলি এইরূপ। বিশ্বামিত্র ছিলেন জাতিতে ক্ষত্রিয়। বশিষ্ঠও খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন না। অথচ তাঁহারা গোত্রের প্রবর্তক এবং গোত্রপ্রবর্তক মুনির পূর্বপুরুষ। যদি পুরোহিতের গোত্রই ব্রাহ্মণেতর বর্ণের গোত্র হয়, তাহা হইলে যতবার পুরোহিতের পরিবর্তন হইবে ততবার গোত্রেরও পরিবর্তন হইবে। আবার, যদি পৌরোহিত্য পুরোহিতের দৌহিত্রের হাতে যায়, তাহা হইলেও গোত্রের পরিবর্তন হইবে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের গোত্রই যদি ব্রাহ্মণেতর বর্ণের গোত্র হয়, তাহা হইলে গোত্রতালিকার বহির্ভূত আলিম্যান, মৌদ্‌গল্যাদি গোত্র আজও পর্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে কিরূপে থাকিতে পারে?

সাপিণ্ড্যবিচার

সাপিণ্ড্য সম্বন্ধ যে-কন্যার সঙ্গে পাত্রের আছে সে কন্যা তাহার বিবাহের অযোগ্যা। বিবাহ প্রসঙ্গে সাপিণ্ড্যবিচার অতি জটিল। রঘুনন্দন এই সম্বন্ধে

১ তাঁহার আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—তৎপ্রণীত Hindu Law, পৃঃ ৬৮।

তাঁহার মতামত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন[১]। অল্প কথায় বলিতে গেলে, পাত্রের নিম্নলিখিতরূপ সম্বন্ধ যে পাত্রীর সঙ্গে আছে তাহাকে বিবাহ করা অবৈধ :—

প্রথম নিয়ম—(ক) পাত্রের পিতা ও তাঁহার ঊর্ধ্বতন ছয়পুরুষের প্রত্যেকাপেক্ষা অধস্তন সপ্তম ব্যক্তি পর্যন্ত পাত্রের পিতৃ-সপিণ্ড।

(খ) পাত্রের পিতৃবন্ধু ও তাঁহার ঊর্ধ্বতন ছয়পুরুষের প্রত্যেকাপেক্ষা অধস্তন সপ্তম ব্যক্তি পর্যন্ত পাত্রের পিতৃ-সপিণ্ড।

(গ) পাত্রের মাতামহ ও তাঁহার ঊর্ধ্বতন চারিপুরুষের প্রত্যেকাপেক্ষা অধস্তন পঞ্চম ব্যক্তি পর্যন্ত পাত্রের মাতামহ-সপিণ্ড।

(ঘ) পাত্রের মাতৃবন্ধু ও তাঁহার ঊর্ধ্বতন চারিপুরুষের প্রত্যেকাপেক্ষা অধস্তন পঞ্চম ব্যক্তি পর্যন্ত পাত্রের মাতামহ-সপিণ্ড।

পিতৃবন্ধু নিম্নলিখিতরূপ[২] :—

(১) পিতামহের ভাগিনেয়, (২) পিতামহীর ভগ্নীপুত্র, (৩) পিতামহীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

মাতৃবন্ধু নিম্নলিখিতরূপ :—

(১) মাতামহীর ভগ্নীপুত্র, (২) মাতামহের ভগ্নীপুত্র, (৩) মাতামহীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

দ্বিতীয় নিয়ম— উক্ত নিয়মগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে লঙ্ঘন করিলে দোষ হয় না। যথা—

১ দ্রঃ—Sir Gurudas Banerji রচিত Marriage and Stridhana নামক গ্রন্থ, পৃঃ ৬৭।

২ S. V. Karandikar তাঁহার Hindu Exogamy (Bombay, 1929) গ্রন্থে (পৃঃ ২০৩-২০৪) বলিয়াছেন যে, প্রাক্-রঘুনন্দন কোন স্মৃতিকার পিতৃবন্ধু ও মাতৃবন্ধুর ক্ষেত্রে বিবাহার্থে সপিণ্ড বর্জনের বিধির কথা বলেন নাই। এই ধারণা ভ্রান্ত; কারণ, রঘুনন্দন এই ব্যাপারে শূলপাণি ও শ্রীনাথের মতের পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র।

১। পাত্রের পিতৃকুল, পিতৃবন্ধুর কুল, মাতামহকুল ও মাতৃবন্ধুকুল হইতে ত্রিগোত্রান্তরিতা কন্যা, উক্ত সপ্তম বা পঞ্চমপুরুষের মধ্যে হইলেও, বিবাহযোগ্যা।

প্রথম নিয়মের বিকল্প হিসাবে কেহ কেহ, প্রধানতঃ পৈঠীনসি, ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, পিতৃপক্ষের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ ও মাতৃপক্ষের অধস্তন তৃতীয় পুরুষ বর্জন করিয়া অন্য পুরুষের কন্যা বিবাহযোগ্যা। শূলপাণির মতে, এই বৈকল্পিক ব্যবস্থা (ব্রাহ্মণের পক্ষে ?) আসুরাদি চারিপ্রকার নিন্দিত বিবাহে এবং ক্ষত্রিয়াদির (সমস্ত প্রকার ?) বিবাহে প্রযোজ্য[১]। শূলপাণির এই মত সম্বন্ধে স্বর্গত গুরুদাস ব্যানার্জি বলেন[২] যে, যোগ্যতর পাত্রের অভাবেই শুধু এই নিয়ম চলিতে পারে। কিন্তু, শূলপাণির গ্রন্থ হইতে এমন কথা বুঝা যায় না। রঘুনন্দন বলেন, পৈঠীনসির বচনের মর্ম এই যে, পঞ্চম ও তৃতীয় পুরুষের মধ্যে বিবাহ অধিকতর পাপজনক[৩]; সপ্তম ও পঞ্চম পর্যন্ত পুরুষের মধ্যে বিবাহজনিত পাপ অপেক্ষাকৃত লঘু।

পাত্রের বিমাতার ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং ভ্রাতুষ্পুত্রীর কন্যাও তাহার বিবাহের অযোগ্যা।

অসবর্ণ বিবাহ

প্রাচীন স্মৃতি অনুসারে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু, বঙ্গীয় নিবন্ধসমূহে সর্বপ্রকার অসবর্ণ বিবাহই নিষিদ্ধ। যে সকল

১ ত্রীন্‌ পঞ্চেতি আসুরাদিনিন্দিতবিবাহচতুষ্টয়বিষয়ং ক্ষত্রিয়াদি বিষয়ং চ—সম্বন্ধবিবেক, পৃঃ ১৪।

২ Marriage and Stridhana, পৃঃ ৭০।

৩ ত্রীনিত্যাভাবিকদোষার্থম্‌—স্মৃতিতত্ত্ব, ২, পৃঃ ১০৯।

শাস্ত্রবলে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে 'বৃহন্নারদীয়ে'র বচন[1] প্রধান। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জীমূতবাহন ও রঘুনন্দন তাঁহাদের 'দায়ভাগ' এবং 'দায়তত্ত্ব' নামক গ্রন্থে পৈতৃক সম্পত্তিতে অসবর্ণ পুত্রের উত্তরাধিকার আলোচনা করিয়াছেন। অবশ্য, ইহা হইতে একথা বলা চলে না যে, তৎকালে এদেশে অসবর্ণ বিবাহ নিশ্চয়ই প্রচলিত ছিল। এমন হইতে পারে যে, প্রাচীন স্মৃতির, বিশেষতঃ যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির, বচনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁহারা অসবর্ণ পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। শূলপাণি ও শ্রীনাথ এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করেন নাই।

কন্যাসম্প্রদানের অধিকার

নানা শাস্ত্রবচনের আলোচনা করিয়া রঘুনন্দন কন্যাসম্প্রদানের অধিকারি-গণের নিম্নলিখিত ক্রম নির্ধারণ করিয়াছেন :—

> পিতা, ভ্রাতা, পিতামহ, সকুল্য অর্থাৎ পিতা, ভ্রাতা ও মাতামহ ছাড়া পিতৃকুলের অপর কোন ব্যক্তি, মাতামহ, মাতুল, মাতা, মাতামহ হইতে মাতা পর্যন্ত ব্যক্তি ভিন্ন মাতৃকুলের অপর কোন ব্যক্তি।

উক্ত অধিকারিগণের মধ্যে পূর্ব পূর্ব ব্যক্তির অধিকার উত্তরোত্তর ব্যক্তি অপেক্ষা প্রবলতর। ভবদেবের মতে, মাতামহ, মাতুল ও শেষোক্ত ব্যক্তি বর্জনীয়।

উন্মাদ, পাতিত্য প্রভৃতি দোষযুক্ত ব্যক্তি কন্যাসম্প্রদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। উল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহই না থাকিলে কন্যা নিজেই যোগ্যপাত্র পাইলে তাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে পারে[2]।

এই বিষয়ে 'মিতাক্ষরা' ও বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধসমূহের মধ্যে পার্থক্য এই যে, 'মিতাক্ষরা' কন্যাসম্প্রদান ব্যাপারে মাতৃকুলের কোন অধিকারই স্বীকার করে না।

১ দ্বিজানামসবর্ণাসু পযমস্তথা—স্মৃ ত ২ পৃঃ ১১২।

২ গম্যংত্বভাবে দাতৄণাং কন্যা কুর্যাৎ স্বয়ংবরম্—'উদ্বাহতত্ত্ব'।

বিবাহসংক্রান্ত বিধিনিষেধ বাধ্যতামূলক কিনা ?

পাত্রপাত্রীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতার আলোচনা করা হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—উল্লিখিত নিয়মগুলি কি অবশ্যপালনীয় ? যদি কেহ এই সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া বিবাহ করে, তাহা হইলে ফল কি হইবে ?

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, অযোগ্য পাত্রপাত্রীর বিবাহ সম্বন্ধে নিষেধাত্মক নিয়মগুলি মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত :—

(১) যে নিয়মগুলির লঙ্ঘন করিলেও কোন দোষ হয় না,

(২) যেগুলির ব্যতিক্রম হইলে পতির পাতিত্য হয়,

(৩) যেগুলি পালন না করিলে বিবাহ অসিদ্ধ হয়।

পরিবেদন, দিধিষু বা অগ্রেদিধিষুর বিবাহ, সগোত্রবিবাহ, সপিণ্ডবিবাহ, মাতৃনামধারিণী কন্যার বিবাহ—এই কয়টি ব্যাপার ছাড়া অন্য ব্যাপারে নিষেধাত্মক নিয়মগুলি প্রথমশ্রেণীর অন্তর্গত। ঐ সমস্ত নিয়ম মানিয়া চলাই ভাল, কিন্তু না মানিলে নিয়মভঙ্গকারী দণ্ডার্হ হইবে না।

পরিবেদন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ঐরূপ বিবাহ যে করে শুধু সেই নহে, ঐ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলেই পতিত হইবে।

সগোত্রাবিবাহের পরিণাম স্পষ্ট বুঝা যায় না। এই প্রসঙ্গে রঘুনন্দন কর্তৃক উদ্ধৃত শাস্ত্রবাক্যগুলি হইতে মনে হয়, অজ্ঞতাবশতঃ কেহ সগোত্রা কন্যাকে বিবাহ করিলে সেই স্ত্রীর উপরে তাহার দাম্পত্য অধিকার থাকিবে না এবং সেই স্ত্রী তৎকর্তৃক পোষণীয়া হইবে। সজ্ঞানে ঐরূপ বিবাহ করিলে পতি পত্নীকে ত্যাগ করিবেন এবং চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন; অবশ্য এস্থলেও স্ত্রীকে তাহার ভরণপোষণ করিতে হইবে। আবার, রঘুনন্দনধৃত আপস্তম্বের মতে, সগোত্রা কন্যাকে যে বিবাহ করিবে সে নিজে এবং তাহার সন্তানসন্ততি ব্রাহ্মণত্বভ্রষ্ট হইবে। এই সব দেখিয়া মনে হয়, রঘুনন্দনের মতে, এইরূপ বিবাহ করিয়া কেহ পতিত হইয়া সমাজে থাকিতে পারিত অথবা স্ত্রীকে বর্জন করিয়া এবং উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাতিত্যমুক্ত হইতে পারিত।

সপিণ্ডকন্যাকে যে বিবাহ করিবে সে সন্তানসন্ততি সহ পতিত হইবে এবং শূদ্রের ন্যায় গণ্য হইবে। বিমাতার ভ্রাতুষ্পুত্রী ও সেই ভ্রাতুষ্পুত্রীর কন্যা বিবাহ করিলে বিবাহকারীর স্থান সমাজে কিরূপ হইবে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না।

কেহ যদি মাতৃনামধারিণী কন্যাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে সে সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

অসবর্ণ বিবাহের তীব্র প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও বাঙ্গালী নিবন্ধকারেরা ঈদৃশ বিবাহের সামাজিক বা পারত্রিক পরিণাম কিরূপ তাহা আলোচনা করেন নাই। সুতরাং, এই অপরাধে বিবাহ অসিদ্ধ হইত কিনা তাহা বুঝিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ এইরূপ বিবাহও পাতিত্যজনক ছিল এবং হয়ত ইহা তৎকালে সুবিদিত ছিল বলিয়া নিবন্ধকারগণ এই বিষয়ে কিছু লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

হিন্দুর বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভবপর কিনা ?

উল্লিখিত কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেল যে, স্ত্রী পরিত্যাজ্যা। কিন্তু, তথাপি তিনি ভরণপোষণ হইতে বঞ্চিতা হইবেন না। তাহা হইলে দেখা যায়, এই সমস্ত ক্ষেত্রেও বিবাহবন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয় না। তবে, নানা শাস্ত্রবাক্যের বলে, রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে, নিম্নলিখিত তিনটি অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ হইবে :—

(১) নিম্নতর বর্ণের ব্যক্তির সহিত সহবাসের ফলে স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হইলে,

(২) শিষ্য বা পুত্রের সহিত সহবাসের ফলে স্ত্রী গর্ভবতী হইলে,

(৩) অপর কোনরূপে যদি স্ত্রী অত্যন্ত হীনব্যসনাসক্তা হয় বা ধন-নাশ করে।

প্রথমোক্ত অপরাধে স্ত্রী রঘুনন্দনধৃত বৃহস্পতির বচনানুসারে পরিত্যাজ্যা, এমন কি বধ্যাও হইতে পারেন। রঘুনন্দনের মতে, উক্ত সহবাসাদির ফলে যতক্ষণ স্ত্রী গর্ভবতী না হইবেন ততক্ষণ তিনি প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা দোষমুক্ত হইতে পারেন। বঙ্গীয় নিবন্ধে উদ্ধৃত প্রাচীন স্মৃতির কোন বচনেই ব্যভিচারিণী পত্নীর ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থা দেখা যায় না। ইহা হইতে মনে হয়, এই দেশের নিবন্ধকারগণের মতে স্ত্রীর ব্যভিচারই একমাত্র অপরাধ যাহার ফলে সম্পূর্ণ বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভবপর।

বিবাহ একবার নিষ্পন্ন হইলে, বিবাহ-সংক্রান্ত কোন অশাস্ত্রীয় ব্যাপারের জন্য উহা অসিদ্ধ হয় না—বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধগুলি হইতে এই সিদ্ধান্তই করা যায়। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে,

কন্যাসম্প্রদানকারী ব্যক্তির উন্মাদ ও পাতিত্যাদিদোষমুক্ত হইতে হইবে নারদের মতে, এই সমস্ত দোষযুক্ত ব্যক্তির কার্য অসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে। রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে, নারদের এই ব্যবস্থা অনুসারে এইরূপ দোষযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বাগ্‌দান প্রভৃতি কর্ম অসিদ্ধ হইবে। কিন্তু, বিবাহ একবার অনুষ্ঠিত হইলে উক্ত ত্রুটির জন্য উহা অসিদ্ধ হইবে না। তাঁহার যুক্তি এই যে, কোন গৌণ ব্যাপারের দোষ হেতু মুখ্য ব্যাপার অসিদ্ধ হইতে পারে না[১]।

বিবাহের উপযুক্ত সময়

বাঙ্গালী নিবন্ধকারেরা বিবাহের কালাকাল সম্বন্ধে নানারূপ বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আষাঢ় হইতে কার্তিক পর্যন্ত এবং পৌষ ও চৈত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ; কারণ, এই সমস্ত মাসে বিবাহ নানাবিধ অমঙ্গলজনক। পৌষ ও চৈত্র—এই দুইমাস বিশেষভাবে বর্জনীয়। কিন্তু, যুদ্ধ, পিতামাতার আসন্ন মৃত্যু এবং অরক্ষণীয়া কন্যা ইত্যাদি স্থলে বিবাহকালের শুভাশুভত্ব বিচার্য নহে। রঘুনন্দনের মতে, মনে হয়, সর্ব অবস্থায়ই বিবাহে মলমাস ও সংক্রান্তি প্রভৃতি অতি মন্দ সময় অবশ্যবর্জনীয়। রঘুনন্দনের নির্দেশ অনুসারে, বিবাহে সৌর-মাসের উল্লেখ কর্তব্য। গোপালের গ্রন্থ হইতে মনে হয়, শ্রীনাথের মতে চান্দ্রমাসের উল্লেখ বিধেয়।

শাস্ত্র উদ্ধার করিয়া রঘুনন্দন ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, সাধারণতঃ রাত্রিবেলায় দান নিষিদ্ধ হইলেও কন্যাদানের পক্ষে রাত্রিই প্রশস্ত সময়। দিনের বেলায় বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ।

বিবাহ কখন সম্পূর্ণ হয়?

বিবাহ ব্যাপারটি কতগুলি অনুষ্ঠানের সমষ্টি। কিন্তু, ঠিক কোন্ অনুষ্ঠানটি নিষ্পন্ন হইলে বিবাহক্রিয়াকে সম্পূর্ণ বলা যায়? প্রাক্-রঘুনন্দন এবং রঘুনন্দনোত্তর যুগের কোন লেখকই এই প্রশ্নের উত্থাপন করেন নাই।

১ যদি তু বিবাহো নিবৃত্তস্তদা প্রধানস্য নিষ্পন্নত্বেনাধিকারিবৈকল্যান্ন তস্য পুনরাবৃত্তিঃ—উদ্বাহতত্ত্ব।
এই নীতিকেই হিন্দু আইনে Factum Valet বলা হইয়াছে।

কিন্তু, সূক্ষ্মদর্শী ব্যবহারবিদ্ রঘুনন্দন এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। পিতৃগোত্র হইতে কন্যা পতির গোত্রে গোত্রান্তরিতা হইলেই বিবাহ সম্পূর্ণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু, এই গোত্রান্তরীকরণ ঠিক কখন হয় সেই বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। লঘুহারীতের মতে[১], সপ্তপদীগমনের পরে কন্যার গোত্রান্তর হইয়া থাকে। আবার, বৃহস্পতির বচনে দেখা যায়, পাণিগ্রহণের পরে এই ব্যাপারটি ঘটে। অপর এক মতে, বিবাহিতা নারীর সপিণ্ডীকরণ না হওয়া পর্যন্ত তাহার পিতৃগোত্রই থাকে। রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে, এই শেষোক্ত ব্যবস্থা কোন কোন বেদের শাখাবিশেষাবলম্বীর পক্ষে প্রযোজ্য। গোভিলগৃহ্যসূত্রের[২] নিম্নোদ্ধৃত বচনে 'গোত্র' পদটি, রঘুনন্দনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, কন্যার পতিগোত্রকে বুঝায়ঃ—

অনুমন্ত্রিতা গুরুং গোত্রেণাভিবাদয়েৎ।

রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে, সামবেদীয় ব্রাহ্মণগণের বিবাহের এখানেই পরিসমাপ্তি। ভবদেবের মতে, এখানে গোত্রশব্দে কন্যার পিতৃগোত্রকে বুঝায়।

যজুর্বেদী ব্রাহ্মণের বিবাহানুষ্ঠান সমাপ্ত হয় তখন যখন বর ও কন্যা একত্র বৃষচর্মে উপবেশন করে।

যৌতুক ও কন্যাশুল্ক

কন্যাশুল্ক বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধে তীব্রভাবে নিন্দিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি কন্যাশুল্ক গ্রহণ করিবে সে নিজে তো নরকগামী হইবেই, বংশের সাত পুরুষকেও সে নরকে পাতিত করিবে। বর্তমান বাংলার সমাজে বর-শুল্ক[৩] ছাড়া কন্যার ভাল বিবাহ হয় না। এই প্রথা সম্ভবতঃ

১ স্বগোত্রাদ্ ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে—'উদ্বাহতত্ত্ব'।

২ সং চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, কলিকাতা, ১৯০৮, প্রথম খণ্ড, ১১।৩।১৩। এই পতি-অভিবাদন সপ্তপদীগমনের পরে কর্তব্য।

৩ এমন কোন শব্দ স্মৃতিশাস্ত্রে নাই; কন্যাশুল্ক শব্দের অনুকরণে এই শব্দটি গঠন করা হইয়াছে।

কৌলীন্যের সৃষ্টিকাল হইতেই প্রচলিত আছে। কৌলীন্যের প্রবর্তন হইলে অনেকেই সামাজিক মর্যাদালাভের লোভে স্বীয় কন্যাদিগকে কুলীন পাত্রে সম্প্রদান করিতে উৎসুক হইতেন। ফলে, অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক কুলীন পাত্রকে জামাতা রূপে পাইবার জন্য অনেক কন্যার পিতাই ব্যগ্র হইয়া পড়িতেন। তাহাতে চাহিদা ও সরবরাহের (demand and supply) নিয়মের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হেতু কুলীন বরকে বরশুল্ক দেওয়া হইত। কুলীনগণের বহুবিবাহেরও ইহা একটি প্রধান কারণ। সুতরাং, কৌলীন্যের প্রবর্তক বল্লালের পরবর্তী নিবন্ধকার সম্ভবতঃ সমাজে কৌলীন্যের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া এই সম্বন্ধে নীরব থাকাই সমীচীন মনে করিয়াছেন। তবে, তাঁহারা যে স্পষ্টভাবে বরশুল্কের সমর্থন করেন নাই, ইহা হইতে মনে হয় যে এই প্রথা তাঁহাদের বিশেষ মনঃপূত ছিল না।

ভগ্নীর বিবাহে ভ্রাতার দায়িত্ব

যাজ্ঞবল্ক্যের মত অনুসারে রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে, কন্যাসম্প্রদানের অপর অধিকারীরা না থাকিলে যখন ভ্রাতৃগণের উপর সম্প্রদানের ভার থাকিবে তখন সেই দায়িত্ব দীক্ষিত ভ্রাতারই, অদীক্ষিতের নহে। অবশ্য কেহই যদি দীক্ষিত না থাকে, তাহা হইলে অদীক্ষিত ভ্রাতার দায়িত্ব আছে কিনা তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। উক্ত যাজ্ঞবল্ক্যই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, এইরূপ ক্ষেত্রে বিবাহের ব্যয়ের জন্য দীক্ষিত অদীক্ষিত সকল ভ্রাতাই পৈতৃক সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত নিজাংশের 'তুরীয়ক' দান করিবে। এই 'তুরীয়ক' শব্দটি ঘোর বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছে। 'মিতাক্ষরা'-মতে, ইহার অর্থ, উক্ত কন্যা পুত্র হইলে সম্পত্তির যে অংশ পাইত তাহার এক চতুর্থাংশ। 'দায়ভাগে'র মতাবলম্বী রঘুনন্দন এই পদের অর্থ করিয়াছেন 'বিবাহোচিতদ্রব্য'। 'তুরীয়' পদটির আভিধানিক অর্থ 'চতুর্থাংশ'; কিন্তু, রঘুনন্দন ইহার উক্তরূপ অদ্ভুত অর্থ করিলেন কেন? ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, বঙ্গীয় স্মার্তেরা, অন্ততঃ জীমূতবাহনের সময় হইতেই, পিতৃসম্পত্তিতে কন্যার অধিকার স্বীকার করেন নাই। সুতরাং, 'তুরীয়' পদের প্রকৃত অর্থ করিলে যদি কন্যা সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ দাবী করিয়া বসে—এই ভয়েই হয়ত রঘুনন্দন এই শব্দটির ঐরূপ একটি মনগড়া অর্থ নির্ধারণ করিয়াছেন।

স্ত্রীর কর্তব্যাকর্তব্য

সুরাপান, অসৎসংসর্গ, স্বামীর নিকট হইতে পৃথক্ অবস্থান, ঘুরিয়া বেড়ান, অসময়ে নিদ্রা এবং অপরের গৃহে বাস—এই সমস্ত কার্য স্ত্রীর পক্ষে অতিশয় নিন্দনীয়। প্রোষিতভর্তৃকা নারী পতির মঙ্গলার্থে প্রার্থনা করিবেন, অতিরিক্ত সাজসজ্জা বর্জন কবিবেন; কিন্তু, একেবারে অসজ্জিতা অবস্থায় থাকিবেন না, কারণ ঐরূপ অবস্থায় থাকিলে তাঁহাকে বিধবার ন্যায় মনে হইবে।

বিবাহসংক্রান্ত রীতিনীতি

বিবাহবিষয়ক বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধগুলিতে বিবাহসংক্রান্ত নানারূপ রীতি-নীতির সন্ধান পাওয়া যায়। কতগুলি রীতি বা আচারের বিশেষ কোন অর্থ বঝা যায় না। তথাপি ইহারা এককালে প্রচলিত ছিল বলিয়া ইহাদের মধ্যে যেগুলি প্রধান সেগুলি উল্লেখযোগ্য। বিবাহকালীন একটি কৌতুককর আচার উলুধ্বনি। বর্তমান কালেও সহস্র বাদ্যভাণ্ড থাকা সত্ত্বেও ইহা মাঙ্গলিক বলিয়া অবশ্যকর্তব্য। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে উলুধ্বনির প্রচলন ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতেই আছে[১]। রঘুনন্দন ভিন্ন অন্য নিবন্ধকারেরা উলুধ্বনির উল্লেখ করেন নাই। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এই প্রথার বহুল প্রচলন বশতঃ এই সম্বন্ধে কোন রীতি লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যকতা ছিল না। রঘুনন্দন সূক্ষ্মদর্শী লেখক বলিয়া হয়ত ইহার অনুল্লেখ সমীচীন মনে করেন নাই।

দাক্ষিণাত্যের স্মার্তগণের মতের সমর্থন করিয়া বোধ হয় রঘুনন্দন বলিতে চাহিয়াছেন যে, অন্যান্য অনুষ্ঠানে অশুভসূচক হইলেও হাঁচি বিবাহে শুভসূচক।

১ অথর্ববেদে (৩১।৯।৬) 'উলুলি' শব্দটি উলুধ্বনি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পরবর্তী কালের অভিধানে হুলহুলি, হুলিহুলি ও হুলুহুলু প্রভৃতি নানারূপ বর্ণবিন্যাস দেখা যায়। 'ছান্দোগ্য উপনিষৎ' (৩।১৯।৩) ও 'নৈষধচরিতে' (১৪।৪৯) এই ধ্বনির উল্লেখ আছে। এই প্রথা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য :—কে. কে. হ্যাণ্ডিকি কর্তৃক 'নৈষধচরিতে'র ইংরাজি অনুবাদ (পৃঃ ৫৪১-৫৪২)।

বিবাহের পূর্বে বরের ক্ষৌরকর্ম বিহিত ছিল বলিয়া মনে হয়। কন্যার পক্ষে শুধু নখচ্ছেদনই ছিল বিধেয়।

বিবাহকালে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক 'স্বস্তি', 'পুণ্যাহ' প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করা হইত। এই সকল শব্দের উচ্চারণপদ্ধতি বর্ণভেদে বিভিন্ন ছিল।

রঘুনন্দন বিবাহকালে গোময়, গোমূত্র, দধি ও চন্দনের সংমিশ্রণে কপালে তিলকধারণের প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ তিলক, টীকাকারের মতে, কন্যার ধারণ করা বিধেয়।

বিবাহের পরে, শাশুড়ী পুত্রবধূকে মিষ্টান্ন ও বস্ত্রাদি দান করিয়া গ্রহণ করিবেন। তৎপর তিনি তাহাকে গৃহে ধর্মানুষ্ঠান, রন্ধন প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত করিবেন।

বিবাহিতা কন্যার পুত্র না হওয়া পর্যন্ত ঐ কন্যার পিতা কন্যাগৃহে আহার করিবেন না। ব্রাহ্মবিবাহে এই নিয়ম বিশেষভাবে পালনীয়। এই নিয়ম বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে এখনও পালিত হয়। পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে পৌঁছিয়া কন্যা সেইদিন সেখানে অন্নগ্রহণ করিবে না।

মুখচন্দ্রিকা

বিবাহের অনুষ্ঠানের অঙ্গস্বরূপ রঘুনন্দন জম্বূলমালিকা বা মুখচন্দ্রিকার উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাই এখন পশ্চিমবঙ্গে 'শুভদৃষ্টি' নামে পরিচিত। 'জম্বূল' একপ্রকার ফুলের নাম। সুতরাং, জম্বূলমালিকা, অর্থাৎ জম্বূল ফুলের মালা, কি করিয়া মুখচন্দ্রিকা বা শুভদৃষ্টি অর্থ ধারণ করিল তাহা কৌতুককর, সন্দেহ নাই। 'হরিবংশে'র একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে, উহাতে প্রযুক্ত 'জম্বূলমালিকা' শব্দে বুঝায় সেই রীতি যাহা দ্বারা বর ও কন্যাকে পরস্পরের সম্মুখীন করা হয় এবং ফুলের মালা দিয়া বরকন্যাকে সজ্জিত করা হয়। ইহা হইতে মনে হয়, 'জম্বূলমালিকা' শব্দটি প্রথমে মালা বুঝাইলেও পরবর্তী কালে যে অনুষ্ঠানে ঐ মালা ব্যবহৃত হইত সেই অনুষ্ঠানকেই বুঝাইত। 'হরিবংশে'র টীকায় নীলকণ্ঠ শব্দটির এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—বরপক্ষীয়স্ত্রীণাং পরিহাস-বচনং, তেষাং মালিকা শ্রেণী; অর্থাৎ, বরপক্ষের স্ত্রীলোকগণের পরিহাস-

বচনসমূহ। অন্ততঃ নীলকণ্ঠের সময়ে সম্ভবতঃ বরপক্ষীয় স্ত্রীলোকেরা কন্যার পিত্রালয়ে বিবাহকালে উপস্থিত থাকিতেন; বঙ্গীয় নিবন্ধকারগণের যুগে হয়ত এই প্রথার প্রচলন ছিল না বলিয়াই 'জম্বূলমালিকা'র অর্থ হইয়াছিল মুখচন্দ্রিকা।

বিবাহের উপযুক্ত স্থান

সামবেদী ব্রাহ্মণের বিবাহের উপযুক্ত স্থান সম্বন্ধে কোন নির্দেশ নিবন্ধগুলিতে নাই। যজুর্বেদী ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, প্রধান আবাসগৃহের প্রাঙ্গণ পরিষ্কার ও পবিত্র করিয়া উহাতে অগ্নিস্থাপন পূর্বক বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

বিবাহের প্রয়োজনীয়তা

চতুর্বর্ণের পক্ষেই বিবাহ অবশ্যকর্তব্য। গৃহিণী না থাকিলে গৃহ থাকে না[১]; তাহা হইলে গার্হস্থ্যাশ্রম নিরর্থক হইয়া পড়ে। যথাকালে বিবাহের অবশ্যকরণীয়তার কথা বঙ্গীয় নিবন্ধে স্পষ্টই বলা হইয়াছে। রঘুনন্দনের গ্রন্থ হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, চতুরাশ্রমের কোন না কোন আশ্রমভুক্ত না থাকা অতি গর্হিত ও পাপজনক। সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ না করিয়া কাহারও পক্ষে অকৃতদার অবস্থায় থাকাকে রঘুনন্দন তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এইরূপ অবস্থায় থাকিলে কেহই গৃহস্থের কর্তব্যে অধিকারী হইতে পারিবে না। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—কেহ যদি অধিক বয়সে বিপত্নীক হয়, তাহা হইলে সে কি পুনরায় বিবাহ করিবে, অথবা, না করিলে, গার্হস্থ্যাশ্রমের কর্তব্যে অধিকারী হইবে? এই সমস্যার সমাধান রঘুনন্দন অতি কৌশলে করিয়াছেন। এইরূপ ব্যক্তি অনাশ্রমী হইবে এবং আশ্রমচ্যুত অবস্থায় গৃহস্থের কর্মে তাহার অধিকার থাকিবে না—ইহাই স্বাভাবিক। রঘুনন্দন একটি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, আটচল্লিশ বৎসর বয়সে বা তদূর্ধ্বে কাহারও পত্নীবিয়োগ হইলে সে 'রণ্ডাশ্রমী' নামে অভিহিত হইবে। সুতরাং, গার্হস্থ্যচ্যুত হইলেও সে অনাশ্রমী হইবে না। ফলতঃ

১ ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে—'উদ্বাহতত্ত্ব'।

যে সমস্ত কার্যে অনাশ্রমীর অধিকার নাই সেই সব কার্যে তাহার অধিকার থাকিবে। চিরপ্রচলিত চতুরাশ্রমের অতিরিক্ত 'রণ্ডাশ্রমে'র সৃষ্টি বা কল্পনা একটু অদ্ভুত মনে হইলেও শাস্ত্রকারের এই প্রচেষ্টা সামাজিক কল্যাণের জন্য সন্দেহ নাই। এত অধিক বয়সে পুনরায় বিবাহের বিধি থাকিলে অল্পবয়স্কা কন্যাকে অনেকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বিবাহ করিতে চাহিবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে অহিতকর এইরূপ বিবাহের নিষেধের উদ্দেশ্যই সম্ভবতঃ রণ্ডাশ্রম-কল্পনার মূলে রহিয়াছে। অবশ্য এমন কথা বলা হয় নাই যে, ইচ্ছা করিলে, আটচল্লিশ বৎসর বা তদধিক বয়ঃক্রমে কেহ বিবাহ করিতে পারিবে না। বিবাহ সংস্কারকে এত অপরিহার্য মনে করা হইত যে, পরিবেদন পাপজনক হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাকে পাপকার্য বলিয়া মনে করা হইত না—ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। পিতামাতার মৃত্যুজনিত অশৌচ অধিকাংশ ধর্মকার্যের বিঘ্ন বলিয়া গণ্য হইলেও বিবাহের উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলে কোন ব্যক্তি যোগ্য পাত্রী যতদিন না পায় ততদিন স্নাতকের ধর্ম আচরণ করিবে, ইহাই বিধান। বিবাহ যে একটি অতি পবিত্র ব্যাপার সেই বিষয়ে শ্রীনাথ বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি পবিত্রভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াছে সে-ই বিবাহের উপযুক্ত। ব্রহ্মচর্য-আশ্রমে কাহারও স্খলন হইয়া থাকিলে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত না করা পর্যন্ত সে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশাধিকার লাভ করিবে না। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণের মতানুসরণক্রমে শ্রীনাথ আরো বলিয়াছেন যে, আশ্রমসমূহের মধ্যে গার্হস্থ্যই প্রধান; খাদ্য ও আশ্রয় দান করিয়া গৃহস্থ অপর আশ্রমকে রক্ষা করিয়া থাকে।

কন্যাসম্প্রদানের ফল

কন্যাসম্প্রদানকে অতিশয় পুণ্যকর্ম বলা হইয়াছে। যিনি কন্যা সম্প্রদান করিবেন, তিনি পরলোকে স্বর্গবাস প্রভৃতি নানারূপ সুখের অধিকারী হইবেন।

বিবাহ ও দাসপ্রথা

রঘুনন্দনের গ্রন্থে দেখা যায়, কাহারও দাসীকে যে বিবাহ করিবে সেও তাহার 'বড়বাকৃত' দাস বলিয়া গণ্য হইবে। এই দাসী দুইপ্রকার

হইতে পারে। কাহারও দাসের সঙ্গে বিবাহিতা স্ত্রী ঐ ব্যক্তির দাসী হইবে, অথবা কোন স্ত্রীলোক স্বয়ং কাহারও দাসীত্ব স্বীকার করিতে পারে। শেষোক্ত প্রকারের দাসী অপরক্ত কোন ব্যক্তির দাসকে বিবাহ করিলে পূর্ব প্রভুর দাসীই থাকিবে, কিন্তু পূর্ব প্রভুর অনুমতিক্রমে স্বামীর প্রভুর দাসীও সে হইতে পারে। রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোন নিবন্ধকারই এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই। কিন্তু, যে ভাবে রঘুনন্দন এই বিষয়টি আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে, মনে হয়, দাসপ্রথা কোন না কোন রূপে তাঁহার সময়ে প্রচলিত ছিল।

বিবাহের প্রকারভেদ

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ—এই আট প্রকার বিবাহই প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রাচীন স্মৃতি হইতে অনুমান করা যায়। উক্ত সকল প্রকার বিবাহই বঙ্গীয় নিবন্ধসমূহে স্বীকৃত হইয়াছে। আসুরাদি চারি প্রকার বিবাহ প্রাচীন স্মৃতির অনুসরণক্রমে বঙ্গীয় স্মৃতিগ্রন্থগুলিতে নিন্দিত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু, তদানীন্তন সমাজে ঠিক কোন্ কোন্ প্রকার বিবাহ প্রচলিত ছিল তাহা জানা যায় না। এই বিবিধ প্রকার বিবাহের মধ্যে কোন্‌টি কোন্ বর্ণের উপযুক্ত, তাহার আলোচনা প্রাচীন স্মৃতিতে থাকিলেও বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধগুলিতে নাই।

নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ

বিবাহসংক্রান্ত যে অনুষ্ঠানটির আলোচনা আমরা সর্বশেষে করিতেছি বিবাহে তাহাই সর্বপ্রথম কর্তব্য। নানা শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিয়া এবং নানা যুক্তির অবতারণাপূর্বক রঘুনন্দন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, নান্দীমুখ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের দ্বারাই বিবাহের অনুষ্ঠানের সূচনা হয় পুত্র এবং কন্যার প্রত্যেক সংস্কারের পূর্বেই এই শ্রাদ্ধ পিতার কর্তব্য পুত্রের প্রথম বিবাহে ইহা পিতৃকর্তব্য বটে; কিন্তু, পরে পুত্র বিবাহ করিলে তখন পিতা ইহা করিবেন না, ইহা করিবেন পুত্র স্বয়ং। পিতা বিদেশগমন বা অসুস্থতার জন্য শ্রাদ্ধ সম্পাদনে

অক্ষম হইলে তাঁহার পুত্র অথবা শাস্ত্রমতে অপব অধিকারী ব্যক্তি ইহা করিতে পারেন। পিতা জীবিত না থাকিলে পুত্র স্বয়ং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কবিবে। যখন, অপব যোগ্য ব্যক্তির অভাবে, মাতা কন্যাসম্প্রদান কবিবেন, তখন তিনি নিজে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কবিবেন না, কাবণ, ইহাতে স্ত্রীলোকের অধিকাব নাই। এই শ্রাদ্ধে পিতৃপক্ষেব তিন পুরুষ ও মাতামহপক্ষের তিনপুরুষকে পিণ্ডদান কবিতে হয়, এখানে কোন পক্ষেবই কোন স্ত্রীলোক পিণ্ডার্হ নহেন।

২। সংস্কার

'সংস্কাব' পদটি সম্-কৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইহার অর্থ শুদ্ধীকবণ। প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুসমাজে বর্ণাশ্রমধর্ম প্রচলিত। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের পক্ষে প্রত্যেক আশ্রমেই কতগুলি সংস্কার কবণীয়। সংস্কাব না হইলে মানুষেব জীবন শুদ্ধ হয় না এবং অনেক কর্তব্যকর্মে অধিকাব জন্মে না, যেমন, উপনয়ন না হইলে বেদপাঠেব অধিকাব লাভ কবা যায় না, বিবাহ না হইলে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ কবা যায় না। প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত সংস্কাবসমূহের প্রমাণ প্রয়োগ সংক্রান্ত জটিল নিয়মাবলী হইতে বুঝা যায় যে, ইহারা সমাজে অপবিহার্য বলিয়া গণ্য হইত। ব্রাহ্মণ্যধর্মের ক্ষীয়মাণ প্রভাবে এবং কালক্রমে দৃষ্টিভঙ্গীব পবিবর্তনে বহু সংস্কাব লুপ্ত হইলেও অদ্যাবধি কোন কোন সংস্কাব অবশ্য-অনুষ্ঠেয় বলিয়া বিবেচিত হয়। উপনয়নের অনুষ্ঠান যতই সংক্ষিপ্ত হউক, এই সংস্কারের প্রতি আধুনিকগণ যতই বীতশ্রদ্ধ হউক, এখনও ব্রাহ্মণাদির পক্ষে এই সংস্কাব অবর্জনীয়। বিবাহ সংস্কারের পর্যায় হইতে চুক্তির নিম্নস্তবে ক্রমশঃ নামিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু এখনও অধিকাংশ হিন্দু ইহাকে পবিত্র সংস্কার বলিয়াই মনে করেন। সংস্কারসমূহের ইতিহাস এবং ইহাদের মধ্যে অনেকগুলির বিলুপ্তির ধারা পর্যালোচনাব বিষয়। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা সংস্কার সম্বন্ধে প্রধান

প্রধান বিষয়ের আলোচনা করিব। সংস্কারসমূহের প্রয়োগ নহে, তাহাদের প্রমাণই বর্তমানে আমাদের আলোচ্য।

সংস্কারবিষয়ক নিবন্ধ

সংস্কারসমূহ যে যে গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রধান :—

(১) ভবদেবের 'কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি' বা 'দশকর্মপদ্ধতি',

(২) হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব',

(৩) রঘুনন্দনের 'সংস্কারতত্ত্ব'।

এই গ্রন্থগুলির মধ্যে, 'কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি'তে সংস্কারসমূহের পদ্ধতিই শুধু লিপিবদ্ধ আছে। ভবদেব প্রারম্ভিক শ্লোকে নিজেই বলিয়াছেন যে, কেবল সামবেদের অনুসরণকারিগণের সংস্কারই তাঁহার আলোচ্য[১]। অপর দুই গ্রন্থে সংস্কারের উদ্দেশ্য, উপযুক্ত সময় প্রভৃতি নানা বিষয়েরও আলোচনা আছে।

সংস্কারসমূহের সংখ্যা

প্রাচীন স্মৃতিতে বহু সংস্কারের উল্লেখ আছে। গৌতমের মতে, সংস্কার চল্লিশটি। অধিকাংশ স্মৃতিনিবন্ধে প্রধান সংস্কার ষোলটি[২]।

আমরা যে যুগের আলোচনা করিতেছি, সেই যুগে ঠিক কয়টি সংস্কার বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল তাহা বলা কঠিন। এই দেশের সংস্কারবিষয়ক প্রাচীনতম গ্রন্থ ভবদেবের 'কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি'র একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত এই লেখকের মতে সংস্কারগুলির সংখ্যা কত তাহা বলা সহজ নহে[৩]।

১ গৃহসূত্রার্থমালোচ্য ছন্দোগানামিয়ং……কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতিঃ (দ্বিতীয় শ্লোক)।

২ হি. ধ., ২য় খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৯৪।

৩ এই গ্রন্থের যে সংস্করণ বর্তমান প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন যে, যে যে সংস্কার দীর্ঘকাল যাবৎ অপ্রচলিত সেই-গুলিকে ইহা হইতে বর্জন করা হইয়াছে।

হলায়ুধ নিম্নলিখিত দশটি সংস্কারের উল্লেখ করিয়াছেন[১] :—

(১) গর্ভাধান, (২) পুংসবন, (৩) সীমন্তোন্নয়ন, (৪) জাতকর্ম, (৫) নামকরণ, (৬) নিষ্ক্রমণ, (৭) অন্নপ্রাশন, (৮) চূড়াকরণ, (৯) উপনয়ন, (১০) বিবাহ।

উক্ত সংস্কারের তালিকায় রঘুনন্দন আরো দুইটি যোগ করিয়াছেন, সীমন্তোন্নয়নের পরে শোষ্যন্তীহোম এবং উপনয়নের পরে সমাবর্তন। এখানে একটি কথা বলা উচিত। হলায়ুধ উক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত না করিলেও, এই দুইটি সংস্কারের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয়, সম্ভবতঃ তাঁহার কাল হইতেই এই দুইটি সংস্কারকে তেমন প্রাধান্য দেওয়া হইত না।

সংস্কারগুলির উদ্দেশ্য

রঘুনন্দন-ধৃত হারীতের মতে, গর্ভাধানের উদ্দেশ্য গর্ভস্থ সন্তানকে বেদ-গ্রহণের উপযোগী করা। পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় পুংসবন। সীমন্তোন্নয়নের দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত পাপের ক্ষালন হয়। জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ ও সমাবর্তনের দ্বারা শুক্রশোণিতাদি হইতে সঞ্চিত পাপ দূরীভূত হয়। অবশিষ্ট সংস্কারগুলির নাম হইতেই তাহাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝা যায়। রঘুনন্দন-ধৃত অঙ্গিরস্ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিম্নলিখিত শ্লোকে চমৎকারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

চিত্রং কর্ম যথানেকৈরুন্মীল্যতে শনৈঃ শনৈঃ।
ব্রাহ্মণ্যমপি তদ্বৎ স্যাৎ সংস্কারৈর্বিধিপূর্বকৈঃ॥

অর্থাৎ, যেমন একটি চিত্র বহু সংস্কারের দ্বারা ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়, তেমনই যথাবিধি অনুষ্ঠিত সংস্কারসমূহের দ্বারা ব্রাহ্মণ্যও প্রকট হয়।

সংস্কারসমূহের স্বরূপ ও অনুষ্ঠানকাল

গর্ভাধান—বিভিন্ন গৃহ্যসূত্র ও প্রাচীন স্মৃতিতে ইহার নিষেক, চতুর্থীহোম বা চতুর্থীকর্ম নামও পাওয়া যায়। ঋতুকালের পরে, স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের পূর্বে, সন্তান-লাভের আকাঙ্ক্ষায়, ইহা অনুষ্ঠিত হয়

১ গর্ভাধানপুংসবনং দশবিধসংস্কারকর্মণাঞ্চ ইত্যাদি। (ব্রাহ্মণসর্বস্ব—সং তেজশ্চন্দ্র, পৃঃ ১৮২।)

রঘুনন্দন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ইহা একবার মাত্র করণীয়। প্রসঙ্গক্রমে হলায়ুধ কতগুলি প্রচলিত বিশ্বাস ও ভেষজাদির উল্লেখ করিয়াছেন। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের প্রমাণ অবলম্বনে তিনি বলিয়াছেন যে, রজোদর্শনের দিন হইতে যুগ্মদিনে স্বামিসহবাসের ফল পুত্রলাভ ও অযুগ্মদিনে হয় কন্যাপ্রাপ্তি। গর্ভাধানের পরেও গর্ভোৎপত্তি না হইলে স্ত্রী ঋতুস্নানের পরে, পুষ্যানক্ষত্রযুক্তদিনে, উপবাসপূর্বক উৎপাটিত শ্বেতপুষ্পী (Clitoria ternatea) সিংহীগাছের মূল জলের সহিত পেষণ করিয়া দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে প্রয়োগ করিবেন। ইহাতে যদি তিনি অন্তঃসত্ত্বা না হন, তাহা হইলে শ্বেতপুষ্প কণ্টকারিকার (Solanum jacquini) মূল জলের সহিত পেষণ করিয়া ঋতুস্নানের দিন রাত্রে নস্য লইবেন।

পুংসবন—হলায়ুধ কর্তৃক উদ্ধৃত পারস্করের প্রমাণ অনুসারে, গর্ভপ্রাপ্তির দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় মাসে, গর্ভস্পন্দনের পূর্বে, ইহা অনুষ্ঠেয়। রঘুনন্দন-ধৃত গোভিলের মতে, তৃতীয় মাসের দশ দিনের মধ্যে ইহার উপযুক্ত কাল। এই অনুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ পতি-কর্তৃক পত্নীর দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে জলসহ পিষ্ট ন্যগ্রোধবৃক্ষের (=বটগাছ) অঙ্কুরের নস্যদান।

সীমন্তোন্নয়ন—কোন কোন গৃহ্যসূত্রে ইহার নাম সীমন্তকরণ বা সীমন্ত। শব্দটির অর্থ সীমন্তের ঊর্ধ্বদিকে স্থাপন। রঘুনন্দনের মতে, ইহা কেশরচনাবিশেষ, অর্থাৎ, একপ্রকার কেশবিন্যাসের নাম সীমন্ত[১]। ইহা নারীর প্রথম গর্ভকালেই করণীয়। পারস্করের মতানুসারী হলায়ুধ গর্ভোৎপত্তির ষষ্ঠ বা অষ্টম মাস এই সংস্কারের যোগ্যকাল বলিয়াছেন। রঘুনন্দন চতুর্থ মাসেরও বিকল্প ব্যবস্থা করিয়াছেন। রঘুনন্দন আরও বলিয়াছেন যে, এই সংস্কারের পূর্বেই যদি প্রথম গর্ভ নষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে দ্বিতীয়বার গর্ভোৎপত্তির পরে ইহার অনুষ্ঠানে বিশেষ কোন কালনিয়ম নাই; গর্ভস্পন্দনের সময় হইতে প্রসব পর্যন্ত যে কোন সময়ে ইহা অনুষ্ঠিত হইতে

১ স্মৃতিতত্ত্ব, ১, পৃঃ ৯১২।

পারে। এই সংস্কারের কয়েকটি কৌতুককর অঙ্গ নিম্নলিখিতরূপ :— পতি কর্তৃক পত্নীর কণ্ঠে উডুম্বর ফলের মাল্যদান, তিনবার পত্নীর সীমন্তের উন্নয়ন[১], পত্নীর সিন্দূরবিন্দু তাহার কপালের ঊর্ধ্বদিকে নয়ন, বীরপুত্রপ্রাপ্তির জন্য আশীর্বাদ দান।

শোষ্যন্তীহোম—ইহাকে শোষ্যন্তীকর্মও বলা হয়। প্রসববেদনা অনুভূত হইবার পরে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য নির্বিঘ্নে ও অনায়াসে সন্তানের প্রসব। নাম হইতেই বুঝা যায়, ইহাতে হোমই প্রধান

জাতকর্ম—পুত্রপ্রসবের পরে, কিন্তু নাড়ীছেদের পূর্বে, পুত্রের মেধা ও আয়ুবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

নামকরণ—শিশুর নাম রাখা এই সংস্কারের উদ্দেশ্য। ইহার উপযুক্ত কাল সম্বন্ধে রঘুনন্দনধৃত গোভিল ও অন্যান্য কতক শাস্ত্রকারের মতে, জন্ম হইতে দশ বা এগার রাত্রির পরে, অথবা একশত রাত্রি বিগত হইলে কিংবা একবৎসর অতীত হইলে এই সংস্কার বিধেয়। মনে হয়, ভবদেবের সময়ে প্রচলিত আচার অনুযায়ী নামকরণ জন্মের দিনেও হইতে পারিত[২]। আজকাল অন্নপ্রাশনের সময়ে ইহা হইয়া থাকে।

নিষ্ক্রমণ—শিশুর জন্ম হইতে তৃতীয় জ্যোৎস্না, অর্থাৎ তৃতীয় মাসের শুক্লপক্ষে ইহা করণীয়। ইহার পরে শিশুকে সর্বপ্রথম গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত করা হয়। ঋগ্বেদী ও যজুর্বেদীর পক্ষে জন্ম হইতে চতুর্থ মাসে ইহা অনুষ্ঠেয়।

অন্নপ্রাশন—শিশুর জন্মের পরে সাবন গণনায় ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে ইহা করণীয়। কন্যার পক্ষে পঞ্চম বা সপ্তম মাসে ইহা অনুষ্ঠেয়।

চূড়াকরণ—ইহা চূড়াকর্ম বা চৌল নামেও অভিহিত হয়। শব্দটির অর্থ —সমস্ত কেশ ছেদনপূর্বক মস্তকে চূড়া রাখা; চূড়া অর্থাৎ মস্তকোপরি কেশগুচ্ছ। ইহা পুত্রের জন্মের প্রথম, তৃতীয় বা পঞ্চম বর্ষে কর্তব্য; এই সময়গুলির মধ্যে 'কুলাচারবশাৎ' যে

১ ইহার পরে প্রসবকাল পর্যন্ত পত্নী কেশবিন্যাস ও পতিসহবাস করিবেন না।

২ তথা হ্যাচারাৎ জন্মদিনে বা নামকরণং কর্তব্যম্।—ভবদেবপদ্ধতি।

কোন সময়ে এই সংস্কার করণীয়। নিম্নলিখিত সময়গুলিতে এই অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ :—

পুত্রের জন্মনক্ষত্র, জন্মমাস, জন্ম হইতে যুগ্মমাস, জন্ম হইতে যুগ্মবৎসর।

ঔডুম্বর বা তাম্রনির্মিত ক্ষুরের সাহায্যে কেশছেদন করিয়া ছিন্নকেশ বৃষের গোময়ে রাখিতে হইবে। তৎপর ঐ গোময় বনে অথবা, কোন কোন শাস্ত্রের মতে, ধান্য বা 'বংশবিটপে' পুঁতিয়া রাখিতে হইবে। এই সংস্কারের অনুষ্ঠানপ্রসঙ্গে পুত্রের কর্ণবেধও করণীয়[১]। এই সংস্কার অধুনা উপনয়নের সময় অনুষ্ঠিত হয়।

উপনয়ন—শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এইরূপ—অধ্যাপনার্থমাচার্যসমীপং নীয়তে যেন কর্মণা তদুপনয়নম্[২]। লেখাপড়া শিক্ষা দিবার জন্য 'উপ' অর্থাৎ আচার্যের সমীপে নীত হয় যে কর্মের দ্বারা তাহার নাম উপনয়ন, এখানে লেখাপড়ার অর্থ বেদাধ্যয়ন। উপনয়নের যোগ্য মাস, তিথি ও দিন সংক্রান্ত বিধিনিষেধগুলি নানা শাস্ত্রবচনের আলোচনাহেতু জটিল। সুতরাং, এই সংস্কাব সম্বন্ধে মোটামুটি নিয়মগুলি নিম্নে লিখিত হইল।

উপনয়নের যোগ্য বয়স—ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণভেদে যোগ্য বয়স বিভিন্ন। আবার, মুখ্য ও গৌণ ভেদে বয়স দ্বিবিধ। মুখ্য বয়স এইরূপ :—

ব্রাহ্মণ—গর্ভকাল বা জন্মকাল হইতে অষ্টম বর্ষ,

ক্ষত্রিয়—গর্ভকাল হইতে একাদশ বর্ষ,

বৈশ্য—গর্ভকাল হইতে দ্বাদশ বর্ষ।

গৌণকাল যথাক্রমে ষোড়শ, দ্বাবিংশ ও চতুর্বিংশ বর্ষ পর্যন্ত। রঘুনন্দনের মতে, ষোড়শাদি বর্ষের ক্ষেত্রে 'পর্যন্ত' অর্থ 'অভিবিধি'; অর্থাৎ, উক্ত কালগুলিও কালসীমার অন্তর্ভুক্ত[৩]। অনুপনীত অবস্থায় গৌণকাল

১ অস্মিন্নেব সময়ে কর্ণবেধোঽপি কর্তব্যঃ— ঐ, পৃঃ ১০১।

২ স্মৃ, ত, ১, পৃঃ ৯২৭।

৩ আষোড়শাদিত্যভিবিধাবাঙ্—ঐ। কোন কোন প্রমাণানুসারে, ব্রাহ্মণের পক্ষে গৌণকাল পঞ্চদশ বর্ষ। স্মার্ত এই বিরোধের মীমাংসায় বলিয়াছেন যে, গর্ভকাল হইতে ষোড়শ বর্ষ ও জন্মকাল হইতে পঞ্চদশ বর্ষ।

অতীত হইলে, বালক 'পতিতসাবিত্রীক' হয় এবং বেদপাঠে তাহাব অধিকাব থাকে না। রঘুনন্দন নানাশাস্ত্রবলে নির্দেশ দিয়াছেন যে, ঈদৃশ 'ব্রাত্য' সংজ্ঞক বালক গোদান সহ চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়নেব অধিকাবী হইতে পাবে। অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত ব্রাত্যেব উপনয়ন সংস্কার যে কবিবে সেও প্রায়শ্চিত্তার্হ। নিম্নলিখিত কোন কাবণে উপনয়নেব কাল অতিক্রান্ত হইলে, বালক তিনবাব কৃচ্ছ্র বা প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত কবণান্তে উপনয়নেব যোগ্যতা লাভ কবিতে পাবে[1] :—

পিতৃমাতৃবিয়োগ, দাবিদ্র্য, দেশোপপ্লব।

উপনয়নের উপযুক্ত কাল

বঘুনন্দনোদ্ধৃত একটি প্রমাণ অনুসারে বিভিন্ন মাসে উপনয়নেব ফলে বালক নিম্নলিখিতরূপ হইবে :—

মাঘ—'দ্রবিণশীলাঢ্য', অর্থাৎ ধনে ও শীলে উন্নত,
ফাল্গুন—'দৃঢব্রত' অর্থাৎ দৃঢপ্রতিজ্ঞ,
চৈত্র—'মেধাবী'
বৈশাখ—'কোবিদ' বা পণ্ডিত,
জ্যৈষ্ঠ—'গহননীতিজ্ঞ', অর্থাৎ নীতিতে[2] সবিশেষ অভিজ্ঞ,
আষাঢ—'ক্রতুভাজন'[3]।

স্বাতী, ধনিষ্ঠা, অশ্বিনী, অনুবাধা, হস্তা, পুষ্যা, চিত্রা, শ্রবণা, উত্তব-ফাল্গুনী, উত্তরভাদ্রপদ, পূর্বভাদ্রপদ ও পূর্বাষাঢা প্রভৃতি নক্ষত্রকে উপনয়নেব অনুকূল বলা হইয়াছে। উত্তবায়ণে শুক্লপক্ষে শুভনক্ষত্রযুক্ত দিনে উপনয়ন প্রশস্ত। স্মার্ত-ধৃত গর্গবচনানুসারে ইহা শুধু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েব পক্ষে প্রযোজ্য ; কারণ, ইহাও বলা হইয়াছে যে, বৈশ্যেব উপনয়ন দক্ষিণায়নে এবং কৃষ্ণপক্ষেও হইতে পাবে।

১ স্মৃ, ত, পৃঃ ৯২৭।
২ নীতিশব্দে রাজনীতি বা ব্যবহারিক নীতি বুঝায়।
৩ 'ক্রতু' শব্দে যাগযজ্ঞ বা বল বুঝায়। এখানে কোন অর্থ অভিপ্রেত তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়না।

যে যে সময়ে অনধ্যায়[1] বিহিত হইয়াছে, সেই সেই সময়ে উপনয়নও নিষিদ্ধ।

উপনয়ন-সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় আচার

উপনয়ন-সংক্রান্ত কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক শাস্ত্রমূলক আচার এইরূপ :—

(১) উপনয়ন-দিবসে প্রভাতে বালকের ক্ষীরাদি[2] ভোজন, মুণ্ডন, স্নান, ভূষণাদি ধারণ এবং ধৌতবস্ত্র পরিধান[3],

(২) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের বালক কর্তৃক যথাক্রমে মৌঞ্জী, মৌর্বী ও শণনির্মিত মেখলা ধারণ,

(৩) দণ্ডধারণ। ব্রাহ্মণের দণ্ড বিল্ব অথবা পলাশ কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত, ক্ষত্রিয়ের বট অথবা খদিরবৃক্ষজাত এবং বৈশ্যের দণ্ড বংশ কিংবা উডুম্বর বৃক্ষসম্ভূত। তিন বর্ণের উপযোগী দণ্ডের দৈর্ঘ্য হইবে যথাক্রমে কেশ, কপাল এবং নাসিকা পর্যন্ত। অন্যান্য অনেক স্থলের ন্যায়, এ ক্ষেত্রেও রঘুনন্দন শাস্ত্রনিয়মের অন্ধ আনুগত্যের ব্যবস্থা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, বর্ণবিশেষের পক্ষে বিহিত দ্রব্য না পাইলে যে কোন বর্ণের জন্য যে কোন দ্রব্য চলিতে পারে (অলাভে বা সর্বাণি সর্বেষাম্[4])।

সমাবর্তন—কোন কোন গৃহ্যসূত্রে ও স্মৃতিগ্রন্থে ইহাকে স্নান বা আপ্লবন বলা হইয়াছে। শব্দটির অর্থ—গুরুগৃহে বেদপাঠ সমাপনান্তে

১ নিম্নলিখিত শ্লোকে অনধ্যায়ের কাল উক্ত হইয়াছে :—

কার্ত্তিকস্যাশ্বিনস্যাপি ফাল্গুনাষাঢ়য়োরপি।
কৃষ্ণপক্ষে দ্বিতীয়ায়ামনধ্যায়ং বিদুর্বুধাঃ॥ স্মৃ, ত, ১, পৃঃ ১২৮।

২ পয়োযবাম্বামিক্ষাহারাঃ ক্রমশো দ্বিজাতীনাম্।

৩ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উত্তরীয় যথাক্রমে মৃগচর্ম, রুরুচর্ম ও অজচর্মনির্মিত এবং নিম্নাঙ্গের বসন ক্ষুমা অথবা শণ, কার্পাস ও মেষলোমনির্মিত।

৪ স্মৃ, ত, ১, পৃঃ ৯৩০।

ছাত্রকর্তৃক গৃহে প্রত্যাবর্তন। এই অনুষ্ঠানে প্রধান কর্তব্য যথাবিধি স্নানের পর ব্রাহ্মণভোজন করান। তারপর ছাত্র 'কেশশ্মশ্রুরোমনখানি বাপয়েৎ শিখাবর্জম্'; অর্থাৎ, মাথায় শুধু 'শিখা' নামক কেশগুচ্ছ রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত কেশ, শ্মশ্রু, নখ ও লোম ছেদন করিবে। ইহার পরে, ছাত্র কুণ্ডল, মাল্য ও পরিচ্ছন্ন বস্ত্রাদি দ্বারা শোভিত হইয়া, চর্মপাদুকা ও বংশদণ্ড গ্রহণ করিয়া আচার্যের অনুমতি লইয়া গার্হস্থ্য আশ্রমের জন্য প্রস্তুত হইবে।

আজকাল উপনয়নের পর কুলাচার অনুযায়ী প্রাচীনকালের গুরুগৃহ-বাসের পরিবর্তে তিন রাত্রি বা এক রাত্রি, অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েক ঘণ্টা মাত্র, একটি ঘরে আবদ্ধ থাকিয়া উক্তরূপে স্নানপূর্বক উপনীত ব্যক্তি সমাবৃত্ত হইয়া থাকে।

বিবাহ—ইহা প্রধানতম সংস্কার। ইহার সম্বন্ধে প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি পূর্বে বিবাহপ্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে মোটামুটি বিষয়গুলি নিম্নে আলোচিত হইল।

বিবাহের যোগ্য কাল—বঙ্গীয় নিবন্ধে উদ্ধৃত আশ্বলায়নের মতে, উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষে শুভনক্ষত্রযুক্ত কাল বিবাহের প্রশস্ত সময়। রঘুনন্দন কিন্তু বলিয়াছেন যে, বিবাহ সর্বকালেই সম্পন্ন হইতে পারে[১]। তাঁহার মতে, বিবাহ সম্বন্ধে কালনিয়ম দশ বর্ষ পর্যন্ত বয়স্কা কন্যার পক্ষেই প্রযোজ্য, এই বয়স অতিক্রান্ত হইলে কোন কালনিয়ম পালনীয় নহে।

বিবাহের অনুষ্ঠান—পূর্বে যে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদ্বারাই বিবাহের অনুষ্ঠান আরব্ধ হয়। অশৌচ যদিও ধর্মানুষ্ঠানের প্রতিবন্ধক, তথাপি বিবাহ আরব্ধ হইলে অশৌচ কোন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না। মলমাস ধর্মকার্যের প্রতিবন্ধক হইলেও, বিবাহারম্ভের পরে মলমাস বিবাহের অন্তরায় হইতে পারে না। রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে, বিবাহের আরম্ভ হইলে কন্যার রজোদর্শনহেতু বিবাহ পণ্ড হয় না; শাস্ত্রবিহিত একটি অনুষ্ঠানের দ্বারা রজোজনিত অশুদ্ধি দূরীকৃত হয়।

১ বিবাহঃ সার্বকালিকঃ—স্মৃতিতত্ত্ব, ১, পৃঃ ৮৮২।

বিবাহের প্রকৃত অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয় তখনই যখন সুগন্ধিদ্রব্য অনুলেপন পূর্বক স্নান সমাপন করিয়া পাত্র বরণার্থ বিবাহস্থানে উপস্থিত হন। ইহার পরে হয় পূর্বে বর্ণিত মুখচন্দ্রিকা।

এই প্রসঙ্গে রঘুনন্দন প্রচলিত কয়েকটি কৌতুককর বিশ্বাসের উল্লেখ করিয়াছেন। ক্ষুত বা হাঁচি সাধারণতঃ অশুভসূচক বলিয়া বিবেচিত হইলেও, বিবাহে নাকি ইহা শুভসূচক। বিবাহে যন্ত্রসঙ্গীত ও স্ত্রীলোকের কণ্ঠসঙ্গীত এবং উলু-উলুধ্বনি শুভসূচক বলিয়া জ্ঞাত।

বরের অর্হণ বা অভ্যর্থনা এই অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। কন্যা রক্তবস্ত্রযুগলপরিহিতা ও নানাভরণে ভূষিতা হইবে এবং বর শ্বেতবস্ত্র-যুগলাদি দ্বারা সজ্জিত হইবে। নিম্নলিখিত দ্রব্যদ্বারা বরের অভ্যর্থনা করণীয়ঃ—

দর্ভনির্মিত বিষ্টর বা আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় জল, মধুপর্ক[১]।

বিবাহস্থলে একটি ধেনু বাঁধা অবস্থায় রাখিতে হইবে। অর্হণান্তে বর পূর্বে নিযুক্ত একজন নাপিতের অনুরোধে উহাকে উন্মোচন করিবে।

বিবাহের অনুষ্ঠানাদি প্রসঙ্গে রঘুনন্দন 'জ্ঞাতিকর্ম'[২] নামক এক অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা তাঁহার সময়ে আর প্রচলিত ছিল না। ইহাতে আত্মীয়গণ কন্যাকে স্নান করাইয়া দিতেন।

যদিও দানমাত্রেই দাতা বসিবেন পূর্বমুখী হইয়া এবং গ্রহীতা থাকিবেন উত্তরমুখী, তথাপি বিবাহে এই নিয়মের ব্যতিক্রম[৩] বিধেয়।

দিনের বেলায় বিবাহ নিষিদ্ধ।

সমস্ত দানে গ্রহীতাকে দাতার দক্ষিণা দিতে হয়। কন্যাদানে দক্ষিণা স্বর্ণ।

১ সাধারণতঃ এই শব্দে দধি, মধু, ঘৃত, শর্করা ও জলের মিশ্রণকে বুঝায়। বিবাহে শুধু মধু ও ঘৃত মিশ্রিত দধিই দেয় বলিয়া মনে হয়।

২ দ্রঃ—গোভিল গৃহ্যসূত্র—২।১।১০-১১।

৩ এই 'ব্যতিক্রম' শব্দের তাৎপর্য, কাহারও কাহারও মতে, এই যে, দাতা থাকিবেন 'উত্তরমুখী' এবং গ্রহীতা 'পূর্বমুখী'। আবার, কোন মতে, দাতা হইবেন পশ্চিমমুখী এবং গ্রহীতা পূর্বমুখী। স্মার্তের মতে, দাতা পশ্চিমমুখী বসিবেন।

কন্যাদানের পরে পর পর কতগুলি অনুষ্ঠানের বিধান আছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান :—

(১) প্যাণিগ্রহণ—বরকর্তৃক কন্যার হস্তধারণ।

(২) অশ্মারোহণ—প্রস্তরখণ্ডে কন্যার আরোহণ। ইহাদ্বারা কন্যা পতিগৃহে স্থিতিশীলা হন।

(৩) লাজহোম—কন্যাকর্তৃক অগ্নিতে লাজক্ষেপ ; 'লাজ' শব্দের অর্থ খৈ।

(৪) সপ্তপদীগমন—বরের সাহায্যে কন্যার সপ্তবার পদক্ষেপ।

(৫) মূর্ধাভিষেক—বর ও কন্যার মস্তকে পবিত্র বারিসিঞ্চন।

(৬) মহাব্যাহৃতিহোম।

(৭) ধ্রুবারুন্ধতীদর্শন—বরকর্তৃক কন্যাকে ধ্রুবতারা ও অরুন্ধতী নক্ষত্র প্রদর্শন। 'ধ্রুব' শব্দের অর্থ স্থির, আর রোধার্থক রুধ্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'অরুন্ধতী'। সুতরাং, এই অনুষ্ঠানদ্বারা বর স্বীয়কুলে কন্যাকে স্থিতিশীলা করেন।

(৮) পত্যভিবাদন—কন্যাকর্তৃক বরকে প্রণাম। এখানে কন্যা পিতৃগোত্রের কি পতিগোত্রের উল্লেখ করিবে, সেই সম্বন্ধে নিবন্ধকারগণের মতভেদের কথা বিবাহপ্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানেই বিবাহের পরিসমাপ্তি[১] এবং এখানেই পতির সমক্ষে পত্নীর প্রথম বাক্‌স্ফূর্তি[২]।

উক্ত অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন হইলে দম্পতী ক্ষার ও লবণ বর্জিত ভোজ্যবস্তু গ্রহণ করতঃ ব্রহ্মচর্য অবলম্বন পূর্বক তিন রাত্রি একত্র হইয়া ভূমিতে শয়ন করিবেন।

১ রঘুনন্দনের মতে, এই নিয়ম শুধু সামবেদীয়গণের পক্ষে প্রযোজ্য।

২ সোহস্তা বাগ্‌বিসর্গঃ........ মৌনত্যাগঃ—স্মৃ. ত. ১, পৃঃ ৯০৩-৯০৪।

এই সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গে রঘুনন্দন গোভিলগৃহ্যসূত্রের নিম্নলিখিত সূত্রটি[1] উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

প্রাবৃতাং যজ্ঞোপবীতিনীং·········জপেৎ ইত্যাদি।

ইহা হইতে, স্ত্রীর যজ্ঞোপবীত ধারণের রীতি স্পষ্টই প্রতিভাত হয়[2]। রঘুনন্দন 'যজ্ঞোপবীত' শব্দের অর্থ করিয়াছেন যজ্ঞোপবীতাকারে রক্ষিত উত্তরীয়। সম্ভবতঃ পুরাকালে স্ত্রীলোকেরও যজ্ঞোপবীত-ধারণের ব্যবস্থা ছিল এবং কালক্রমে এই প্রথা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অতএব, রঘুনন্দনকে 'যজ্ঞোপবীত' শব্দের ঐরূপ অর্থ করিতে হইয়াছে।

সমস্ত অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হইলে পতি পত্নীকে কোন যানে লইয়া স্বগৃহে যাইবেন। গৃহে তাঁহাদের পৌছিবার পরে বহু স্ত্রী-আচার পালনীয়। এই সমস্ত আচার অনুষ্ঠিত হইবে পতিপুত্রশীলসম্পন্না নারীর সাহায্যে।

বিবাহের চতুর্থদিনে চতুর্থীকর্ম নামক অনুষ্ঠান বিধেয়।

৩। শ্রাদ্ধ

হিন্দু আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এই আত্মা, তাহার মতে, অবিনশ্বর। মানুষের মৃত্যুর অর্থ তাহার দেহের ধ্বংস, আত্মার নহে। মৃতব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, আত্মার তুষ্টিবিধান ও উহার নিকট আশীর্বাদ-প্রার্থনা—শ্রাদ্ধ বলিতে এই সকলই বুঝায়। আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা যে মৃতব্যক্তির শুধু মৃত্যুতিথিতেই জানান হয়, তাহা নহে; উপনয়ন এবং বিবাহাদি সংস্কারের পূর্বেও এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অবশ্যদেয়। যুগ যুগ ধরিয়া শ্রাদ্ধ হিন্দুর সমাজ ও ধর্ম-জীবনের অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

১ ২।১।১৯-২২।

২ উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য—'গোভিলগৃহ্যসূত্র', সং সত্যব্রত সামশ্রমী, পৃঃ ৬৭।

শ্রাদ্ধবিষয়ক নিবন্ধ

শ্রাদ্ধবিষয়ক বঙ্গীয় প্রধান নিবন্ধগুলি এই :—

(১) শূলপাণির 'শ্রাদ্ধবিবেক'[১]

(২) রঘুনন্দনের 'শ্রাদ্ধতত্ত্ব'[২],

(৩) গোবিন্দানন্দের 'শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী'[৩]।

বর্তমান প্রসঙ্গে এই সকল গ্রন্থানুযায়ী শ্রাদ্ধের তত্ত্ব ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রাদ্ধের সংজ্ঞা

শূলপাণি কর্তৃক উদ্ধৃত আপস্তম্বের মতে, মৃতব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে কতক দ্রব্যের ত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক ঐ সকল দ্রব্যের গ্রহণ পর্যন্ত যাবতীয় কর্মকেই বলা হয় শ্রাদ্ধ। শূলপাণি নিজেই এই সংজ্ঞার দোষ আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ, শ্রাদ্ধীয় অন্ন শুধু ব্রাহ্মণকে দান করাই বিধেয় নহে; অগ্নিতে বা জলে উহাকে নিক্ষেপ করারও বিধি আছে এবং উহা গাভী বা অজকেও দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং, উক্ত সংজ্ঞায় একটি প্রধান বিষয়েই ত্রুটি থাকিয়া যায়। 'দেবশ্রাদ্ধ' প্রভৃতি শব্দে শ্রাদ্ধের মুখ্য অর্থই নাই, আছে গৌণ অর্থ। পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ এক প্রকার শ্রাদ্ধ বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু, উক্ত সংজ্ঞা অনুসারে ইহাকে শ্রাদ্ধ বলা যায় না; কারণ, ইহাতে কোন দ্রব্য ব্রাহ্মণকর্তৃক গ্রহণের কোন ব্যবস্থা নাই। এই সমস্ত দোষহেতু শূলপাণি শ্রাদ্ধের নিম্নলিখিত সংজ্ঞার নির্দেশ করিয়াছেন[৪] :—

সম্বোধনপদোপনীতান্ পিত্রাদীন্ চতুর্থ্যন্তপদেনোদ্দিশ্য হবিস্ত্যাগঃ শ্রাদ্ধম্।

১ ইহার অনেক সংস্করণ আছে। এখানে চারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য সম্পাদিত গ্রন্থটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

২ অনেক সংস্করণ আছে। এ প্রসঙ্গে চারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্যের সংস্করণ (কলিকাতা, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গোবিন্দানন্দ-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

৪ শ্রাদ্ধবিবেক, পৃঃ ২৬।

সম্বোধন পদের দ্বারা (আহূত হইয়া) উপস্থিত পিত্রাদির (আত্মাকে) চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত পদের সাহায্যে উদ্দেশ্য করিয়া হবিত্যাগের নাম শ্রাদ্ধ।

শ্রাদ্ধের তাৎপর্য সম্বন্ধে রঘুনন্দন বিশেষ আলোচনা না করিয়া বলিয়াছেন যে, বৈদিক প্রয়োগাধীন শ্রদ্ধাপূর্বক আত্মার উদ্দেশ্যে অন্নাদিদানের নামই শ্রাদ্ধ।

শ্রাদ্ধের সংজ্ঞা সম্বন্ধে গোবিন্দানন্দ কর্তৃক উদ্ধৃত[১] বিভিন্ন মতের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টিই প্রধান :—

(১) পৃথিবী তে পাত্রমিতি মন্ত্রকরণকপাত্রালম্ভনপূর্বকো হবিস্ত্যাগঃ শ্রাদ্ধম্,

(২) বেদবোধিতসম্বোধিতদৈবতো হবিস্ত্যাগঃ শ্রাদ্ধম্,

(৩) পিতৄনুদ্দিশ্য ব্রাহ্মণস্বীকারপর্যন্তো হবিস্ত্যাগঃ শ্রাদ্ধম্।

নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া গোবিন্দানন্দ উক্ত সমস্ত মতের খণ্ডন পূর্বক নিজে নিম্নলিখিত সংজ্ঞানির্দেশ করিয়াছেন[২] :—

বেদবোধিতসম্বোধনপদোপনীতোদ্দেশ্যকতর্পণেতরঃ প্রধানো হবিস্ত্যাগঃ শ্রাদ্ধম্।

এই সংজ্ঞা ও শূলপাণিকৃত সংজ্ঞার মূল অর্থ একরূপই। উভয় সংজ্ঞা হইতেই বুঝা যায় যে, শ্রাদ্ধে হবিত্যাগই প্রধান কর্তব্য। কিন্তু প্রশ্ন এই— যাগ, দান ও হোম, এই তিন স্থলেই হবিত্যাগ বিধেয়। তাহা হইলে, শ্রাদ্ধ ইহাদের কোন্ শ্রেণীভুক্ত? এই বিষয়ে বিভিন্ন মতের সমালোচনা করিয়া শূলপাণি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে শ্রাদ্ধ যাগস্বরূপ এবং দান-স্বরূপও বটে[৩]।

শ্রাদ্ধের প্রকারভেদ

শূলপাণি যে শাস্ত্রকারগণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা বিভিন্নরূপ শ্রাদ্ধের বিধান করিয়াছেন। তন্মধ্যে, বিশ্বামিত্রের মতে শ্রাদ্ধ দ্বাদশ প্রকার; যথা :—

১ শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী, পৃঃ ২-৩।
২ ঐ, পৃঃ ৪।
৩ যাগদানরূপতা অস্ত—শ্রাদ্ধবিবেক, পৃঃ ৫৪-৬০।

(১) নিত্য, (২) নৈমিত্তিক, (৩) কাম্য, (৪) বৃদ্ধি, (৫) সপিণ্ডন, (৬) পার্বণ, (৭) গোষ্ঠী, (৮) শুদ্ধ্যর্থ, (৯) কর্মাঙ্গ, (১০) দৈবিক, (১১) যাত্রার্থ ও (১২) পুষ্ট্যর্থ।

শূলপাণিধৃত 'ভবিষ্যপুরাণে'র মতে, উক্ত শ্রাদ্ধগুলি যথাক্রমে নিম্নলিখিতরূপ :—

(১) প্রত্যহ কর্তব্য, (২) একোদ্দিষ্ট—একজনের উদ্দেশ্যে কৃত, (৩) 'অভিপ্রেতার্থসিদ্ধি'র জন্য করণীয়, (৪) মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পূর্বে শুভকামনায় কর্তব্য, (৫) যাহা দ্বারা সপিণ্ডসম্বন্ধ স্থাপিত হয়, (৬) অমাবস্যা বা পর্বদিনে করণীয়, (৭) সুখসম্পদ লাভের আশায় অনেকের একত্র করণীয়, (৮) প্রায়শ্চিত্তের পরে পাপক্ষয়ের নিমিত্ত কৃত, (৯) নিষেক, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন প্রভৃতিতে কর্তব্য, (১০) দেবতার উদ্দেশ্যে কৃত, (১১) যাত্রার পূর্বে করণীয়[১], (১২) স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় চিকিৎসারম্ভের পূর্বে ও মঙ্গলকামনায় কৃষিকর্মাদির পূর্বে কর্তব্য।

বৃহস্পতি শ্রাদ্ধের নিম্নলিখিত পাঁচটি শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন :—

(১) নিত্য, (২) নৈমিত্তিক, (৩) কাম্য, (৪) বৃদ্ধি, (৫) পার্বণ।

উক্ত তালিকায় 'কূর্মপুরাণে' পার্বণের পরিবর্তে একোদ্দিষ্টের উল্লেখ আছে।

শূলপাণির মতে, বিশ্বামিত্রের দ্বাদশ প্রকার শ্রাদ্ধ বৃহস্পতির পঞ্চবিধ শ্রাদ্ধেরই অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলিয়াছেন যে, বিশ্বামিত্রের তালিকায় গোষ্ঠী শ্রাদ্ধ হইতে পুষ্ট্যর্থ পর্যন্ত সমস্ত প্রকার শ্রাদ্ধই কোন বিশেষ উপলক্ষ্যে বা বিশেষ পদ্ধতিতে করণীয়। অতএব ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীর শ্রাদ্ধ বলা যায় না। সপিণ্ডীকরণে পার্বণ ও একোদ্দিষ্ট—এই উভয়েরই স্বরূপ আছে বলিয়া ইহাকেও পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত করা যায় না।

'মৎস্যপুরাণে' নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যভেদে শ্রাদ্ধের যে ত্রিধা বিভাগ করা হইয়াছে, তাহাও উক্ত পঞ্চধা বিভাগের বিরোধী নহে। শূলপাণি বলিয়াছেন যে, কোন নিমিত্তবশতঃ যাহা করণীয় তাহাই নৈমিত্তিক; সুতরাং,

১ টীকাকার শ্রীকৃষ্ণের মতে, 'যাত্রা' শব্দে এখানে তীর্থযাত্রা বুঝায়।

পর্বনিমিত্ত কর্তব্য পার্বণ নৈমিত্তিক শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। মঙ্গলকামনায় করণীয় বলিয়া বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কাম্যশ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

নিত্য ও কাম্যভেদে বিষ্ণুর মতে শ্রাদ্ধ দ্বিবিধ। শূলপাণি এইরূপ শ্রেণী-বিভাগও সমর্থন করিয়াছেন।

শ্রাদ্ধের উপযুক্ত স্থান

শূলপাণি কর্তৃক উদ্ধৃত প্রমাণ অনুসারে, নিম্নলিখিত স্থানগুলি শ্রাদ্ধের জন্ত প্রশস্ত :—

> (১) পুষ্কর[১] নামক স্থান, (২) অপর সকল তীর্থস্থান, (৩) বড় বড় নদীর তীর, (৪) নদীর সঙ্গমস্থল, (৫) নদীর উৎপত্তিস্থল, (৬) 'নদীতোয়োত্থিত দেশ'—অর্থাৎ, নদীর জল যে স্থান হইতে অপসৃত হইয়াছে সেই স্থান বা দ্বীপ, (৭) নিকুঞ্জ, (৮) প্রস্রবণ, (৯) উদ্যানবাটিকা, (১০) বন, (১১) গোময়োপলিপ্ত গৃহ, (১২) 'মনোজ্ঞ' স্থান, (১৩) গঙ্গা ও সরস্বতী নদীর তীর, (১৪) গয়া, (১৫) কুরুক্ষেত্র, (১৬) প্রয়াগ,. (১৭) নৈমিষ, (১৮) পর্বত বা তন্নিকটবর্তী স্থান।

রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দ উক্ত তালিকার সহিত অপর কোন স্থানের নাম যুক্ত করেন নাই। গোবিন্দানন্দ বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রকর্তৃক নিহত বৃত্রের মেদে সমগ্র পৃথিবী অপবিত্র হইয়াছিল বলিয়া পৃথিবীর অপর নাম মেদিনী। সুতরাং, শ্রাদ্ধস্থান 'পঞ্চগব্য'[২] ও 'উল্মুক'[৩] প্রভৃতির সাহায্যে শোধনীয়। তাঁহার মতে, বারাণসীতে শুধু গোময় ভিন্ন অপর শোধক দ্রব্যের ব্যবহার অনাবশ্যক।

শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ স্থান

যে সমস্ত স্থানে শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য :—

> (১) ম্লেচ্ছ-অধিকৃত বা ম্লেচ্ছ-অধ্যুষিত স্থান—চতুর্বর্ণের লোক যেখানে বাস করে না তাহাকেই ম্লেচ্ছদেশ বলা হয়, (২) ত্রিশঙ্কুদেশ—

১ একটি তীর্থস্থান। সম্ভবতঃ বর্তমান আজমীরান্তর্গত পোখর নামক স্থান। বিষ্ণুর মতে তিনটি পুষ্কর আছে; যথা—জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ।

২ দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্রের সংমিশ্রণ।

৩ জ্বলন্ত অঙ্গার।

মহানদীর উত্তরে এবং কীকট বা মগধের দক্ষিণে দ্বাদশ যোজনব্যাপী দেশ, (৩) কারস্কর দেশ, (৪) সিন্ধুনদের উত্তরস্থ দেশ, (৫) 'রুক্ষ' অর্থাৎ বালুকাময় স্থান, (৬) কীটপতঙ্গবহুল স্থান, (৭) কর্দমাক্ত স্থান, (৮) সংকীর্ণ স্থান, (৯) 'অনিষ্টগন্ধিক' স্থান, (১০) অপর ব্যক্তি কর্তৃক অধিকৃত স্থান—যদি এরূপ ভূমিতে শ্রাদ্ধ অপরিহার্য হয়, তবে এই ব্যক্তি জীবিত থাকিলে তাহাকে ভূমির মূল্য দিতে হইবে, এবং সে মৃত হইলে তাহার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের অগ্রভাগ দিতে হইবে।

উক্ত স্থানগুলি ছাড়াও রঘুনন্দন 'ইষ্টকারচিত' স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন।

স্ত্রীলোকের শ্রাদ্ধ

'ছন্দোগপরিশিষ্টে' নিম্নোদ্ধৃত ব্যবস্থাটি আছে :—

ন যোষিদ্ভ্যঃ পৃথগ্ দদ্যাদবসানদিনাদৃতে।
স্বভর্তৃপিণ্ডমাত্রাভ্যস্তৃপ্তিরাসাং যতঃ স্মৃতা॥

ইহার অর্থ—মৃত্যুতিথি ভিন্ন স্ত্রীলোকদিগকে পৃথক্ পিণ্ড দেওয়া বিধেয় নহে, যেহেতু, নিজ নিজ পতির পিণ্ডাংশ হইতে ইঁহাদের তৃপ্তি হয় বলিয়া কথিত আছে। এই বিধান শুধু সামবেদীয়গণের পক্ষে প্রযোজ্য, অপর বেদের অনুসরণকারিগণের পক্ষে নহে।

মৃত্যুতিথি ভিন্ন অন্য উপলক্ষ্যে নারীর পৃথক্ পিণ্ড প্রাপ্য কিনা সেই বিষয়ে শূলপাণি ও রঘুনন্দন উভয়েই তর্কের অবতারণা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মৃত্যুতিথিতেই শুধু নারীগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান কর্তব্য। বৃদ্ধি প্রভৃতি অপরাপর শ্রাদ্ধে তাঁহারা নিজ নিজ স্বামীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পিণ্ড হইতেই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন।

শ্রাদ্ধকর্তার কর্তব্যাকর্তব্য

শ্রাদ্ধদিনে কর্তব্য কর্মের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান :—

১ প্রাতঃস্নানের পরে ধৌতবস্ত্র পরিধান,

২ শ্রাদ্ধীয় অন্নের রন্ধন—স্বয়ং অক্ষম হইলে ইহা শ্রাদ্ধকর্তার পত্নী করিতে পারেন, পত্নীর অভাবে সপিণ্ডও এই কার্যে সক্ষম। এই রন্ধন মৃৎ- বা তাম্র-পাত্রে করণীয়।

শ্রাদ্ধদিনে বর্জনীয় কর্ম সম্বন্ধে রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দ সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত কর্মগুলি বিশেষভাবে পরিত্যাজ্য :—

১। অপরের শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে ভোজনে অংশগ্রহণ বা পরান্নগ্রহণ, ২। ক্রোধ, ৩। পদব্রজে, নৌকাযোগে বা অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ, ৪। অক্ষক্রীড়া, ৫। বেদপাঠ, ৬। দারাভিগমন[১], ৭। দান, ৮। প্রতিগ্রহ, ৯। সন্ধ্যা, ১০। দিবানিদ্রা, ১১। ভারবহন, ১২। দন্তধাবন, ১৩। তাম্বূলভক্ষণ, ১৪। প্রাণিহিংসা, ১৫। শরীরে তৈলমর্দন।

শ্রাদ্ধের পূর্বদিনে নিম্নলিখিত কর্মগুলি করণীয় :—

১। বস্ত্রাদিশোধন, ২। ক্ষৌরকর্ম, ৩। শ্রাদ্ধস্থানের শোধন, ৪। ইন্দ্রিয়-সংযম, ৫। একবার মাত্র নিরামিষ আহার, ৬। শ্রাদ্ধদিনের জন্য ব্রাহ্মণগণের নিমন্ত্রণ।

নিমন্ত্রিত শ্রাদ্ধান্নগ্রাহী ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা অযুগ্ম[২] হইবে এবং সেই সংখ্যা নির্ধারিত হইবে শ্রাদ্ধকারীর ক্ষমতা অনুসারে। শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হওয়ার যোগ্য তাঁহারাই যাঁহাদের আছে 'বিশুদ্ধমাতাপিতৃকত্বম্'—যাঁহাদের মাতাপিতা কলুষিত নহেন, 'সৎকর্মশালিত্বম্'—যাঁহারা সৎকর্ম করেন, 'আত্মানা-অবিবেচনশক্তি'—সার ও অসার বস্তুর মধ্যে যিনি প্রভেদ বিচার করিতে সক্ষম। উল্লিখিত গুণগুলি ছাড়াও তাঁহারা হইবেন বেদপাঠনিরত ও নির্লোভ।

দূরস্থ গুণশালী ব্যক্তি অপেক্ষা নিকটস্থ ব্রাহ্মণগণই অল্পগুণবিশিষ্ট হইলেও নিমন্ত্রণের জন্য অধিকতর যোগ্য। শ্রাদ্ধকর্তার দৌহিত্র, জামাতা ও ভাগিনেয় নির্গুণ হইলেও তাহাদিগকে অবশ্য নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। শ্রাদ্ধকর্তার ন্যায় নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণও ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি পালন করিবেন।

শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ ও প্রশস্ত দ্রব্য

রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দ এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। প্রধান প্রধান নিষিদ্ধ দ্রব্যগুলি এইরূপ :—

১ মৈথুন—ইহাকে অষ্টপ্রকার বলা হইয়াছে ; যথা, স্মরণ, কীর্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়ানিষ্পত্তি।

২ আভ্যুদয়িক বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ যুগ্মসংখ্যক হইবে।

(ক) ফল— তাল, জম্বীর, রক্তবিল্ব,

(খ) শাকসব্জী—কুষ্মাণ্ড, অলাবু, বার্তাকু, পিণ্ডমূলক, নালিকা, লশুন, পালঙ্কি, রাজমাস,

(গ) শস্য— মসূর, চণক, বিড়ঙ্গ, কুলত্থ, শরৎ ও হেমন্তকালে পক্ক ধান্য ভিন্ন অন্য সর্বপ্রকার ধান্য[১],

(ঘ) বিবিধ— হিঙ্গু, কৃত্রিম লবণ, যে সকল দ্রব্যের উপরে কেহ হাঁচি দিয়াছে বা অশ্রু মোচন করিয়াছে, যে দ্রব্যের অংশ ভক্ষিত হইয়াছে, শর্করা, কীটপতঙ্গ, কাঁকর, কেশ প্রভৃতি সহ পক্ক দ্রব্য, অতিশয় লবণাক্ত দ্রব্য, চণ্ডাল কর্তৃক আহৃত দ্রব্য।

শ্রাদ্ধে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বিশেষভাবে প্রশস্ত :—

(ক) ফল— নারিকেল,

(খ) শাকসব্জী— কালশাক, পটোল, বৃহতী, মূলক,

(গ) দুগ্ধজাত দ্রব্য— দধি, ক্ষীর,

(ঘ) বিবিধ— তেঁতুল, পিপ্পলী, মরীচ, মৎস্য, মাংস, লবঙ্গ, জীরক, তিল।

একটি বচনে পিপ্পল, মরীচ ও হিঙ্গু প্রভৃতি শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ হইয়াছে। গোবিন্দানন্দ কিন্তু ইহার অর্থ করিয়াছেন যে উক্ত দ্রব্যগুলি অপক্ক অবস্থায় নিষিদ্ধ, পক্ক হইলে কোন দোষ নাই।

শ্রাদ্ধে মাংসদান সম্বন্ধে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে, নিম্নলিখিত জন্তুর[২] মাংস শ্রাদ্ধে দেয় :—

১। হরিণ, ২। পৃষৎ, ৩। এণ, ৪। রুরু, ৫। বরাহ ও ৬। শশ।

'মনুস্মৃতি'র ১১।৯৫ শ্লোকের প্রমাণ অনুসারে কেহ কেহ বলেন যে, শ্রাদ্ধে অপক্ক মাংস নিষিদ্ধ। কিন্তু, মনুর ৩।২৫৭ শ্লোকের সাহায্যে রঘুনন্দন

১ রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে, বৃষের দ্বারা কৃষ্ট ভূমিতে উৎপন্ন ধান্যই শুধু ব্যবহার্য।

২ জন্তুগুলি কিরূপ তাহা বুঝিবার জন্য দ্রষ্টব্য 'যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি' ১।১০।২৫৮-২৫৯ শ্লোকের উপর 'মিতাক্ষরা' টীকা।

অপক্ব মাংসের বিধান করিয়াছেন। শেষোক্ত শ্লোকে 'অনুপস্কৃত মাংস' শব্দ দুইটির অর্থ, কুল্লুকের মতে, 'অবিকৃত' মাংস অর্থাৎ যে মাংস পচিয়া যায় নাই। কিন্তু, ঐ শব্দ দুইটি, রঘুনন্দনের মতে, বুঝায় অপক্ব মাংস। রঘুনন্দন স্বীয় মতের সমর্থনে গৌড়ে ও দাক্ষিণাত্যে শ্রাদ্ধে অপক্ব মাংস দেওয়ার প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহার মৃত্যুদিবস অজ্ঞাত তাহার শ্রাদ্ধ

এইরূপ ব্যাপার তিনপ্রকার হইতে পারে; যথা:—

১। মৃত্যুর তিথি ও মাস উভয়ই অজ্ঞাত,

২। মৃত্যুর মাস জ্ঞাত, কিন্তু মৃত্যুতিথি অজ্ঞাত,

৩। মৃত্যুর তিথি জ্ঞাত, কিন্তু মাস অজ্ঞাত।

এই সকল ক্ষেত্রে পালনীয় মোটামুটি নিয়মগুলি নিম্নলিখিতরূপ।

প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ অমাবস্যাতে বা 'শ্রবণদিবসে' অর্থাৎ যেদিন সংবাদ পাওয়া যায় সেদিনই করণীয়। অমাবস্যা অপেক্ষাও কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথি প্রশস্ত। রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দ উভয়েরই এই মত। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ), মাঘ বা ভাদ্র মাসের ঐ তিথিতে শ্রাদ্ধ করণীয়।

শ্রাদ্ধের কালাকাল

নানা শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত বচনাদির জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া মোটামুটি যে নিয়মগুলি বুঝা যায়, সেগুলি নিম্নে লিখিত হইল।

কোন্ কোন্ শ্রাদ্ধে কোন্ কোন্ সময় প্রশস্ত তাহা নিম্নে দেওয়া গেল:—

১। মাতৃক বা অন্বষ্টকাশ্রাদ্ধ—পূর্বাহ্ণ,

২। পৈতৃক শ্রাদ্ধ—(শূলপাণি বলিয়াছেন[১] যে, ইহা দ্বারা কৃষ্ণপক্ষে করণীয় পার্বণশ্রাদ্ধকে বুঝান হয়)—অপরাহ্ণ,

৩। একোদ্দিষ্ট[২]—মধ্যাহ্ন,

৪। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ—প্রাতঃকাল।

১ শ্রাদ্ধবিবেক, পৃঃ ২৪৫।

২ পার্বণ শ্রাদ্ধ হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, পার্বণে একাধিক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করা হয়, কিন্তু একোদ্দিষ্টে শ্রাদ্ধ হয় একজনের উদ্দেশ্যে।

শ্রাদ্ধে নিম্নলিখিত সময়গুলি বর্জনীয়ঃ—

১। রাত্রি, ২। উষাকাল ও সন্ধ্যাবেলা, ৩। সূর্যে চৈবাচিরোদিতে, অর্থাৎ, সূর্যোদয়ের ঠিক পরক্ষণে। এই সময়গুলির মধ্যে 'রাক্ষসী বেলা' বলিয়া রাত্রিকালই বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

পিতৃমান্ ব্যক্তি শ্রাদ্ধের অধিকারী কিনা?

সাধারণতঃ পিতা বর্তমানে পূর্বপুরুষগণের শ্রাদ্ধে পুত্রের অধিকার নাই। কিন্তু, পাতিত্য, সন্ন্যাস, দুরারোগ্য ব্যাধি, বার্ধক্য প্রভৃতি কারণে পিতা অক্ষম হইলে পুত্রই শ্রাদ্ধ করিবে। পিতা সক্ষম হইলে তিনি যে যে পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতেন, পুত্র শুধু সেই সেই পুরুষেরই শ্রাদ্ধ করিবে। পিতা বর্তমানেও পুত্র নিজের সন্তানের সংস্কারাঙ্গ শ্রাদ্ধাদির অধিকারী।

৪। ব্রত ও পূজা

বৈদিক যুগ হইতেই ভারতে ব্রত প্রচলিত। 'ব্রত' শব্দটির অর্থ কিন্তু সে-যুগেই নানারূপ দেখা যায়[১]।

পরবর্তী যুগের ব্রতগুলিকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; যথা—১। ভক্তিমূলক ও ২। প্রায়শ্চিত্তমূলক। প্রথম প্রকারের ব্রতগুলির মূলে ভক্তি এবং উদ্দেশ্য ঐহিক সুখশান্তি ও পারত্রিক মঙ্গললাভ। সাবিত্রী-চতুর্দশী, আরোগ্য-সপ্তমী প্রভৃতি ভক্তিমূলক ব্রত। শেষোক্ত প্রকারের ব্রতগুলির উদ্দেশ্য পাপক্ষয়। চান্দ্রায়ণ, প্রাজাপত্য প্রভৃতি ব্রত প্রায়শ্চিত্তমূলক।

বাংলাদেশের স্মৃতিনিবন্ধগুলিতে বহু ব্রতের উল্লেখ ও বিবরণ আছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্রতগুলি আমরা বর্তমানে আলোচনা করিব। এই প্রসঙ্গে শুধু ভক্তিমূলক ব্রতগুলিই আলোচ্য, প্রায়শ্চিত্তমূলক ব্রতগুলি প্রায়শ্চিত্তপ্রসঙ্গে আলোচিত হইবে।

১ দ্রঃ ম্যাক্ডোনেল ও কীথ্ এর Vedic Index, ২, পৃঃ ৩৪১।

ব্রতপূজাবিষয়ক নিবন্ধ

এই দেশের অদ্যাবধি প্রকাশিত যে সমস্ত নিবন্ধে ব্রত আলোচিত হইয়াছে তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

১। জীমূতবাহনের 'কালবিবেক', ২। শূলপাণির 'ব্রতকালবিবেক',
৩। রঘুনন্দনের 'ব্রততত্ত্ব', ৪। রঘুনন্দনের 'কৃত্যতত্ত্ব',
৫। গোবিন্দানন্দের 'বর্ষক্রিয়াকৌমুদী'।

এইগুলির মধ্যে, শুধু জীমূতবাহনের গ্রন্থে ব্রত প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠানের কালাকালের বিচার আছে। শূলপাণির গ্রন্থে ব্রতের উপযুক্ত কাল বিবেচিত হইয়াছে। ব্রতসংক্রান্ত বিধিনিষেধের আলোচনা করিয়াছেন রঘুনন্দন 'ব্রততত্ত্বে'। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্যন্ত সমস্ত কৃত্যের আলোচনা আছে 'কৃত্যতত্ত্বে', প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি ব্রতও আলোচিত হইয়াছে।

ব্রত কাহাকে বলে ?

একমাত্র শূলপাণিই ব্রতের একটি সংজ্ঞা নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার মতে, ব্রতের মূলে থাকিবে সঙ্কল্প এবং অনুষ্ঠানটি হইবে 'দীর্ঘকালানুপালনীয়'। সঙ্কল্পই যে ব্রতের মূলে আছে, নিজের এই মতের সমর্থনে তিনি 'মনুস্মৃতি'র প্রমাণ[১] উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ব্রতানুষ্ঠান সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মাবলী

পুরাণোক্ত বিধির অনুসরণক্রমে জীমূতবাহন ব্রতপালনকারীর নিম্নলিখিত কর্তব্যগুলি নির্ধারণ করিয়াছেন :—

ক্ষমা, সত্যবাদিতা, দয়া, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দেবপূজা, অগ্নিহবন, সন্তোষ, অস্তেয়[২]।

১ সংকল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সংকল্পসম্ভবাঃ।
ব্রতানিযমধর্মাশ্চ সর্বে সংকল্পজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২।৩

২ এই শব্দটির অর্থ স্পষ্ট নহে। স্তেয় বা চৌর্য সর্বদাই নিন্দনীয় ; সুতরাং, ব্রত পালনকালে ইহার নিষেধ একটু অদ্ভুত মনে হয়।

গৌতমের মতানুসারী শূলপাণি নিম্নলিখিত কর্তব্যগুলিরও বিধান করিয়াছেন :—

অনসূয়া, বিশ্রাম, অস্পৃহা, অকৃপণতা, সৎকার্য।

দেবলের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া রঘুনন্দন মৎস্যমাংস ভক্ষণও নিষেধ করিয়াছেন।

ব্রতের প্রস্তুতির জন্য পূর্বদিন রাত্রিতে উপবাস সর্ববাদিসম্মত।

পূর্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ ব্রতের উপযোগী কাল। মধ্যাহ্নকে বলা হইয়াছে পিত্র্যকাল অর্থাৎ পিতৃকার্যের জন্য প্রশস্ত।

ব্রতানুষ্ঠানে সর্বপ্রথমে করণীয় সূর্য, সোম প্রভৃতি দেবতার আবাহন, তৎপর সঙ্কল্প। সঙ্কল্পের পরে আদিত্যাদির পূজা কর্তব্য। কেহ কেহ, 'মৎস্যপুরাণে'র বচন অনুসারে, ব্রতারম্ভে গণেশের ও নবগ্রহপূজার বিধান করিয়াছেন; কিন্তু, 'পদ্মপুরাণে'র মতানুসারী শূলপাণি এই মতের সমর্থন করেন নাই। ব্রতে বিভিন্ন কৃত্য সম্বন্ধে রঘুনন্দন নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, সমস্ত দেবতার পূর্বে সূর্যপূজাই কর্তব্য মনে হয়। ব্রতশেষে ব্রতিগণ কর্তৃক ব্রতকথা শ্রবণের বিধানও আছে।

ব্রত গ্রহণ করিয়া যদি কেহ অপ্রাপ্তকালে মূর্খতা বা অজ্ঞতাবশতঃ উহা পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সে ইহকালে চণ্ডালতুল্য ও পরকালে পশুবৎ হয়। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত মস্তকমুণ্ডন ও উপবাসত্রয়[১]। এই প্রায়শ্চিত্তের পরে পরিত্যক্ত ব্রতের পুনরনুষ্ঠান বিধেয়। 'প্রমাদ', রোগ ও আচার্যের আদেশ প্রভৃতি কারণে ব্রতাচরণে অক্ষমতা প্রায়শ্চিত্তার্হ নহে। কিন্তু, এই সকল কারণেও ব্রত পুনঃ পুনঃ পরিত্যাগ করিলে ব্রতী প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবে। ব্রত-পরিত্যাগজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তের অধিকাংশ ব্যবস্থা পুরাণসমূহ হইতে নেওয়া হইয়াছে।

মনুর প্রমাণানুসারে বলা হইয়াছে যে, ব্রতারম্ভের পরে ব্রতীর মৃত্যু হইলে ব্রতের উদ্দেশ্য সফলই হয়।

১ তিনদিন উপবাস (?)।

জ্ঞাতিগণের জন্ম- ও মৃত্যু-জনিত অশৌচ ধর্মকার্যের প্রতিবন্ধক হইলেও, ব্রতের আরম্ভ হইলে ইহা কোন বাধার সৃষ্টি করে না। শূলপাণি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, সঙ্কল্পই ব্রতের আরম্ভ[১]।

উপবাস ব্রতে অবশ্যকরণীয় হইলেও, অশক্তপক্ষে নিম্নলিখিত বস্তুভক্ষণে কোন দোষ হয় না :—

জল, ফল, মূল, ঘৃত, দুগ্ধ, আচার্যের অনুমতিক্রমে যে কোন খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধ।

ইহাও বলা হইয়াছে যে, উপবাসে অক্ষম ব্যক্তি যদি রাত্রিতে ভোজন করে, তাহা হইলে তাহার কোন পাপ হয় না।

ঋতুমতী বা অন্তঃসত্ত্বা এবং অন্যপ্রকারে অশুদ্ধা নারী স্বীয় ব্রতের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু, তথাপি যাঁহার ব্রত তিনি উপবাসাদি কায়িক কৃত্য স্বয়ং পালন করিবেন[২]।

ব্রতদিনে নিম্নলিখিত কর্মগুলি বিশেষভাবে বর্জনীয় :—

'পতিতপাষণ্ডিনাস্তিকসম্ভাষা'[৩], অসত্যকথন, অশ্লীল বাক্যপ্রয়োগ, অন্ত্যজের পতিতা নারীর ও রজস্বলা নারীর দর্শন স্পর্শন ও তাহাদের সহিত কথোপকথন, গাত্রে বা মস্তকে তৈলপ্রয়োগ, তাম্বূলভক্ষণ, দন্তধাবন, গাত্রানুলেপন, দিবানিদ্রা, অক্ষক্রীড়া, স্ত্রীসম্ভোগ।

ব্রতানুষ্ঠানে নারীর অধিকার

মনুস্মৃতিতে আছে—

> নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণম্।
> পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥ (৫।১৫৫)

ইহাতে স্পষ্টই যজ্ঞ ও ব্রত প্রভৃতিতে স্ত্রীলোকের অধিকার অস্বীকৃত হইয়াছে; একমাত্র পতিশুশ্রূষাই তাঁহাদের পরম কর্ম ও চরম গতির সহায়ক।

১ ব্রতস্যারম্ভঃ সঙ্কল্প এব—ব্রতকালবিবেক, পৃঃ ৯।

২ কায়িকং চোপবাসাদিকং সদা শুদ্ধয়াশুদ্ধয়া বা স্বয়ং ক্রিয়তে—ব্রতভত্ত্ব (স্মৃতিতত্ত্ব, ২, পৃঃ ১২৫)।

৩ হিন্দুধর্মে অবিশ্বাসী ব্যক্তি, বিশেষতঃ বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি পাষণ্ডী।

বৈদিক যুগে ধর্মাচরণে স্ত্রীলোকের যে অধিকার দেখা যায়, তাহা পুরুষশাসিত সমাজে ক্রমশঃ খর্ব হইতে হইতে মনুস্মৃতির যুগে একেবারেই লুপ্ত হইয়াছিল। আমরা পূর্ব-আলোচনা হইতে দেখিয়াছি যে, বাংলাদেশের স্মৃতিনিবন্ধোক্ত ব্রতগুলি বহুলাংশে পুরাণ-প্রভাবিত। প্রকৃত প্রস্তাবে, অধিকাংশ ব্রতই পুরাণের যুগে সৃষ্ট হইয়াছিল। এই ব্রতসৃষ্টির মূলে ছিল তাৎকালিক সামাজিক পরিস্থিতিজনিত ব্রাহ্মণগণের আর্থিক দুর্গতি। স্বীয় আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পেই বোধহয় ব্রাহ্মণগণ অসংখ্য ব্রতের ও ব্রতে নানা দ্রব্য দানের বিধান করিয়াছিলেন[১]। পরবর্তী স্মৃতিকারগণ কিন্তু একটি অদ্ভুত অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। পুরাণ-প্রভাবিত সমাজে যে ব্রতসমূহ বদ্ধমূল হইয়াছিল, সেই ব্রতাবলীকে তাঁহারা স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। আবার, প্রাচীন স্মৃতি-শাস্ত্রের বিধিনিষেধও তাঁহাদের কাছে ছিল অলঙ্ঘনীয়। এইরূপ অবস্থায়, সম্ভবতঃ পুরাণ ও স্মৃতির মধ্যে একটা আপোষ করিবার জন্যই, বঙ্গীয় নিবন্ধকার উল্লিখিত মনুর বচনের একটি অভিনব অর্থ আবিষ্কার করিলেন। তিনি বলিলেন যে, সাধারণতঃ যজ্ঞ ও ব্রতাদিতে নারীর অধিকার না থাকিলেও, তিনি পতির অনুমতিক্রমে ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধে প্রধান প্রধান ব্রত

বাংলাদেশের স্মৃতিগ্রন্থগুলিতে যে সমস্ত ব্রতের উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্রতগুলি প্রধান :—

(ক) জীমূতবাহন ও শূলপাণির গ্রন্থে—নক্তব্রত, জন্মাষ্টমী, বুধাষ্টমী, মনসা, একাদশী, অনন্তচতুর্দশী।

(খ) শুধু জীমূতবাহনের গ্রন্থে—চাতুর্মাস্য ও মনোরথদ্বিতীয়া।

১। তৃতীয়াতে কর্তব্য—অক্ষয়তৃতীয়া, মাঘতৃতীয়া ও চৈত্রতৃতীয়া।

২। পঞ্চমীতে করণীয়—নাগপঞ্চমী।

১ এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আর. সি. হাজরা-রচিত Studies in Puranic Records ইত্যাদি গ্রন্থ, পৃঃ ২৪৩-২৫৯ এবং বর্তমান গ্রন্থকারের প্রবন্ধ—Puranic basis of the Bengal Smarta Vratas (Siddhabharati, 1950)

৩। সপ্তমীতে বিহিত—বিজয়া, জয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা, মহাজয়া, নন্দা, ভদ্রা, মহাপুণ্য, রথ ও অনোদন।

৪। অষ্টমীতে কর্তব্য—মহারুদ্র ও জয়ন্তী।

৫। একাদশীতে করণীয়—বিজয়া ও পাপনাশিনী।

৬। দ্বাদশীতে বিহিত—শ্রবণা, বিজয়া, তিল ও গোবিন্দ।

৭। চতুর্দশীতে করণীয়—দমনভঞ্জী, পাষাণ ও দুর্গা।

(গ) শুধু শূলপাণির গ্রন্থে—রম্ভাতৃতীয়া, আরোগ্যসপ্তমী, বিধানসপ্তমী, ললিতাসপ্তমী, দূর্বাষ্টমী, রামনবমী, পিপীতকী, দ্বাদশী, সাবিত্রীচতুর্দশী, শিবরাত্রি ও কার্তিকেয়।

(ঘ) গোবিন্দানন্দের গ্রন্থে—অক্ষয়তৃতীয়া, অঙ্গারকচতুর্থী, অনন্ত, অশূন্যশয়নদ্বিতীয়া, আরোগ্যসপ্তমী, কুক্কুটিমর্কটি, পঞ্চমী, পিপীতকী, প্রেতচতুর্দশী, বারব্রত, বিনায়কচতুর্থী, শিবরাত্রি ও সাবিত্রী।

(ঙ) রঘুনন্দনের গ্রন্থে—ইনি 'ব্রততত্ত্বে' বিশেষ কোন ব্রতের আলোচনা করেন নাই; সাধারণভাবে ব্রতানুষ্ঠানের বিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। 'কৃত্যতত্ত্বে' তিনি নিম্নলিখিত ব্রতগুলির আলোচনা করিয়াছেন :—

একাদশী, চাতুর্মাস্য, অনন্ত, বিধানসপ্তমী, আরোগ্যসপ্তমী, শিবরাত্রি, রামনবমী।

বাংলাদেশে অদ্যাবধি ব্যাপকভাবে প্রচলিত কয়েকটি ব্রতের স্মৃতিনিবন্ধোক্ত বিধিনিষেধ সংক্ষেপে দেওয়া গেল।

একাদশী

প্রত্যেক পক্ষের একাদশী তিথিতে উপবাস গৃহস্থের করণীয়। পুত্রবান্ গৃহী কৃষ্ণপক্ষে এই উপবাস করিবেন না; এই নিষেধ অবশ্য শয়ন-একাদশীতে প্রযোজ্য নহে। যে গৃহীর পুত্র বৈষ্ণব, তিনি সকল কৃষ্ণপক্ষেই উপবাস করিতে পারেন। একাদশীর উপবাস সম্বন্ধে নিষেধ বিধবার পক্ষে প্রযোজ্য নহে।

অষ্টম বর্ষের ঊর্ধ্বে ও অশীতিতম বর্ষের নিম্নে যাহাদের বয়স, তাহাদের উপবাস অবশ্যকরণীয়।

দশমী ও একাদশী তিথি একই দিনে হইলে, এবং তাহার পরের দিন একাদশী ও দ্বাদশী তিথি থাকিলে, পরের দিনেই, একাদশী ছাড়িয়া গেলেও, উপবাস বিধেয়।

একাদশীতে নিরম্বু উপবাসই কর্তব্য। কিন্তু, অশক্তপক্ষে রাত্রিতে নিম্নলিখিত দ্রব্যের মধ্যে যে-কোন একটি ভক্ষণীয় :—

হবিষ্যান্ন[১], ফল, তিল, দুগ্ধ, জল, ঘৃত, পঞ্চগব্য[২]। এই তালিকায় পূর্ব পূর্ব দ্রব্য অপেক্ষা পর পর বস্তু প্রশস্ততর।

চাতুর্মাস্যব্রত

আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা, শুক্লা একাদশী, দ্বাদশী বা কর্কটসংক্রান্তিতে এই ব্রতগ্রহণ কর্তব্য[৩]। এই ব্রতকালে বর্জনীয়—গাত্রে তৈলমর্দন, স্ত্রীসম্ভোগ, মধুমাংসাহার, স্থালীপক-আহার্যভক্ষণ, নখ-কেশ ছেদন। এই ব্রতানুষ্ঠান-কারীর কর্তব্য—নিত্য গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণভোজন, কার্ত্তিক মাসে গোদান।

শিবরাত্রি

মাঘমাসের অন্তে বা ফাল্গুনের আদিতে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে শিবরাত্রির উপবাস করণীয়। পরের দিন পারণ কর্তব্য।

এই দেশের স্মৃতিনিবন্ধসমূহে যে সমস্ত পূজার আলোচনা আছে, তাহাদের মধ্যে দুর্গাপূজাই প্রধান এবং অদ্যাবধি ইহাই বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা

১ সাধারণতঃ এই শব্দে নিরামিষ আহার বা আতপান্ন বুঝায়। প্রকৃত অর্থের জন্য দ্রষ্টব্য 'কৃত্যতত্ত্ব' (স্মৃতিতত্ত্ব, ২, পৃঃ ৪৪৯)।

২ দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্রের সংমিশ্রণ।

৩ চাতুর্মাসিকব্রতগ্রহণে কালচতুষ্টয়ম্। আষাঢী পৌর্ণমাসী শুক্লা একাদশী দ্বাদশী কর্কটসংক্রান্তিশ্চেতি—কালবিবেক, পৃঃ ৩৩২।

জনপ্রিয় পূজা। সুতরাং, এই পূজা সংক্রান্ত যে আচার অনুষ্ঠানের আলোচনা বঙ্গীয় নিবন্ধগ্রন্থগুলিতে আছে, তাহাদের মোটামুটি বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

বাংলাদেশ ভিন্ন ভারতের কোন কোন স্থানে এই পূজাকে 'নবরাত্রব্রত' বলা হইয়া থাকে। এই পূজা বসন্তকালে হইলে ইহাকে বলা হয় বাসন্তীপূজা, আর শরৎকালে হইলে বলা হয় শারদীয়া পূজা। কিন্তু, সাধারণতঃ দুর্গোৎসব বলিতে শারদীয়া পূজাকেই বুঝায়।

দুর্গাপূজাবিষয়ক গ্রন্থাবলী

ব্রত ও পূজা বিষয়ক গ্রন্থগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; যথা—প্রমাণ ও প্রয়োগ। কোন কোন গ্রন্থে আবার এই দুইটি বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। প্রমাণাংশে একটি বিষয় সম্বন্ধে নানা প্রামাণ্য রচনাদি উদ্ধৃত হয় এবং লেখকের নিজস্ব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হয়। প্রয়োগাংশে অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি বিষয় আলোচিত হয়। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা প্রমাণাংশেরই প্রধান প্রধান বিষয়গুলি আলোচনা করিব। বাসন্তীপূজার ব্যাপক প্রচলন অধুনা নাই বলিয়া ইহা বর্তমানে আমাদের আলোচ্য নহে।

দুর্গাপূজাবিষয়ক প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রধান:—

(১) জীমূতবাহনের 'কালবিবেক',
(২) শূলপাণির 'দুর্গোৎসববিবেক',
(৩) শ্রীনাথ আচার্যচূড়ামণির 'দুর্গোৎসববিবেক'[১],
(৪) রঘুনন্দনের 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব'[২],
(৫) রঘুনন্দনের 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব'[৩],
(৬) রঘুনন্দনের 'কৃত্যতত্ত্ব'[৪]।

১ কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত।
২ 'তিথিতত্ত্বে'র অন্তর্গত।
৩ ঐ।
৪ স্মৃতিতত্ত্ব, ২, পৃঃ ৪২৩-৪৮৩।

'কালবিবেক' গ্রন্থে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপযোগী কালের আলোচনা প্রসঙ্গে দুর্গোৎসবও আলোচিত হইয়াছে।

রঘুনন্দনের শেষোক্ত গ্রন্থটি ভিন্ন অপর দুইটি গ্রন্থ প্রক্ষিপ্ত কি স্বরচিত সেই বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন। এই আলোচনায় আমাদের দুইটি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়; যথা—

১। গ্রন্থ দুইটির মধ্যে একটি অপরটি হইতে পৃথক্ কিনা?

২। 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব' আদৌ রঘুনন্দন-প্রণীত কিনা?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, দুইটি গ্রন্থের আদিশ্লোক ভিন্ন ভিন্ন। অধিকন্তু, বিষয়বস্তুর আলোচনাতেও দুই গ্রন্থে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। সুতরাং, গ্রন্থ দুইটি যে স্বতন্ত্র, এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা যায় না।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি খুব সহজ নহে। 'মলমাস-তত্ত্বে'র প্রারম্ভিক একটি শ্লোকে রঘুনন্দন কর্তৃক আলোচিত বিষয়গুলির নামকরণ প্রসঙ্গে দুর্গোৎসবের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে, 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব' নামক রঘুনন্দনের একটি গ্রন্থ ছিল, এ কথা বুঝা যায়, কিন্তু, 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব' নামটি প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না।

রঘুনন্দনের 'তিথিতত্ত্ব' নামক গ্রন্থের একটি অংশে দুর্গোৎসবের আলোচনা আছে। কিন্তু, ইহা একটু অদ্ভুত মনে হয় যে, দুর্গোৎসব অংশের প্রারম্ভে একটি স্বতন্ত্র প্রারম্ভিক শ্লোক রহিয়াছে। মনে হয়, গ্রন্থকার দুর্গোৎসব সম্বন্ধে একটি পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করিয়া উহাকে 'তিথিতত্ত্বে'র সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, অথবা, পরবর্তী কোন ব্যক্তি রঘুনন্দনরচিত দুই গ্রন্থই একত্র জুড়িয়া দিয়াছিলেন। গ্রন্থটির প্রকৃত নাম কি ছিল, তাহাও বলা কঠিন। পুষ্পিকায় ইহাকে 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব'[১] বলা হইয়াছে। আবার, 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব' নামক গ্রন্থের এক স্থানে 'দুর্গাপূজাতত্ত্বে'র উল্লেখ আছে।[২]

'দুর্গাপূজাতত্ত্ব' গ্রন্থটির দুইটি ভাগ—(১) দুর্গাপূজা-প্রমাণতত্ত্ব ও (২) দুর্গাপূজা-প্রয়োগতত্ত্ব। দ্বিতীয় ভাগটি 'স্মৃতিতত্ত্বে'র (২য় খণ্ড) অন্তর্ভুক্ত 'দুর্গার্চনপদ্ধতি'র সহিত অভিন্ন।

১ দ্রঃ—স্মৃতিতত্ত্ব, ১, পৃঃ ১০৪।

২ স্মৃতিতত্ত্ব, ১, পৃঃ ৯৩।

উক্ত আলোচনা হইতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় :—

১। 'তিথিতত্ত্বোক্ত' দুর্গোৎসব বিষয়ক অংশ হইতে 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব'[১] সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ[২], 'তিথিতত্ত্বে'র দুর্গোৎসব অংশ ক্রমক্রমে 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব' নামে অভিহিত হইয়াছে।

২। 'মলমাসতত্ত্বে'র আদিশ্লোকে যে অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ আছে, তাহা হইতে একথা মনে করা সমীচীন নহে যে, রঘুনন্দন ঐ অষ্টাবিংশতি বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন নাই ; কারণ, অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব-বহির্ভূত অনেক গ্রন্থই বর্তমানে রঘুনন্দনের নামাঙ্কিত অবস্থায় পাওয়া যাইতেছে[৩]।

৩। 'স্মৃতিতত্ত্বে'র দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত 'দুর্গার্চনপদ্ধতি' 'দুর্গাপূজাতত্ত্বে'র একটি অংশমাত্র।

রঘুনন্দনের 'কৃত্যতত্ত্বে' দুর্গাপূজা সম্বন্ধে অতি সামান্য কথাই বলা হইয়াছে।

দুর্গাপূজা নিত্যা কি কাম্যা ?

এই সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকগণের সিদ্ধান্ত প্রায় একরূপ। এই পূজা নিত্যা ; কারণ, ইহার অকরণে প্রত্যবায়ের উল্লেখ আছে। 'কালিকাপুরাণে'র নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক এই বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ :—

যো মোহাদথবালস্যাদ্দেবীং দুর্গাং মহোৎসবে।
ন পূজয়তি……
ক্রুদ্ধা ভগবতী তস্য কামানিষ্টান্ নিহন্তি বৈ ॥

১ এই গ্রন্থের প্রারম্ভিক শ্লোকস্থ 'শরদর্চাবিধি' শব্দটি হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে, গ্রন্থটিরই এই নাম ছিল। কিন্তু, এই শব্দে বোধ হয় গ্রন্থের নামকে না বুঝাইয়া উহার বিষয়বস্তুকেই বুঝাইয়াছে ; কারণ, প্রমাণ ও প্রয়োগ এই উভয় অংশের পুষ্পিকাতেই 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব' নামটি আছে।

২ 'দুর্গাপূজাতত্ত্বে'র নিম্নোদ্ধৃত প্রারম্ভিক শ্লোকটি হইতেও ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় :—

ব্যবস্থায়াঃ প্রপঞ্চস্তু বিজ্ঞেয়স্তিথিতত্ত্বতঃ।
পূজাবিধেশ্চ সম্যক্ত্বং জ্ঞাতব্যং কোবিদৈরিহ ॥

৩ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রঘুনন্দন-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

উক্ত পুরাণেই আবার বলা হইয়াছে যে, দুর্গাপূজাদ্বারা নানা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে[১]। শূলপাণি ও রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে, 'প্রসঙ্গ'[২] দ্বারা নিত্যপূজা কাম্যপূজারই অন্তর্গত[৩]।

পূজার স্থান

শূলপাণিকর্তৃক উদ্ধৃত 'মৎস্যসূক্তে'র বচন অনুযায়ী নিম্নলিখিত স্থানগুলি দুর্গাপূজার অযোগ্য :—

১। স্ব-গৃহ—ইহার অর্থ, বোধ হয়, নিজের বাসের ঘর, বাড়ী নহে কারণ, দুর্গাপূজা নিজ বাড়ীতেই হইয়া থাকে।

২। জীর্ণ স্থান।

৩। ইষ্টকারচিত স্থান—শূলপাণির মতে, ঈদৃশ স্থানে মৃত্তিকাবেদির উপরে পূজা হইতে পারে[৪]।

৪। দীপস্থিতিবিবর্জিত স্থান—বর্তমান কালেও পূজামণ্ডপে সর্বদাই একটি প্রজ্বলিত দীপ রাখা হয়।

দুর্গামূর্তির রূপ ও উপাদান

শূলপাণি কর্তৃক উদ্ধৃত 'কালিকাপুরাণে'র মতে, দুর্গার মূর্তি হইবে দশভুজা ও সিংহোপরি স্থাপিতা। মৃত্তিকা ছাড়া, অন্য উপাদানেও যে মূর্তি নির্মিত হইত, তাহা শূলপাণির নিম্নোদ্ধৃত উক্তি দুইটি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় :—

দর্পণ ইতি মৃন্ময়প্রতিমাপক্ষে[৫]।

দেবানাং প্রতিমা যত্র গৃহীতাভ্যঙ্গক্ষমা[৬]।

অর্থাৎ, প্রতিমা মৃন্ময়ী হইলে দেবীর স্নান দর্পণে করাইতে হইবে, আর মূর্তি স্নানযোগ্য হইলে দেবীকে ঐ মূর্তিতেই স্নান করাইতে হইবে।

১ স্মৃতিতত্ত্বে (১, পৃঃ ৬৫) উদ্ধৃত "কৃষৈব…চতুর্বর্গপ্রদায়িকাম্" ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

২ এই শব্দের পারিভাষিক অর্থের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

৩ (১) কাম্য…প্রসঙ্গান্নিত্যপূজাসিদ্ধি :—দুর্গোৎসববিবেক, পৃঃ ২।
(২) কাম্যতয়া…প্রসঙ্গান্নিত্যাসিদ্ধি :—স্মৃতিতত্ত্ব, ১, পৃঃ ৬৬

৪ ইষ্টকারচিতেঽপি গৃহে মৃত্তিকাবেদিকোপরি পূজনমিতি শিষ্টাচারঃ—দুর্গোৎসববিবেক, পৃঃ ১১।

৫ দুর্গোৎসববিবেক, পৃঃ ১৪।

৬ ঐ।

শারদীয়া পূজা

শরৎকালে হয় বলিয়াই এই পূজার অপর নাম শারদীয়া পূজা। বসন্তকালই এই পূজার সময়, শরৎকাল এই পূজার প্রকৃত সময় নহে; কারণ, শরৎকাল দক্ষিণায়নে পড়ে। দক্ষিণায়নে দেব-দেবীগণ সুপ্ত থাকেন বলিয়া শাস্ত্রকারগণের বিশ্বাস। এই জন্যই শারদীয়া পূজাতে দেবীর বোধন বা তাঁহাকে জাগরিত করিবার ব্যবস্থা আছে। শরৎকালে দেবীকে জাগরিতা করা হয় বলিয়াই তাঁহার এক নাম শারদা[১]। শূলপাণির মতে, 'সারদা' শব্দটি কাল্পনিকভাবে ব্যুৎপন্ন[২]। কিম্বদন্তী এই যে, দাশরথি রাম শত্রুনিধনের উদ্দেশ্যে দেবীর এই অকাল-পূজার প্রবর্তন করেন। কিন্তু, ইহার কোন ভিত্তি মূল রামায়ণে নাই, বাংলার স্মৃতিনিবন্ধসমূহেও ইহার কোন সমর্থন দেখা যায় না।

দুর্গাপূজার সুফল

দুর্গাপূজার অনেক সুফলেরই উল্লেখ আছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান —পূজাস্থানে দুর্ভিক্ষ ও অন্য প্রকার দুঃখদুর্দশার অভাব, অকালমৃত্যু লোপ, দারপুত্র ও ধনসম্পত্তি বিষয়ে সুখ, ইহলোকে বহু সুখভোগ ও পরলোকে দুর্গালোকে বাস, সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ।

দুর্গাপূজার প্রকারভেদ

সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসীভেদে দুর্গাপূজা ত্রিবিধ। সাত্ত্বিকী পূজাতে থাকিবে জপ, যজ্ঞ এবং নিরামিষ পূজোপকরণ। রাজসী পূজাতে পশুবলি হইবে এবং পূজোপকরণ হইবে আমিষ। তামসী পূজার ব্যবস্থা কিরাতগণের জন্য। এইরূপ পূজায় জপ, যজ্ঞ বা মন্ত্র নাই এবং পূজোপকরণ মদ্য, মাংস প্রভৃতি।

১ এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, কোন কোন স্থলে শরৎকালকে 'অম্বিকা' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য—বাজসনেয়িসংহিতার (৩।৫৭) উপরে মহীধরের ভাষ্য। দেবীকেও অম্বিকা নামে অভিহিত করা হয়।

২ সারং দদাতীতি ব্যুৎপত্তিস্তু কাল্পনিকী—দুর্গোৎসববিবেক, পৃঃ ৬।

'কালিকাপুরাণে'র প্রমাণানুসারে শূলপাণি একটি সংক্ষিপ্ত পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে মাত্র পাঁচটি দ্রব্যের দ্বারা পূজা করা হয়; যথা—পুষ্প, চন্দন, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য। প্রতিকূল আর্থিক অবস্থাদিহেতু যে বহু দ্রব্যাদি দ্বারা পূজা করিতে অক্ষম, তাহার পক্ষে শুধু ফুল জল অথবা কেবলমাত্র জলের দ্বারা পূজারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

দুর্গাপূজার অধিকারী

চতুর্বর্ণেরই এই পূজায় অধিকার আছে। কিন্তু, সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, সাধারণতঃ হিন্দুর পূজাপার্বণে বর্ণাশ্রমবহির্ভূত ম্লেচ্ছগণের অধিকার না থাকিলেও, দুর্গাপূজায় তাহাদিগকে অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

অশক্তপক্ষে প্রতিনিধির সাহায্যে দুর্গাপূজা করাইবার ব্যবস্থা আছে।

দুর্গাপূজাসংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান

এই পূজা প্রসঙ্গে বহু আচার-অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি বিষয়ের মোটামুটি আলোচনা করা যাইতেছে।

স্নপন, পূজন, বলিদান ও হোম—এই চারিটি দুর্গাপূজার প্রধান অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

জ্ঞাতিগণের জন্ম অথবা মৃত্যুজনিত অশৌচ সাধারণতঃ ধর্মকার্যের প্রতিবন্ধক হইলেও, দুর্গাপূজা একবার আরব্ধ হইলে, উহা কোন বাধা জন্মায় না। ব্রতের ন্যায় এই পূজারও সঙ্কল্পগ্রহণেই আরম্ভ হয়।

বহু দ্রব্যের দ্বারা দেবীর স্নান বিধেয়। প্রধান দ্রব্যগুলি এইরূপ :—

দধি,	পঞ্চগব্য,	পুষ্প,
মধু,	পঞ্চকষায়[১],	পঞ্চরত্ন[২],
তৈল,	ওষধি,	চন্দনাদি সুগন্ধিদ্রব্য,
ঘৃত,	ভৃঙ্গার,	উষ্ণজল,
দুগ্ধ,	কলস,	পঞ্চামৃত[৩]।

১ জম্বু, শাল্মলী, বাট্যাল, বদর ও বকুল প্রভৃতি বৃক্ষের রস।
২ স্বর্ণ, হীরক, মণি, মুক্তা ও প্রবাল।
৩ দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, শর্করা ও মধুর সংমিশ্রণ।

অষ্টমী পূজার দিনে নানা অলঙ্কারের দ্বারা কুমারীপূজার ব্যবস্থা আছে।

অষ্টমীর শেষ দণ্ড ও নবমীর প্রথম দণ্ডের মধ্যে সন্ধিপূজা কর্তব্য।

পশুপক্ষিবলি দুর্গাপূজার একটি প্রধান অঙ্গ। অষ্টমীতিথিতে পশুবলির বিশেষ বিধান আছে। 'দেবীপুরাণে' অষ্টমীতিথিতে পশুবলির যে নিষেধ আছে, বঙ্গীয় স্মার্তগণের মতে তাহার তাৎপর্য এই যে, সন্ধিপূজার অষ্টমী অংশে বলিদান নিষিদ্ধ[১]। বলিদানের পরে পশুর 'শীর্ষ' ও 'রুধির' দেবীকে দানের ব্যবস্থা আছে। মহিষবলি হইলে মহিষের সমাংস রুধির দেবীকে দান করিতে শূলপাণি 'ভবিষ্যপুরাণে'র অনুসরণ ক্রমে নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু, শ্রীকরের প্রমাণ অনুযায়ী তিনি শুধু রুধির দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দেবীর নিকট বলিদানের জন্য নিম্নলিখিত পশু ও পক্ষী নিষিদ্ধ :—

> তিন মাসের ন্যূনবয়স্ক, তিন পক্ষের ন্যূনবয়স্ক পক্ষী[২], যে সমস্ত পশুর লাঙ্গুল, কর্ণ ও শৃঙ্গ প্রভৃতি ভগ্ন, স্ত্রীপশু, 'নানাবর্ণ' পশু, অতিবৃদ্ধ, রোগার্ত বা পূযস্রাবী ক্ষতযুক্ত পশু।

ছাগ, মেষ ও মহিষ বলির জন্য প্রশস্ত বলা হইয়াছে। কোন কোন প্রকার হরিণ, শূকর, খড়্গী অর্থাৎ গণ্ডার, গোধিকা বা গোসাপ, হরি[৩], ব্যাঘ্র, কচ্ছপ, মানুষ[৪] প্রভৃতিও বলিদানের জন্য বিহিত হইয়াছে। কুষ্মাণ্ড এবং ইক্ষুবলি নাকি ছাগবলির ন্যায় দেবীর প্রীতিকর।

নানা শাস্ত্রকারের, বিশেষতঃ মনুর[৫], প্রমাণ অনুসারে বঙ্গীয় স্মার্তেরা

১ যত্তু...ইতি দেবীপুরাণীয়ং তদষ্টমীক্ষণে সন্ধিপূজা-বলিদাননিষেধকমিতি।—দুর্গোৎসব-বিবেক।

২ আধুনিক যুগে বাংলাদেশে দুর্গাপূজায় পক্ষিবলির প্রচলন নাই।

৩ 'নামলিঙ্গানুশাসন' অনুসারে এই শব্দে নানা পশু-পক্ষীকেই বুঝাইতে পারে। এখানে ঠিক কোন্‌টিকে বুঝান হইয়াছে তাহা বলা কঠিন।

৪ 'শার্দূলশ্চ নরশ্চৈব' ইত্যাদি 'ভবিষ্যপুরাণী'য় শ্লোক 'দুর্গোৎসববিবেক'-এ (পৃঃ ১৯) উদ্ধৃত হইয়াছে।

৫ ৫।৩৯।

প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, পশুবলি সাধারণতঃ গর্হিত হইলেও দুর্গাপূজা প্রভৃতি উপলক্ষ্যে ইহা পাপজনক নহে।

দশমীকৃত্য—শবরোৎসব

দশমী তিথিতে 'শবরোৎসব' নামে একটি অনুষ্ঠানের বিধি বঙ্গদেশীয় স্মৃতিনিবন্ধসমূহে দেখা যায়। ইহাতে 'ভগলিঙ্গাভিধান' দ্বারা একে অপরকে গালাগালি করিবে; যে এইরূপে অপরকে গালাগালি করে না বা যাহাকে অপরে গালাগালি করে না, তাহারা উভয়েই দেবীর বিরাগ-ভাজন হইয়া থাকে। 'শবরোৎসব' শব্দটির তাৎপর্য বুঝাইতে গিয়া জীমূতবাহন বলিয়াছেন যে, ইহাতে শবরের ন্যায় সমস্ত শরীর পত্রাদি দ্বারা আবৃত ও কর্দমাক্ত করিয়া নৃত্য, গীত ও বাদ্য প্রভৃতি করিতে হয় বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে[১]।

দেবীর বিসর্জনের পরে, খঞ্জনপক্ষীর দর্শন অতীব শুভজনক বলিয়া কথিত হইয়াছে। পদ্ম, ধেনু, হস্তী, অশ্ব, বৃহদাকার সর্প, শাদ্বলতৃণ, মিষ্ট ফলের বৃক্ষ, সুগন্ধিপুষ্প বৃক্ষ, জলাশয়, রাজপ্রাসাদ, উদ্যান, অট্টালিকা, দধিভাণ্ড, ধান্যস্তূপ প্রভৃতিতে খঞ্জনদর্শন শুভ। কলসীতে জলপানরত এবং সূর্যোদয়ে আকাশ হইতে পৃথিবীর প্রতি উড্ডীয়মান খঞ্জনের দর্শনও মঙ্গলজনক। কিন্তু, ভস্মস্তূপ, অস্থি, কেশ, নখ, মহিষ, উষ্ট্র, গর্দভ, শ্মশান, গৃহকোণ, শর্করাস্তূপ, প্রাচীর প্রভৃতিতে স্থিত খঞ্জনের দর্শন অশুভাবহ। দিগ্‌ভেদেও খঞ্জনদর্শনের ফলাফল বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে[২]। শুভ ও অশুভসূচক এই দুইপ্রকার খঞ্জনের কথাই বলা হইয়াছে[৩]। জীমূতবাহন বলেন যে, খঞ্জনদর্শনজনিত মঙ্গল একবৎসরকাল স্থায়ী এবং খঞ্জনদর্শনজনিত অমঙ্গল দূর করিবার জন্য যথাবিধি অনুষ্ঠান কর্তব্য[৪]।

১ শবরবর্ণইব……ইতি শবরপদার্থঃ—কালবিবেক, পৃঃ ৫১৪।
২ দ্রঃ—দুর্গোৎসববিবেক, পৃঃ ২৬।
৩ দ্রঃ—কালবিবেক, পৃঃ ৫১৭-৫১৮।
৪ দ্রঃ—কালবিবেক, পৃঃ ৫২০।

শত্রুবলি

আজকাল বাংলাদেশের দুর্গাপূজায় শত্রুবলির ব্যবস্থা দেখা যায়। সাধারণতঃ মানকচুর পত্রাবৃত একটি পুত্তলিকাকে বলি দেওয়া হয়। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, ইহাদ্বারা একবৎসর কালের জন্য নিঃশত্রু থাকা যায়। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 'কালিকাপুরাণ'[১], 'দেবীপুরাণ'[২], মহাভাগবত'[৩], 'সংবৎসরপ্রদীপ'[৪] প্রভৃতি গ্রন্থে এই প্রথার উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও পূর্বোক্ত নিবন্ধগুলিতে ইহার কোন উল্লেখই নাই। বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য নামক জনৈক অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি কর্তৃক রচিত 'দুর্গাপূজাপদ্ধতি'[৫] নামক নিবন্ধে এই প্রথার উল্লেখ হইতে মনে হয় যে, ইহার প্রচলন কখনও বন্ধ হয় নাই।

দুর্গোৎসবে অনার্য প্রভাব

অন্যান্য পূজায় ম্লেচ্ছদের অধিকার না থাকিলেও, দুর্গোৎসবে তাহাদের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। শবরোৎসব দুর্গোৎসবের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ব্যাঘ্র, গণ্ডার প্রভৃতি হিংস্র ও বন্য পশুর বলিদানের ব্যবস্থা এই পূজায় আছে। এই সমস্ত লক্ষ্য করিলে দুর্গোৎসবে অনার্যপ্রভাব সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। অনার্য-অধ্যুষিত বঙ্গদেশের আর্যীকরণের পরে অনার্যগণের কতক রীতিনীতি আর্যসমাজে গৃহীত হওয়া কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে। শুধু বাংলাদেশ কেন, সমগ্র উত্তর ভারতই ত এককালে অনার্যগণের বাসস্থান ছিল। এই পূজার কতক অনুষ্ঠান যে তাহাদের নিকট হইতেই আর্যগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার একটি প্রমাণ এই যে, 'হরিবংশে'[৬] শবর, বর্বর ও পুলিন্দ প্রভৃতি আদিম অধিবাসিগণ কর্তৃক বিন্ধ্যপর্বতে কাত্যায়নী ও কৌশিকীর পূজার উল্লেখ আছে; কাত্যায়নী ও কৌশিকী দুর্গারই নামান্তর মাত্র।

১ বেঙ্কটেশ্বর প্রেস্ সংস্করণ, ৬১।১৭৭ ইত্যাদি।
২ বঙ্গবাসী সং. ২২।১৬।
৩ বেঙ্কটেশ্বর প্রেস সং, ৪৫।৩৩।
৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি—সংখ্যা ৪৬৩২, পত্রসংখ্যা—২৫ বি।
৫ ঐ, সংখ্যা ২২৫৮, পত্রসংখ্যা ৪৬বি—৪৭ বি।
৬ বিষ্ণুপর্ব, ৩।৭-৮ (বঙ্গবাসী সংস্করণ)।

(খ) প্রায়শ্চিত্ত

প্রাচীন কাল হইতেই জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত হিন্দুর জীবন শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং, ঐ বিধিনিষেধের লঙ্ঘনজনিত প্রায়শ্চিত্তের বিধানও অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। মানবচরিত্রের বভিন্নতা ও বৈচিত্র্যবশতঃ অপরাধেরও বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে। ফলে, শাস্ত্রকারগণকেও বিবিধ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। মূলতঃ প্রাচীন স্মৃতিব অনুসরণে বঙ্গীয় নিবন্ধকারগণও নানাবিধ পাপের উল্লেখ ও তাহাদের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থের পরিসরে প্রায়শ্চিত্ত সংক্রান্ত সমস্ত বিধিনিষেধ বিশদভাবে আলোচনার অবকাশ নাই। অতএব, এখানে প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে মোটামুটি বিষয়গুলির আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রায়শ্চিত্ত-বিষয়ক গ্রন্থসমূহ

প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিবন্ধগুলি প্রধান :—

(কালানুক্রমে লিখিত)

১। ভবদেবের 'প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ (বা,-নিরূপণ)',

২। শূলপাণির 'প্রায়শ্চিত্তবিবেক',

৩। রঘুনন্দনের 'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব'[১]।

ভবদেবের গ্রন্থে প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা আছে। শূলপাণি বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। রঘুনন্দনের গ্রন্থারম্ভে তাঁহার স্বীয় উক্তি[২] হইতেই বুঝা যায় যে, তাঁহার নিবন্ধটিতে প্রায়শ্চিত্তের আলোচনা সুচারুরূপে করা হয় নাই। নিজের গ্রন্থটি যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে, এ কথা অকপটেই তিনি স্বীকার করিয়াছেন[৩]।

১ ইহার বহু সংস্করণ আছে। বর্তমান প্রসঙ্গে হৃষীকেশ শাস্ত্রী সম্পাদিত (কলিকাতা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

২ পৃঃ ২-৫।

৩ প্রায়শ্চিত্তবিবেকাদাবন্যজ্জ্ঞেয়ং বিচক্ষণৈঃ—প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, পৃঃ ৫। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই বিষয়ে স্মার্ত ভট্টাচার্য শূলপাণির গ্রন্থকে অতিপ্রামাণ্য বলিয়া মনে করিতেন।

প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে আলোচ্য বিষয়

প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গে নিবন্ধসমূহে বহু বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। আমরা নিম্নলিখিত রূপে এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিব :—

(১) প্রায়শ্চিত্ত বলিতে কি বুঝায় ?

(২) পাপ কি ?

(৩) পাপের শ্রেণীবিভাগ।

(৪) প্রধান প্রধান পাপ এবং তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে মোটামুটি নিয়ম।

(৫) দ্রব্যশুদ্ধি।

(৬) প্রধান প্রধান প্রায়শ্চিত্ত।

প্রায়শ্চিত্ত বলিতে কি বুঝায় ?

উক্ত নিবন্ধকারগণের মধ্যে শূলপাণিই সর্বপ্রথম 'প্রায়শ্চিত্ত' শব্দের একটি স্পষ্ট অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন। অঙ্গিরস্-এর প্রমাণ অনুসারে তিনি বলিয়াছেন, 'প্রায়' শব্দের অর্থ তপ ও 'চিত্ত' বলিতে বুঝায় নিশ্চয়। সুতরাং, 'প্রায়শ্চিত্ত' শব্দের অর্থ—এমন তপশ্চর্যা যাহাদ্বারা পাপক্ষালন হইবে বলিয়া নিশ্চিতভাবে জানা যায়[১]।

শূলপাণিধৃত হারীতের মতে, সেই কৃচ্ছ্রসাধনেরই নাম প্রায়শ্চিত্ত যাহা সঞ্চিত অমঙ্গল ধ্বংস করে[২]।

উল্লিখিত প্রমাণাদি হইতে শূলপাণি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রায়শ্চিত্ত 'পাপক্ষয়মাত্রসাধনম্'; অর্থাৎ, প্রায়শ্চিত্ত কেবল পাপক্ষয়েরই উপায়। এই 'মাত্র' শব্দটির উপরে প্রাধান্য স্থাপন করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, যে সমস্ত অনুষ্ঠানের অন্য কিছু উদ্দেশ্য থাকে তাহাদের 'প্রায়শ্চিত্ত' সংজ্ঞা হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, পাপক্ষয়ের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত প্রাজাপত্য ব্রত প্রায়শ্চিত্ত বটে; কিন্তু, স্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে হইলে ইহার ঐ সংজ্ঞা

১ তপো নিশ্চয়সংযুক্তং প্রায়শ্চিত্তমিতি স্থিতম্—প্রায়শ্চিত্তবিবেক, পৃঃ ২।

২ প্রযত্নাদ্ বোপচিতমশুভং নাশয়তীতি প্রায়শ্চিত্তম্—ঐ, পৃঃ ৩।

হয় না। তুলাপুরুষ ও অশ্বমেধ প্রভৃতির প্রায়শ্চিত্ত সংজ্ঞা হয় না; কারণ, পাপক্ষয় ছাড়াও, পরমপদপ্রাপ্তি ইহাদের অপর উদ্দেশ্য। 'প্রায়শ্চিত্তবিবেকে'র টীকায় কিন্তু গোবিন্দানন্দ বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপক্ষয়কামনায় অনুষ্ঠিত অশ্বমেধও প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে[১]।

প্রাচীন শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসারে রঘুনন্দন সুন্দর একটি উপমার সাহায্যে প্রায়শ্চিত্তের ফল বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

> ক্ষার, উত্তাপ, প্রচণ্ড আঘাত এবং প্রক্ষালনের ফলে যেমন মলিন বস্ত্র পরিষ্কৃত হয়, তেমন ভাবেই তপশ্চর্যা, দান ও যজ্ঞের দ্বারা পাপী পাপমুক্ত হয়[২]।

পাপীর পাপমোচনই প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্য। তাহা হইলে, স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে—পাপ কি ?

'পাপ' শব্দের অর্থ, পাপের উৎপত্তি ও প্রকারভেদ

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, বিহিতকর্মের অকরণ ও নিন্দিতকর্মের অনুষ্ঠানই পাপ। শূলপাণির মতে, ইন্দ্রিয়ের অসংযমও পাপজনক। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ইন্দ্রিয়ের অসংযম নিন্দিতকর্মের অনুষ্ঠানের পর্যায়েই পড়ে, কারণ, মনু (৪।১৬) ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে স্পষ্টভাবে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু, নানা যুক্তিবলে শূলপাণি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, 'দংশ' ও 'অভিশাপ' প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে-ব্যক্তি দষ্ট হয় বা অভিশাপের ফলে শাস্তি পায়, সে পূর্বে ইন্দ্রিয়ের অসংযমবশতঃ সঞ্চিত পাপেরই ফল ভোগ করে।

১ যদা তু ব্রহ্মহত্যাপাপাপনোদনায়াশ্বমেধঃ ক্রিয়তে তদা সোঽপি প্রায়শ্চিত্তমেব—প্রা. বি., পৃঃ ৩ (টীকা)।

২ যথা ক্ষারোপস্বেদচণ্ডনির্ণোদনপ্রক্ষালনাদিভির্বাসাংসি শুধ্যন্তি, এবং তপোদানযজ্ঞৈঃ পাপবন্তঃ শুদ্ধিমুপযান্তি—প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, পৃঃ ৬।
'নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি' ইত্যাদি বচনে দেখা যায়, ভোগের দ্বারাই পাপক্ষয় হয়। এইরূপ হইলে প্রায়শ্চিত্তের প্রতি লোকের অপ্রবৃত্তিবশতঃ উহা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। সুতরাং, উপরি-উদ্ধৃত বচনের সাহায্যে স্মার্ত প্রায়শ্চিত্তের পাপনাশকত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তির পাপই ভোগের দ্বারা নষ্ট হয়।

বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধে প্রধান প্রধান পাপের নিম্নোক্ত শ্রেণীবিভাগ দেখা যায় :—

(১) অতিপাতক, (২) মহাপাতক, (৩) অনুপাতক ও (৪) উপপাতক।

প্রায়শ্চিত্ত কাম্য কি নৈমিত্তিক ?

পাপক্ষয়ের কামনায়ই প্রায়শ্চিত্ত করা হয় বলিয়া প্রায়শ্চিত্তমাত্রই কাম্য। কিন্তু, শূলপাণি ও রঘুনন্দন যুক্তিবলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন[১] যে, প্রায়শ্চিত্ত নৈমিত্তিকও বটে, কারণ, পাপরূপ নিমিত্ত না থাকিলে কেহ প্রায়শ্চিত্ত করে না। সুতরাং, ইঁহাদের মতে, প্রায়শ্চিত্ত অংশতঃ কাম্য ও অংশতঃ নৈমিত্তিক। আবার, অবশ্যকর্তব্য বলিয়া ইহাকে নিত্যও বলা হইয়াছে।

কামকৃত ও অকামকৃত পাপ এবং তাহার ফল

বর্তমান যুগে আমরা দেখিয়া থাকি যে, আপাতদৃষ্টিতে একরূপ অপরাধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্নরূপ শাস্তিবিধান হইয়া থাকে। এই প্রভেদের কারণ অপরাধীর মনোবৃত্তিগত পার্থক্য। কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অপরকে হত্যা করিলে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হয়। কিন্তু, অনিচ্ছাকৃত হত্যার জন্য তাহার অপরাধের মাত্রার লাঘব হয় এবং ফলে শাস্তিও লঘুতর হয়। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের অনুসরণকারী বাংলার নিবন্ধকারগণও জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের তারতম্য করিয়াছেন। শূলপাণিই এই বিষয়টি অতি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। কামকৃত বা জ্ঞানকৃত পাপের উদাহরণ-স্বরূপ গোবধের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। কোন ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া গোবধ করিলে সে জ্ঞানকৃত গোবধের পাপভাজন হইবে। কিন্তু, কেহ যদি গবয়াদি অপর জন্তুভ্রমে গোহত্যা করিয়া থাকে অথবা অপর কোন জন্তুর প্রতি নিক্ষিপ্ত অস্ত্রের দ্বারা গোহত্যা করে, তাহা হইলে সে অজ্ঞানকৃত গোবধের জন্য দায়ী হইবে। শেষোক্ত উদাহরণে, প্রথম ক্ষেত্রে নিহত জন্তুকে গো বলিয়া হত্যাকারী জানে না; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, নিহত জন্তুটিকে গো বলিয়া জানিলেও ইহাকে হত্যা করা হত্যাকারীর উদ্দেশ্য নহে।

মনু প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিকারের প্রমাণোল্লেখে শূলপাণি বলিয়াছেন যে, জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত লঘুতর। এই দুই প্রকার পাপের ফলের তারতম্য সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির শ্লোকটি প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচিত হয় :—

প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ।
কামতো ব্যবহার্যস্তু বচনাদিহ জায়তে॥ (৩।৫।২২৬)

শূলপাণির ব্যাখ্যানুসারে ইহার অর্থ এই যে, অজ্ঞানকৃত পাপই শুধু প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা অপগত হয়। কিন্তু, পাপ জ্ঞানকৃত হইলে, উহা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অপগত হয় না, যদিও পাপী সমাজে 'ব্যবহার্য' হয়। এখানে আপত্তি হইতে পারে যে, প্রায়শ্চিত্তের পরেও যদি পাপ থাকে তাহা হইলে পাপী সামাজিক ব্যবহার্যতা লাভ করিতে পারে না। ইহার উত্তরে শূলপাণি বলিয়াছেন যে, 'বচনাৎ' অর্থাৎ এই বচন বলেই এই ব্যবহার্যতা জন্মে। শূলপাণি কিন্তু বলিয়াছেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে, ব্যবহার্যতার অর্থ স্পর্শ ও দর্শন প্রভৃতির যোগ্যতা, এইরূপ পাপীর সহিত ভোজন ও বিবাহ প্রভৃতি প্রধান সামাজিক ব্যবহার অবশ্যই নিষিদ্ধ।

উল্লিখিত শ্লোকে 'ব্যবহার্য' শব্দটির পরিবর্তে 'অব্যবহার্য' পাঠ ধরিয়া শূলপাণি এই বচনটির অর্থ করিয়াছেন যে, অজ্ঞানকৃত পাপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা দূরীভূত হইবে, কিন্তু, জ্ঞানকৃত পাপ প্রায়শ্চিত্তের ফলে অপগত হইলেও যিনি পাপ কর্মটি করিয়াছেন তিনি সমাজে অব্যবহার্য হইবেন[১]। ইহাই সম্ভবত: শূলপাণির নিজস্ব মত।

জিকন বলিয়াছেন যে, পাপের ফল দুইটি, যথা—'শরীরগতমপ্রায়ত্যম্' অর্থাৎ শারীরিক অপবিত্রতা ও 'আত্মগত পাপ'। প্রথমোক্ত ফল হেতু পাপী অপর কর্তৃক স্পর্শের যোগ্যতা ও বৈদিক অনুষ্ঠানাদির অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়।

প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা জ্ঞানকৃত পাপের প্রথমোক্ত ফলই শুধু অপগত হয়, কিন্তু, আত্মগত পাপ ক্ষালিত হয় না, ভোগের দ্বারাই কেবল ইহার নাশ সম্ভবপর। জিকনের মত খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে মনুর প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শূলপাণি বলিয়াছেন যে, প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা জ্ঞানকৃত পাপও যে অপগত হয় শ্রুতিতেই ইহার সমর্থন আছে। শূলপাণি কর্তৃক প্রদত্ত শ্রুতিমূলক

১ '[illegible], লোকে প্রত্যাসত্তিবিবর্জিতে [illegible] তু নিহন্তব এব'—এই বচনানুসারেও বিশেষ বিশেষ স্থলে পাপীর অব্যবহার্যতা দেখা যায়।

কিম্বদন্তীটি এই যে, ইন্দ্র সজ্ঞানে কতক ঋষিকে কুকুরের ভোজনের নিমিত্ত নিক্ষেপ করায় প্রজাপতি তাঁহার পাপক্ষালনের জন্য 'উপহব্য' নামক প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছিলেন।

তন্ত্রতা

পাপ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এই যে, কোন ব্যক্তি একই পাপ যদি বারংবার করে তাহা হইলে ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্তও কি সে ততবার করিবে? এরূপ ক্ষেত্রে ধর্মশাস্ত্রকারগণ 'তন্ত্রতা'[১] নামক ন্যায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইহার অর্থ এই যে, কোন কোন ক্ষেত্রে একটি পাপ বার বার করিলেও, ঐ পাপের বিহিত প্রায়শ্চিত্ত একবার মাত্র করিলেই সমস্ত পাপ ক্ষালিত হইবে। যেমন, এক ব্যক্তি পর পর দুইবার ব্রহ্মবধ করিল। ব্রহ্মবধের পাপক্ষালনার্থ যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে তাহা একবার করিলেই তাহার সমস্ত পাপ দূরীভূত হইবে।

প্রসঙ্গ

প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে অপর একটি কূট প্রশ্ন উঠিতে পারে—কোন ব্যক্তি একটি গুরুতর পাপ করিয়া আর একটি লঘুতর পাপ করিল। সেই ব্যক্তি উভয় পাপ-ক্ষালনের জন্য কি ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্চিত্ত করিবে? এইরূপ ব্যাপারে বঙ্গীয় নিবন্ধকারগণ কর্তৃক অনুসৃত ধর্মশাস্ত্রকারগণ 'প্রসঙ্গ'[২] নামক ন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে, একটি ব্যাপারের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কোন কার্যদ্বারা অপর ব্যাপারের সিদ্ধি হয়। কোন ব্যক্তি যষ্টিদ্বারা একজন ব্রাহ্মণকে প্রহার করিল। তৎপর সে যষ্টি উত্তোলন করিয়া অপর একজন ব্রাহ্মণকে ভয় প্রদর্শন করিল। এক্ষেত্রে প্রথম অপরাধ গুরুতর; সুতরাং, এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের দ্বারাই লঘুতর পাপটিও অপগত হইবে। কোন ব্যক্তি ব্রহ্মবধ করিয়া ক্ষত্রিয়বধ করিল। এখানে ব্রহ্মবধ-জনিত পাপ গুরুতর; ইহার ক্ষালনার্থে যে প্রায়শ্চিত্ত, তাহার দ্বারাই ক্ষত্রিয়বধজনিত লঘুতর পাপ ক্ষালিত হইবে[৩]।

১ অনেকমুদ্দিশ্য সকৃৎ প্রবৃত্তিস্তন্ত্রতা—প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, পৃঃ ৯।
২ অন্যোদ্দেশ্যেন প্রবৃত্তাবন্যস্যাপি সিদ্ধিঃ প্রসঙ্গঃ—ঐ, পৃঃ ২৭।
৩ আধুনিক বিচারালয়ে concurrent sentences ব্যাপারটি তন্ত্রতা ও প্রসঙ্গের অনুরূপ।

প্রায়শ্চিত্তের লঘুত্ব-বিধান

প্রায়শ্চিত্তপ্রসঙ্গে স্থলবিশেষে রঘুনন্দন লঘুত্ববিধায়ক নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন। হারীতের প্রমাণবলে তিনি বলিয়াছেন যে, পাপকারীর বয়স ও ক্ষমতা, পাপকর্মের গ্রীষ্মাদি কাল প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিতে হইবে। রঘুনন্দন কর্তৃক উদ্ধৃত অপরাপর বচন হইতে বুঝা যায় যে, পাপকারী পুরুষ অথবা স্ত্রী এবং কোন্ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত তাহাও এই ব্যাপারে বিবেচ্য। স্ত্রীলোক ও শিশুর জন্য লঘুতর প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে শূদ্র কর্তৃক গোবধের প্রায়শ্চিত্ত অপর বর্ণের লোক অপেক্ষা লঘুতর।

এখানে একটি জটিল প্রশ্ন উঠে এই যে, পাপকারী যদি শিশু ও স্ত্রী উভয়ই হয় তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ হইবে? উত্তর এই যে, শিশুর জন্য অর্ধ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। আবার স্ত্রীলোকের জন্যও অর্ধ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং, এইরূপ পাপকারী স্বকৃত পাপের বিহিত প্রায়শ্চিত্তের এক চতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্ত মাত্র করিবে। এখানে বলা হইয়াছে যে, এইরূপ পাপকারী শূদ্র হইলেও প্রায়শ্চিত্ত আর লঘুতর হইতে পারে না, বিহিত প্রায়শ্চিত্তের এক চতুর্থাংশই লঘুতম।

নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয়

বহু দ্রব্য বিভিন্ন বর্ণের পক্ষে অভক্ষ্য ও অপেয় বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। নিষিদ্ধ বস্তুর ভক্ষণ ও পানজনিত পাপের মাত্রা বর্ণভেদে বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। আবার, কোন কোন দ্রব্য এক বর্ণের জন্য নিষিদ্ধ হইলেও অপর বর্ণের জন্য নিষিদ্ধ হয় না। এই প্রসঙ্গে শূলপাণি-উদ্ধৃত একটি বচনে[১] অভক্ষ্য দ্রব্যগুলির নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে:—

(১) জাতিদুষ্ট—স্বভাবতঃ অপকারী; যেমন, রশুন, পেঁয়াজ ইত্যাদি।

(২) ক্রিয়াদুষ্ট—কোন কার্যের দ্বারা দূষিত; যেমন, পতিত ব্যক্তির স্পর্শদূষিত।

(৩) কালদূষিত—পর্যুষিত।

(৪) আশ্রয়দূষিত—ইহার অর্থ স্পষ্ট নহে। সম্ভবতঃ ইহা মন্দ আশ্রয়ে বা পাত্রে রক্ষণ হেতু দূষিত বস্তুকে বুঝায়।

১ প্রা. বি.-পৃঃ ২৪৮।

(৫) সংসর্গদুষ্ট—সুরা, রশুন, প্রভৃতি নিষিদ্ধ বস্তুর সংসর্গে দূষিত।

(৬) শহৃল্লেখ—বিষ্ঠাতুল্য ; অর্থাৎ যে বস্তুর দর্শনে মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়।

নিষিদ্ধ পানীয় দ্রব্যসমূহের মধ্যে প্রধান সুরা। সাধারণতঃ আমাদের ধারণা এই যে, মদ্যমাত্রই সুরা নামে অভিহিত হয়। কিন্তু, প্রাচীন স্মৃতির প্রমাণবলে বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধকারগণ নিম্নলিখিত ত্রিবিধ মদ্যকে সুরা আখ্যা দিয়াছেন :— (১) পৈষ্টী—অন্নজাত, (২) গৌড়ী—গুড় হইতে উৎপন্ন, (৩) মাধ্বী—মধু হইতে জাত।

সকল মদ্যই যে সুরাশ্রেণীর নহে, তাহা ভবদেব স্পষ্টই বলিয়াছেন[১]। নানা প্রমাণবলে ভবদেব সুরাশব্দের মুখ্য ও গৌণভেদে দুইটি অর্থ প্রতিপন্ন করিয়াছেন[২]। মুখ্য অর্থে, সুরা শব্দে পৈষ্টী সুরাকে বুঝায়। গৌণ অর্থে, ইহা অপর প্রকার মদ্যকে বুঝাইয়া থাকে।

সুরাপানের ফল

মুখ্য সুরাপানে দ্বিজগণের মহাপাতক হয়। মনুর যে বচনে[৩] ত্রিবিধ সুরাই দ্বিজগণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য বঙ্গীয় স্মৃতিকারেরা এইরূপ করিয়াছেন যে, পৈষ্টীসুরা প্রথম ত্রিবর্ণের পক্ষেই নিষিদ্ধ ; অপর দুই প্রকার সুরাও ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ, অপর দুই বর্ণের পক্ষে নহে।

ভবদেব স্পষ্ট বলিয়াছেন[৪] যে, দ্বিজগণের পক্ষে সুরাবিষয়ক নিষেধ তাঁহাদের স্ত্রীলোকের পক্ষেও সমভাবে প্রযোজ্য।

বালকের মতে, সুরার সহিত ওষ্ঠ-সংযোগ হইলেও সুরাপান হয়। ভবদেব বা শূলপাণি কেহই এই মত সমর্থন করেন নাই। 'পান' শব্দে শূলপাণি 'কণ্ঠদেশাদধোনয়নম্' বা গলাধঃকরণ বুঝিয়াছেন।

১ মদ্যসুরাশব্দয়োর্ভিন্নার্থপ্রতিপাদকানেকবচনবিরোধাৎ—প্রা. প্র. পৃঃ ৪০।

২ তেন পৈষ্টীশব্দাভিধেয়ব্রীহ্যন্নবিকার এব মদ্যবিশেষো মুখ্যসুরাশব্দার্থ ইতি নির্ণীয়তে। মদ্যান্তরেষু মদকারিত্বগুণযোগাৎ গৌণোঽয়ং সুরাশব্দঃ—প্রা. প্র. পৃঃ ৭১।

৩ গৌড়ী পৈষ্টী চ মাধ্বী চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা।
যথৈবৈকা তথা সর্বা ন পাতব্যা দ্বিজোত্তমৈঃ ॥ (১১।৯৪)।

৪ স্ত্রীণামপি ব্রাহ্মণীক্ষত্রিয়াবৈশ্যানাং সুরাপানং মহাপাতকমেব। প্রা. প্র. পৃঃ ৪২।

সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত

মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে, সুরার নিম্নলিখিতরূপ পানে বিভিন্ন মাত্রার পাপ হইয়া থাকে :— (১) সজ্ঞানে পান, (২) অজ্ঞানে পান, (৩) অপর কর্তৃক বলপ্রয়োগের ফলে পান, (৪) একবার পান, (৫) বারংবার পান, (৬) তক্র বা ঘোল মিশ্রিত সুরাপান—মিশ্রণ এরূপ হইবে যে সুরার গন্ধ অনুভূত হইবে না, (৭) তক্রমিশ্রিত সুরা—মিশ্রণ এরূপ হইবে যে, সুরার গন্ধ অনুভূত হইবে।

সুরাপানজনিত পাপের মাত্রানুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত নানারূপ হইতে পারে, কঠোরতম প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু। দ্বাদশবার্ষিক ব্রত, ত্রিবার্ষিক ব্রত, একবার্ষিক ব্রত ও পুনরুপনয়ন—এইরূপ অন্যান্য প্রকার প্রায়শ্চিত্তের বিধিও আছে।

সুরাপানজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে বিধি বহু। শূলপাণির মতে প্রধান নিয়মগুলি নিম্নে লিখিত হইল :—

১। দ্বিজগণের সজ্ঞানে সুরাপানের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মৃত্যুই বিধেয়, বৈকল্পিক বিধিস্বরূপ চতুর্বিংশতিবার্ষিক ব্রত অনুষ্ঠেয়।

২। ব্রাহ্মণ কর্তৃক অজ্ঞানে সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশবার্ষিক ব্রত, ইহা সম্ভবপর না হইলে ১৮০টি দুগ্ধবতী গাভী দান, ইহাও না হইলে ৫০০ চূর্ণী ও ৪০ পুরাণ দান[১]।

সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে প্রধান প্রধান নিয়মগুলি নিম্নলিখিতরূপ।

দ্বাদশবার্ষিক ব্রত মৃত্যুর অর্ধেক বলিয়া পরিগণিত হয়। মুখের সহিত সুরার সংসর্গই সুরাপান নহে, সুতরাং, মুখের সহিত সুরাসংসর্গের প্রায়শ্চিত্ত সুরাপানের প্রায়শ্চিত্তের অর্ধেক হইবে। পৈষ্টীসুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত ব্রাহ্মণের পক্ষে সম্পূর্ণ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ৩/৪ ভাগ ও বৈশ্যের পক্ষে ২/৪ ও শূদ্রের পক্ষে ১/৪,[২] অর্থাৎ ব্রাহ্মণের যে প্রায়শ্চিত্ত নিম্নতর বর্ণের পক্ষে তাহা হইতে এক এক পাদ করিয়া কম হইবে।

১ ১ চূর্ণী=১০০ কপর্দ ; ১ পুরাণ=১৬ পণ কড়ি।

২ কোন কোন বচন হইতে মনে হয়, সুরাপানে শূদ্রের কোন পাপ নাই। সুতরাং, বর্তমান ক্ষেত্রে শূদ্রের প্রায়শ্চিত্তবিধান অসামঞ্জস্যকর বলিয়া মনে হয়। ভবদেবের মতে, এখানে শূদ্র সম্বন্ধে বিধিটির কোন তাৎপর্য নাই। (দ্রঃ—প্রা. প্র., পৃঃ ৪৬)।

সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে যে মৃত্যু ও পুনরুপনয়নের বিধান করা হইয়াছে, তাহার হ্রাস সম্ভবপর নহে। কিন্তু, অনুপনীত ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণবর্ণের অবিবাহিতা কন্যার পক্ষে মৃত্যুর পরিবর্তে দ্বাদশবার্ষিক ব্রতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনুপনীত বালক অশক্ত হইলে তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ তাহার ভ্রাতা বা এইরূপ অপর কোন শাস্ত্রনির্দিষ্ট ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অথবা ঋত্বিক (=সাধারণতঃ কুলপুরোহিত) তৎকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। ভবদেব কর্তৃক উদ্ধৃত একটি প্রমাণ হইতে বুঝা যায় যে, পাঁচ হইতে এগার বৎসর বয়স্ক বালকের প্রতিনিধি প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে। পাঁচ বৎসরের কম বয়স্ক বালকের কোন পাপই হয় না। কিন্তু, অপরাপর প্রমাণবলে ভবদেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এইরূপ বালকেরও সুরাপানজনিত পাপ হইয়া থাকে, তবে তাহার পক্ষে অর্ধপ্রায়শ্চিত্তমাত্র বিধেয়। জিকনের মতানুযায়ী শূলপাণি মনে করেন যে, পাঁচ বৎসরের ন্যূনতর বয়স্ক বালকের পাপ হইবে না যদি সেই বালক ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যবর্ণের হয়।

কাহাদের সঙ্গে যৌনসম্বন্ধ নিষিদ্ধ?

যে সকল স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌনসম্বন্ধ পাপজনক বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে গুর্বঙ্গনাই প্রধান। গুর্বঙ্গনাগমন মহাপাতক বলিয়া গণ্য হইয়াছে। 'গুর্বঙ্গনা' পদটির অর্থ বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার বিগ্রহবাক্য নিম্নলিখিত দুই প্রকার হইতে পারে:—

(১) গুর্বী চাসৌ অঙ্গনা চেতি (কর্মধারয়),

(২) গুরোরঙ্গনা (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)।

ভবদেব প্রথম অর্থেই পদটিকে বুঝিয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্রে মাতা ও পিতা উভয়ই 'গুরু' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন[১]; তাহা হইলে 'গুর্বঙ্গনা' পদটির অর্থ দাঁড়ায়—যে স্ত্রীলোক নিজেই গুরু, অর্থাৎ মাতা। কিন্তু, কর্মধারয় সমাস হইলে যে সকল বচনে 'গুর্বঙ্গনা'র পরিবর্তে 'গুরুপত্নী' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে ঐ স্থলগুলিতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

১ শরীরোৎপাদকত্বেনোপাধিনা মাতাপিত্রোগুরুশব্দাভিধেয়ত্বাৎ—প্রা. বি., পৃঃ ১৩২।

'পতি' শব্দের সহিত 'ন' ও স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙ্গী' যোগ করিয়া 'পত্নী' পদটি গঠিত হয়। সুতরাং, গুর্বী চাসৌ পত্নী চেতি—এরূপ বিগ্রহবাক্য হয় না; যাহার পত্নী তাহার গুরু হওয়া সম্ভবপর নহে [১]। অবশ্য ষষ্ঠী তৎপুরুষ করিলে গুরুর অর্থাৎ পিতার পত্নী বা মাতা—এইরূপ অর্থই দাঁড়ায়। যাহা হউক, বাংলাদেশে মাতা অর্থই গৃহীত হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে—মাতার সপত্নীও কি গুর্বঙ্গনা? কেহ কেহ মাতার সপত্নীকেও গুর্বঙ্গনা বলিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু, ভবদেব স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, শুধু মাতাই গুর্বঙ্গনা, তাঁহার সপত্নী নহেন[২]। গুর্বঙ্গনাগমনজনিত পাপের আলোচনা প্রসঙ্গে কোন কোন স্থানে 'গুরুতল্প' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে; এই শব্দটির দ্বারাও বাংলার নিবন্ধকার মাতাকেই বুঝিয়াছেন[৩]। শূলপাণির নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে বাংলাদেশে 'গুর্বঙ্গনা' পদের যে অর্থ গৃহীত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়:—

নিঃসন্দিগ্ধার্থং মাতৃপদমেব প্রযোক্তুমুচিতং মুনীনাং
ন তু গুরুপত্ন্যাদিপদং সংদিগ্ধার্থম্[৪]।

অর্থাৎ, যাহাতে সন্দেহের অবকাশ আছে এইরূপ 'গুরুপত্নী' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ না করিয়া যাহাতে কোন সন্দেহ নাই এরূপ মাতৃপদই মুনিদের প্রয়োগ করা উচিত। যেহেতু মাতৃপদের প্রয়োগ হয় নাই, সেই হেতু 'গুর্বঙ্গনা' পদে বুঝায় গুরুর অর্থাৎ পিতার অঙ্গনা; এখানে 'অঙ্গনা'র অর্থ মাতার সপত্নী যিনি সমবর্ণা বা উচ্চবর্ণা। জননী-গমনকে অতিপাতক শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে[৫]।

১ যদপেক্ষয়া পত্নীত্বং তদপেক্ষয়া গুরুত্বাযোগাৎ ন কর্মধারয়ঃ—প্রা. বি., পৃঃ ১৩২।
২ স্বমাতৃগমনমেব মহাপাতকমিতি প্রসিদ্ধম্—প্রা. প্র., পৃঃ ৮১।
৩ গুরুস্তল্পং কলত্রং যস্তেতি মাতুরেব গ্রহঃ—প্রা. বি., ১৩২। অর্থাৎ, মাতা কলত্র যাহার—যাহার নিকট মাতা পত্নীস্বরূপা।
৪ প্রা. বি., পৃঃ ১৩৩।
৫ মাতৃগমনং দুহিতৃগমনং স্নুষাগমনমিত্যতিপাতকানি—বিষ্ণুহারীত।

'অতিদেশে'[১]র সাহায্যে মাতার সপত্নী, ভগ্নী, আচার্যকন্যা, আচার্যানী এবং স্বীয় কন্যা—প্রভৃতির সহিত যৌনসম্বন্ধকেও গুর্বঙ্গনাগমনের তুল্য বিবেচনা করা হইয়াছে[২]।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের সহিত যৌনসম্পর্ক পাপজনক ; কিন্তু, এই পাপ মহাপাতক অপেক্ষা লঘুতর :—

নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তির স্ত্রী, নিম্নতর বর্ণের স্ত্রীলোক, রজক-পত্নী, রজস্বলা নারী, গর্ভবতী নারী, ব্রহ্মচারীর পক্ষে যে কোন নারী।

এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, গো প্রভৃতি ইতর প্রাণীর সহিত যৌনি-সম্পর্কও প্রায়শ্চিত্তার্হ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

নরহত্যা

এইরূপ কর্মই হত্যা যাহা কোন ব্যক্তির প্রাণবিয়োগের কারণ হয়[৩]। বধ দ্বিবিধ—মুখ্য ও গৌণ। যখন হত্যাকারী অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, তখন উহা মুখ্যবধ। অপরের সাহায্যে বধ গৌণ। হত্যায় সহায়ক চতুর্বিধ[৪], যথা—

(১) অনুমন্তা— (ক) যে ব্যক্তি হত্যাকারীকে এই বলিয়া আশ্বাস দেয় যে, অপর যে ব্যক্তি বাধা দিলে হত্যা সম্ভবপর হইবে না তাহাকে সে বাধা দিবে,

(খ) যে হত্যাকারীকে বিরত করিবার চেষ্টা করে না।

(২) অনুগ্রাহক—(ক) যে 'বধ্যগত বৈমনস্য' জন্মায় ; অর্থাৎ, বধ্যব্যক্তিকে অন্যমনস্ক করিয়া দিয়া তাহার বধের সহায়ক হয়,

(খ) বধ্যব্যক্তির সাহায্যার্থ আগমনকারী ব্যক্তিকে যে বাধা দেয়।

১ 'Extended application' (M. Williams) অর্থাৎ একটি নিয়মের প্রযোজ্যতার ক্ষেত্র বর্ধিত করা।

২ মাতুঃ সপত্নীং ভগিনীমাচার্যতনয়াং তথা। আচার্যানীং স্বাং চ সুতাং গচ্ছংস্তু গুরুতল্পগঃ॥ যা. স্মৃ. ৩।৫।২৩২—২৩৩—শূলপাণি কর্তৃক উদ্ধৃত (প্রা. বি, পৃঃ ১৩০)।

৩ প্রাণবিয়োগফলকব্যাপারো হননমিতি—প্রা. প্র. পৃঃ ১।

৪ দ্রঃ—প্রা. বি. পৃঃ ৪৮—৪৯।

[শূলপাণির মতে সে-ই দ্বিতীয় প্রকারের অনুগ্রাহক যে 'স্বল্পপ্রহর্তা' অর্থাৎ বধ্যব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ আঘাত করে।]

(৩) নিমিত্তী—যৎকর্তৃক ক্রোধ-উৎপাদন হেতু কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রাণ-নাশে কৃতসঙ্কল্প হয়[১]।

(৪) প্রযোজক—(ক) অপ্রবৃত্তপ্রবর্তক—যে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে বধে প্রবৃত্ত করে,

(খ) প্রবৃত্তোৎসাহজনক—বধে উদ্যোগী ব্যক্তিকে যে উৎসাহ দেয়।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, প্রথম প্রকারের প্রযোজক মুখ্য হত্যাকারী, কারণ, এক্ষেত্রে যাহাদ্বারা হত্যাকার্য নিষ্পন্ন হয় সে প্রযোজকের অস্ত্রস্বরূপ মাত্র। এই মতের নিরসনকল্পে বলা হইয়াছে এই যে, যে অস্ত্রদ্বারা হত্যা করা হয় তাহা অচেতন পদার্থ, কিন্তু, প্রযোজ্য কর্তা চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া বধের নিমিত্ত তাহাকে প্রয়াস করিতে হয়। প্রযোজকের প্ররোচনা ও বধের অন্তর্বর্তী অবস্থার মধ্যে প্রযোজ্য কর্তার স্বীয় প্রয়াসও থাকে যাহা অস্ত্রের ক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে। সুতরাং প্রযোজক কর্তা বধের জন্য গৌণভাবে দায়ী।

গৌণবধ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, শাস্ত্রীয় বচনে বধেব গৌণকারণ-রূপে যাহা নির্ধারিত হইয়াছে তাহার বহির্ভূত কোন গৌণকারণ হইতে পারে না[২]। নতুবা, অনেক অসম্ভব ব্যাপারের সৃষ্টি হইবে। সমস্ত গৌণকারণই যদি বধের নিমিত্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে যে শরের দ্বারা কোন ব্যক্তি নিহত হয় সেই শরের নির্মাতাও বধের জন্য গৌণভাবে দায়ী হইয়া পড়ে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মঙ্গলকামনায় অনুষ্ঠিত কোন কর্মের ফলে দৈবাৎ যদি কাহারও মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে সেই মঙ্গলকর্মকারী হত্যাকারী বলিয়া গণ্য হইতে পারে না[৩]। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তির আহারকালে আহাযবস্তুদ্বারা কণ্ঠরোধজনিত মৃত্যু ঘটিলে সে আত্মহত্যার জন্য দায়ী হইতে পারে না। সুতরাং, দেখা যায়, বধভাগী

১ প্রা. প্র, পৃঃ ৮।

২ যেষাং বাচনিকং হন্তৃত্বং প্রতীয়তে তেষামেব নিষেধবিষয়ম্—প্রা. প্র., পৃঃ ২।

৩ যত্রোপকারকরণে দৈবাদ্বধো নিষ্পাদ্যতে তত্র বচনবলান্ন বধভাগিত্বম্—ঐ, পৃঃ ৩।

হইতে হইলে হত্যাকারীর হননের ইচ্ছাই প্রধান। বর্তমান যুগেও হত্যাকারীর হননেচ্ছা না থাকিলে তাহাকে ঠিক বধের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় না, এরূপ ক্ষেত্রে তাহার অপরাধকে বলা হয় culpable homicide not amounting to murder, অর্থাৎ, সাপরাধ নরহত্যা, কিন্তু উহা বধতুল্য নহে।

ব্রহ্মহত্যা

নরহত্যামাত্রই পাপজনক। কিন্তু, ব্রহ্মহত্যার পাপই সর্বাতিশায়ী; ইহা মহাপাতক। আততায়ী ব্রাহ্মণকে বধ করিলে পাপ তত গুরুতর হয় না। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আততায়ী বলিয়া গণ্য হয়:—

(১) অগ্নিদ—যে অপরের গৃহে অগ্নিসংযোগ করে,
(২) গরদ—যে অপরকে বিষ প্রয়োগ করে,
(৩) শস্ত্রপাণি—মারাত্মক অস্ত্রধারী ব্যক্তি,
(৪) ধনাপহ—ধনের[১] অপহারক,
(৫) ক্ষেত্রাপহারী—যে অপরের ক্ষেত্র আত্মসাৎ করে,
(৬) দারাপহারী—যে অপরের স্ত্রীকে অপহরণ করে,
(৭) পত্ন্যভিগামী—অপরের পত্নীর সহিত যাহার যৌন সম্পর্ক ঘটে,
(৮) অথর্বহন্তা বা অভিচারকারী—অভিচারক্রিয়া দ্বারা যে অপরের প্রাণনাশে যত্নবান হয়,
(৯) রাজগামী পৈশুনযুক্ত—যে রাজা সম্বন্ধে এরূপ অপমানসূচক বাক্য অপরের উপর আরোপিত করে যে, উহা রাজার কর্ণগোচর হইলে শেষোক্ত ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড অবশ্যম্ভাবী,
(১০) তেজোঘ্ন—যে মদ্যদানের দ্বারা অপরের ব্রাহ্মণ্যতেজ নষ্ট করে।

ব্রহ্মহত্যা মহাপাতক হইলেও আততায়ী ব্রাহ্মণের বধে পাপাভাব সূচিত হইয়াছে, সুতরাং, মনে হয়, আত্মরক্ষা হেতু ঐরূপ ব্রাহ্মণকে বধ করিলে

১ এখানে 'ধন' শব্দে সেই পরিমাণ ধনকে বুঝায়, যে পরিমাণ অপহরণ করিলে ধনস্বামীর বাঁচিবার উপায় থাকে না।
'ধনস্ত তু বহুতরস্তেবাপহর্তা যদপহারেণ বর্তনোচ্ছেদ এব ভবতি স এবাততায়ীতি দ্রষ্টব্যঃ" —প্রা. প্র., পৃঃ ৫।

কোন দোষ হয় না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পলায়নাদি দ্বারা আততায়ীর হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়ার উপায় থাকা সত্ত্বেও যদি কেহ আততায়ী ব্রাহ্মণকে বধ করে তাহা হইলে সে পাপের ভাগী হইবে[১]।

এই প্রসঙ্গে ভবদেব বলিয়াছেন যে, যে বর্তমানে আততায়ীর ন্যায় আচরণ করে সেই আততায়ী; অতীতে যদি কেহ ঐরূপ করিয়া থাকে বা ভবিষ্যতে করিতে পারে বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে সে আততায়ী বলিয়া গণ্য হইবে না[২]।

শূলপাণির মতে, যে ব্যক্তি নিজের প্রতি কৃত অনিষ্টের প্রতিশোধকল্পে উক্তরূপ আচরণ করে সে আততায়ী নহে[৩]।

আততায়িবধের প্রসঙ্গে সুমন্তুর একটি বচন এইরূপ :—

আততায়িবধে ন দোষোঽন্যত্র গোব্রাহ্মণাৎ।

ভবদেব বচনটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—

"আততায়িবধে ন" এবং "দোষোঽন্যত্র" ইত্যাদি।

তাঁহার মতে, আততায়ী ব্রাহ্মণ হইলেও তাহার বধে পাপ নাই। আততায়ী ভিন্ন অন্য ব্রাহ্মণের বধ প্রায়শ্চিত্তার্হ বটে। শূলপাণি কিন্তু উক্ত বচনের সহিত আততায়িবধজনিত পাপ সম্বন্ধে ভগবদ্গীতার শ্লোকের[৪] তুলনা করিয়া অন্যরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, আততায়ী হত্যাকারীর তুলনায় 'তপোবিদ্যাজাতিকুল' প্রভৃতি হেতু উৎকৃষ্ট হইলে তাহার বধে নিশ্চয়ই পাপ হয়, কিন্তু আততায়ী নিকৃষ্ট হইলে কোন পাপ হয় না[৫]। বহুগুণসম্পন্ন আততায়ী ব্রাহ্মণকে বধ করিলেও পাপ হয় না বলিয়া যে বচনাদি আছে তাহাদের মর্ম, শূলপাণির মতে এই যে, ঐরূপ ক্ষেত্রে বধ্য ব্যক্তির তুলনায়

১ সর্বত্র এবাত্মানং গোপায়ীতেতি শ্রুতিমূলমিদং, অতঃ পলায়নাদিনাপি আত্মরক্ষণাভাবে ইদং বোদ্ধব্যম্। প্রা. বি., পৃঃ ৫৯।

২ প্রবৃত্তক্রিয় এবাততায়ী ন বৃত্তীতক্রিয়ো ভবিষ্যৎক্রিয়ো বা—প্রা. প্র., পৃঃ ৫।

৩ পূর্বকৃতাপকারস্য মারণোদ্যতস্য নাততায়িতা। প্রা. বি., পৃঃ ৬০।

৪ পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ—১।৩৫।

৫ হন্ত্রপেক্ষয়া তপোবিদ্যাজাতিকুলৈরুৎকৃষ্টো নাততায়ী বধ্যো তদন্যো বধ্য এব। প্রা. বি., পৃঃ ৬১।

হত্যাকারীর উৎকর্ষ বুঝিতে হইবে। আততায়ী গুরুকেও শিষ্য হত্যা করিতে পারে—এই বিধানের তাৎপর্য এই যে, শিষ্যও কুল, বিদ্যা প্রভৃতিতে গুরুর তুলনায় উৎকৃষ্টতর হইতে পারে[১]।

ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত

ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে বিধিগুলি বহু ও জটিল। বর্তমানে আমরা শুধু প্রধান প্রধান নিয়মগুলিরই আলোচনা করিব।

বিশিষ্ট প্রকার ব্রহ্মবধের কোন প্রায়শ্চিত্ত বিহিত না থাকিলে হত্যাকারীর জাতি, শক্তি, গুণ, এবং বধ ইচ্ছাকৃত কি অনিচ্ছাকৃত প্রভৃতি বিবেচনা পূর্বক প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সাধারণ নিয়ম এই যে, ব্রহ্মবধ জ্ঞানকৃত হইলে সকল বর্ণের হত্যাকারীর মৃত্যুই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত এবং অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশবার্ষিক ব্রত[২]।

শ্রীকর প্রভৃতি স্মার্তেরা ব্রহ্মবধ প্রসঙ্গে একটি সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে, যে ব্রহ্মবধে হত্যাকারীর জ্ঞান ও ইচ্ছা উভয়ই বর্তমান তাহার কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। শূদ্রবধে উদ্যোগী কোন ব্যক্তি দৈবাৎ বা ভ্রমক্রমে ব্রহ্মবধ করিলে তাহার বধের ইচ্ছা থাকিলেও ব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞান থাকে না। আবার, ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি কেহ ব্রহ্মবধ করিতে অপর কর্তৃক বাধ্য হয়, তাহা হইলে তাহার ব্রহ্মবধের জ্ঞান থাকে, ইচ্ছা থাকে না। এইরূপ ক্ষেত্রেই প্রায়শ্চিত্ত সম্ভবপর। এই মত খণ্ডন করিয়া ভবদেব বলিয়াছেন যে, উক্ত উভয় ক্ষেত্রেই অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মবধের পাপ হইবে; প্রথম স্থলে জ্ঞান নাই; দ্বিতীয় স্থলে কামনার অভাব অজ্ঞানেরই তুল্য। হত্যাকারীর মনে জ্ঞান ও ইচ্ছার সমন্বয়ে যে শ্রীকর প্রভৃতি স্মার্তেরা প্রায়শ্চিত্তের অভাব বিধান করিয়াছেন, ভবদেব তাহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে ইচ্ছাই যথেষ্ট, জ্ঞান অপ্রাসঙ্গিক এবং ইচ্ছাকৃত ব্রহ্মবধের পাপ মৃত্যুর দ্বারা অবশ্যই অপগত হয়।

১ যদ্যপি গুরুং বহুশ্রুতং হন্যাদিতি শ্রূয়তে তথাপি গুরোঃ সকাশাৎ কুলবিদ্যাতপোভিঃ শিষ্যস্যাপি উৎকর্ষসম্ভবাৎ—প্রা. বি., পৃঃ ৬১।

২ কামতঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মবধবিশেষাশ্রবণাৎ সর্বেষামেব বর্ণানাং মরণান্তিকম্—প্রা. প্র, পৃঃ ৮। অকামতঃ দ্বাদশবার্ষিকং কর্তব্যম্—প্রা. বি., পৃঃ ৮৮।

প্রায়শ্চিত্তের পাপাপনোদক শক্তি সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের বচন পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে 'কামতোঽব্যবহার্যস্তু' এই অংশের ব্যাখ্যায় ভবদেব বলিয়াছেন যে, ইহার তাৎপর্য ইচ্ছাকৃত পাপের নিন্দা, এইরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্তাভাব নহে। উক্ত যাজ্ঞবল্ক্যবচনাংশের বৈকল্পিক ব্যাখ্যাস্বরূপ শূলপাণি বলিয়াছেন, ইহার অর্থ এরূপ হইতে পারে যে, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি নিম্নতর বর্ণের লোক যদি গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে হত্যা করে তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তের দ্বারাও তাহার পাপমুক্তি হইবে না[১]। আবার, শূলপাণি ইহাও বলিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্যের এই বচনের তাৎপর্য এই যে, উক্তরূপ ক্ষত্রিয়াদির মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ তৎপরিবর্তে চতুর্বিংশতি বার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠানের পরেও সামাজিক ব্যবহার্যতা হয় না; এই পাপের প্রায়শ্চিত্তই যে নাই তাহা নহে[২]।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশবার্ষিক ব্রত। নিম্নলিখিতরূপ অজ্ঞানকৃতব্রহ্মহত্যাকারিগণের[৩] প্রায়শ্চিত্ত যেরূপ হইবে তাহা তাহাদের পার্শ্বে লিখিত হইল :—

(১) অপ্রবৃত্তপ্রবর্তক (প্রযোজক)—১০½ বার্ষিক ব্রত,
(২) বৈমনস্যাপাদক (অনুগ্রাহক)—৯ বার্ষিক ব্রত,
(৩) প্রবৃত্তোৎসাহজনক (প্রযোজক)—৭½ বার্ষিক ব্রত,
(৪) বধ্যস্যানুগ্রাহকান্তরব্যুদাসক (অনুগ্রাহক)—৬ বার্ষিক ব্রত,
(৫) অনুমন্তা—৪½ বার্ষিক ব্রত,
(৬) নিমিত্তী—৩ বার্ষিক ব্রত।

ইহা হইতে বুঝা গেল যে, পূর্ব পূর্ব হত্যাকারীর অপরাধ উত্তর উত্তর হত্যাকারীর অপরাধ অপেক্ষা গুরুতর। উক্ত তালিকায় মূল দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত হইতে ক্রমশঃ প্রত্যেকের স্থলে ⅛ অংশ হিসাবে হ্রাস করা হইয়াছে। এইরূপ অষ্টম ভাগের হ্রাস ভবদেবের অনুমোদিত; শূলপাণি ইহা সমর্থন করেন নাই[৪]।

১ ক্ষত্রিয়াদিকৃতসগুণ-ব্রাহ্মণ-বধবিষয়ং বা—প্রা. বি., পৃঃ ৬৭।

২ বস্তুতস্তু নিষ্কৃত্যভাববচনং মরণবিকল্পিতচতুর্বিংশতিবার্ষিকপ্রায়শ্চিত্তেঽপি কৃতে ব্যবহার্যতাভাবপরম্; ন তু প্রায়শ্চিত্তাভাবপরম্। —ঐ।

৩ হত্যাকারিগণের শ্রেণীবিভাগের জন্য পূর্বে নরহত্যাপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

৪ অষ্টমাষ্টমভাগহানিরিতি ভবদেবব্যাখ্যানং প্রমাণশূন্যম্—প্রা. বি. পৃঃ ৭৩।

শূলপাণির মতে, প্রায়শ্চিত্ত নিম্নলিখিতরূপ হইবে :—

(১) সাক্ষাৎবধকর্তা—১২ বার্ষিক ব্রত,

(২) অনুগ্রাহক (স্বল্পপ্রহর্তা)—৯ বার্ষিক ব্রত,

(৩) প্রযোজক (অপ্রবৃত্তপ্রবর্তক)—ঐ,

(৪) অনুগ্রাহক (বধ্যপ্রতিরোধক)—৬ বার্ষিক,

(৫) প্রযোজক (প্রবৃত্তপ্রযোজক)—ঐ,

(৬) অনুমন্তা—৩ বার্ষিক,

(৭) নিমিত্তী—ঐ।

মূল প্রায়শ্চিত্ত হইতে পাদ অর্থাৎ একচতুর্থাংশ হ্রাসের নিয়ম শূলপাণি গোবধের প্রায়শ্চিত্ত বিধি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন[১]।

কামকৃত ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্ত মরণান্তিক হইলেও জাতিভ্রষ্ট ব্রাহ্মণকে ইচ্ছা সহকারে বধ করিলে দ্বাদশবার্ষিক প্রায়শ্চিত্তই বিধেয়। বর্ণভেদে প্রায়শ্চিত্তের বিধান সম্বন্ধে একটি বচন এইরূপ :—

বিপ্রে তু সকলং দেয়ং পাদোনং ক্ষত্রিয়ে মতম্।
বৈশ্যেঽর্ধং পাদশেষং তু শূদ্রজাতিষু শস্যতে[২] ॥

ইহার ব্যাখ্যায় ভবদেব ও শূলপাণি উভয়েই বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মবধ ভিন্ন অপরাপর পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে এই বিধি প্রযোজ্য। শূলপাণির মতে, ইহা অভক্ষ্যবিষয়ক প্রায়শ্চিত্ত বিধিও হইতে পারে।

শুধু বধই নহে, বধের সঙ্কল্পও প্রায়শ্চিত্তার্হ[৩]।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, বধের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতে যাইয়া নিবন্ধকারগণ প্রহার, লঘু আঘাত ও গুরু আঘাত প্রভৃতিরও প্রায়শ্চিত্তের বিধান

১ পাদমেব চরেদ্রোধে দ্বৌ পাদৌ বন্ধনে চরেৎ।
যোজনে পাদহীনং স্যাচ্চরেৎ সর্বং নিপাতনে ॥
শূলপাণি-ধৃত সংবর্ত-বচন, প্রা বি., পৃঃ ৭৩।

২ প্রা. প্র. পৃঃ ৪৫।

৩ বধ্যাপস্তম্ববচনং-দ্বাদশরাত্রমব্ভক্ষো দ্বাদশরাত্রমুপবসেৎ ইতি
তদ্বধার্থং মানসমাত্রপ্রবৃত্তাবিতি দ্রষ্টব্যম্। প্রা. প্র., পৃঃ ১৫।

করিয়াছেন। বর্তমান Indian Penal Code-এ যেমন assault, hurt, grievous hurt প্রভৃতি অপরাধের সূক্ষ্ম ভাগবিভাগ দেখা যায়, প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকার এবং বঙ্গীয় নিবন্ধকারেরাও তেমনই অপরাধের লঘু গুরু মাত্রা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

আত্মহত্যা বা আত্মহত্যার প্রয়াসও প্রায়শ্চিত্তার্হ।

পূর্বে তন্ত্রতা ও প্রসঙ্গ নামে দুইটি ন্যায়ের কথা বলা হইয়াছে, ঐ ন্যায় দুইটি ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্তের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

গোবধের প্রায়শ্চিত্ত

গোবধের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে মোটামুটি নিয়মগুলি এইরূপ। যে গরুর স্বামী ব্রাহ্মণ তাহার বধে পাপ গুরুতর, নিম্নবর্ণের ব্যক্তি যে গরুব অধিকারী তাহাব বধে পাপের মাত্রা লঘুতর। গরুর নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি তাহার বধজনিত পাপের গুরুত্ব ও লঘুত্বের নির্ণায়ক :—

(১) সগর্ভতা,
(২) অত্যন্ত পরিণত বয়স,
(৩) অত্যন্ত কৃশতা,
(৪) রোগ,
(৫) অন্ধত্ব, উন্মাদ,
(৬) তৃণ বা অন্য কিছু ভক্ষণকালে গরুকে বাধা দেওয়া,
(৭) অসময়ে গরুব বন্ধন,
(৮) গোপালনে অবহেলা,
(৯) গরুর কূপাদিতে পতন।

স্তেয়

ভবদেবের মতে, সেই কর্মের নাম স্তেয় বা চৌর্য যাহাদ্বারা একের যথেচ্ছ ব্যবহার্য দ্রব্যের উপরে তাহার বিনা অনুমতিতে অপরের যথেচ্ছ ব্যবহারের যোগ্যতা আরোপিত হয়[১]। শূলপাণি সারতঃ এই সংজ্ঞা সমর্থন কবিলেও একটি কথা যোগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এইরূপ ব্যাপারে

১ পরকীয়যথেষ্টবিনিয়োগার্হে দ্রব্যে তদনুমতিব্যতিরেকেণান্যস্য যথেষ্টবিনিয়োগার্হত্বপ্রতিপাদনং স্তেয়ম্—প্রা. প্র., পৃঃ ৭২।

অপরের স্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন যে, ঐ দ্রব্যটির স্বত্বাধিকারী অন্য কোন ব্যক্তি[১]। ভবদেব বলিয়াছেন যে, প্রকৃত স্বত্বাধিকারী যদি চোরের নিকট হইতে দ্রব্যটি ফিরাইয়া নেয়, তাহা হইলে স্বত্বাধিকারীর চৌর্যের অপরাধ হইবে না। কাহারও কাহারও মতে, অপরের দ্রব্য স্থানান্তরিত করিলেই চৌর্য হয়। শূলপাণি এই মত খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন যে, অপরের বস্তুর অপসারণই যদি চৌর্য হইত, তাহা হইলে এক ব্যক্তির নিকট অপর ব্যক্তিকর্তৃক গচ্ছিত দ্রব্যও অপহৃত বস্তু বলিয়া গণ্য হইত। অপরের বস্তু বলিয়া নিশ্চিত জ্ঞান না থাকিলে ঐ বস্তুর অপসারণে চৌর্য হয় না— ইহা বুঝাইবার জন্য শূলপাণি নিম্নলিখিত দুইটি উদাহরণ দিয়াছেন :—

(১) অনেক লোকের অনেক অঙ্গুরীয়ের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি অপরের একটি অঙ্গুরীয় স্বীয় বস্তুভ্রমে নিয়া উহা বিক্রয় করিল,

(২) একটি অবিভক্ত সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর একাধিক ভ্রাতা আছে। সকলেই একযোগে উহা ভোগ করিতে থাকিলে একে অপরের অংশও ভোগ করে; কারণ, প্রত্যেক অংশেই প্রত্যেকের স্বত্ব থাকে।

প্রথম স্থলে গৃহীত অঙ্গুরীয়টি অপরের বলিয়া নিশ্চিত জ্ঞানের অভাব হেতু গ্রহণকারীর চৌর্যের অপরাধ হয় না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও কতটুকু অংশ অপরের তাহা জানা নাই বলিয়া কাহারও চৌর্য হয় না[২]।

শূলপাণি এই বিষয়ে অপর একটি উদাহরণও দিয়াছেন। কোন ব্যক্তি একখণ্ড বস্ত্র চুরি করিয়া দেখিতে পাইল তাহার মধ্যে কিছু সোনা বাঁধা আছে। এক্ষেত্রে সোনা সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান ছিল না বলিয়া সে শুধু বস্ত্র অপহরণের অপরাধে দণ্ডনীয় হইবে[৩]।

১ পরস্বত্বেন বিশেষতো জ্ঞায়মানে দ্রব্যে পরানুমতিমন্তরেণ মমেদং যথেষ্টবিনিযোজ্যমিতি কৃত্বা ব্যবহারঃ স্তেয়ম্—প্রা. বি., পৃঃ ১১৫।

২ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কিন্তু, সূক্ষ্মবিচারে, কতক অংশ যে অপরের, অথবা প্রতি অংশে যে প্রত্যেকের স্বত্ব আছে, এই জ্ঞান অস্বীকার করা যায় না।

৩ সূক্ষ্ম বিচার করিলে বলিতে হয় যে, সোনা যখনই সে দেখিতে পাইল তখনই তাহার জ্ঞান হইল যে ইহা অপরের দ্রব্য। সুতরাং, উহা প্রত্যর্পণ না করিলে স্বর্ণাপহারকস্বরূপেও তাহার দণ্ড হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

মহাপাতকের তালিকায় 'স্তেয়' পদটি আছে। কিন্তু, নিবন্ধকারগণের মতে, স্তেয়মাত্রেই মহাপাতক নহে, ব্রাহ্মণের সম্পত্তি স্বরূপ যে স্বর্ণ তাহার অপহরণই শুধু মহাপাতক। ভবদেব ও শূলপাণি নানা প্রমাণ বলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিশিষ্ট পরিমাণের ব্রাহ্মণস্বর্ণহরণই এই পর্যায়ে পড়ে, যে কোন পরিমাণের স্বর্ণ নহে[১]।

ব্রাহ্মণস্বর্ণাপহরণের প্রায়শ্চিত্তসংক্রান্ত বিধিগুলি মোটামুটি এইরূপ:—

জ্ঞানকৃত অপহরণের প্রায়শ্চিত্ত মরণান্তিক। অজ্ঞানকৃত অপহরণের প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশবার্ষিক ব্রত। শূলপাণি বলিয়াছেন যে, প্রায়শ্চিত্তের পূর্বে অপহৃত স্বর্ণ বা তন্মূল্য উহার স্বত্বাধিকারীকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে[২]।

সংসর্গ

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয় ও গুর্বঙ্গনাগমন মহাপাতক। এইরূপ মহাপাতকীর সংসর্গ হইতেও মহাপাতক জন্মে।

পাতকীর সহিত নিম্নলিখিতরূপ সংসর্গ পাপজনক:—

> এক শয্যায় শয়ন, একাসনে উপবেশন, একপংক্তিতে অবস্থান, 'ভাণ্ড' ও 'পক্কান্নে'র মিশ্রণ, পাতকীর জন্য যজ্ঞসম্পাদন, অধ্যাপন, সহভোজন, বৈবাহিক বা যৌনসম্পর্ক, ভাষণ, স্পর্শন, সহযান ইত্যাদি।

কোন কোন রূপ সংসর্গ সদ্য পাতিত্য জন্মায়; আবার কোন কোন সংসর্গ বিশিষ্ট কালসীমার পরে পাতিত্যজনক হইয়া থাকে। প্রথম প্রকারের অন্তর্গত নিম্নলিখিতরূপ সংসর্গ:—

> পাতকীর জন্য যজ্ঞসম্পাদন, পাতকীর সহিত বৈবাহিক বা যৌন সংসর্গ, পাতকীর উপনয়ন, পাতকীর সহভোজন।

নিম্নলিখিতরূপ সংসর্গ একবৎসর কালের জন্য হইলে পাতিত্যজনক হয়:—

> পাতকীর সহিত একপংক্তিতে ভোজন, একাসনে উপবেশন, এক-শয্যায় শয়ন ও সহযান।

১ পরিমিতহেমাপহারো মহাপাতকং ন জাতিমাত্রাপহার ইতি —প্রা. বি., পৃঃ ১১১।

২ প্রায়শ্চিত্তং চাপহৃতদ্রব্যং স্বামিনে দত্ত্বা করণীয়ম্ —প্রা. বি., পৃঃ ১১৭।

সংসর্গপ্রায়শ্চিত্তের সাধারণ নিয়ম এই যে, যে মহাপাতকীর সংসর্গ হইয়াছে তাহার জন্য বিধেয় 'ব্রত' সংসর্গীরও অনুষ্ঠেয়। এখানে 'ব্রত' পদে ভবদেব দ্বাদশবার্ষিক ব্রতই বুঝিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, যদিও জ্ঞানকৃত মহাপাতকের জন্য মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্তের বিধান করা হইয়াছে, তথাপি সংসর্গীর পাপ জ্ঞানকৃত হইলেও দ্বাদশবার্ষিক ব্রতই তাহার করণীয়। অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য সংসর্গীর পক্ষে অর্ধ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে[১]।

দ্রব্যশুদ্ধি

প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে যে নিবন্ধকারগণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র ভবদেব স্বীয় গ্রন্থে দ্রব্যশুদ্ধি সম্বন্ধে পৃথক্ আলোচনা করিয়াছেন।

দ্রব্যসমূহের অশুদ্ধির কারণ বহুবিধ এবং তাহাদের শোধন-প্রণালীও অনেক। সুতরাং, এই সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এখানে লিখিত হইল।

দ্রব্যের নাম	অশুদ্ধির কারণ	শুদ্ধির প্রণালী
ভূমি	নারীর সন্তান-প্রসব, মানুষের মৃত্যু, শবদাহ, মলমূত্র, কুকুর, শূকর, গর্দভ, ও উষ্ট্রের বাস।	খনন, দহন, লেপন, প্রক্ষালন, মেঘের বর্ষণ, মাটি ভরাট, গোচারণ, কালাতিক্রম।
দ্বিজগৃহ	(১) কুকুরের মৃত্যু,	দশরাত্রের অতিক্রম।
	(২) শূদ্রের মৃত্যু,	এক মাসের অতিক্রম।
	(৩) দ্বিজের মৃত্যু,	ত্রিরাত্রাপগম অথবা বহির্ভূমির পক্ষে এক রাত্রির অপগম ও ঐ স্থানের দহন, লেপন বা প্রক্ষালন।

এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, ভবদেবের মতে, উক্ত কালসীমার অতিক্রমের পরেও মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক স্থানটিকে প্রক্ষালিত করা প্রয়োজন।

১ সদ্যো বা সংবৎসরেণ বা সংসর্গে যত্র মহাপাতকিত্বং তত্র জ্ঞানতো দ্বাদশবার্ষিকমজ্ঞানতস্তদর্ধম্। প্রা. প্র., পৃঃ ১০৬।

	(৪) গৃহাভ্যন্তরে কোন ব্যক্তির মৃত্যু[১]।	মৃদ্ভাণ্ড ও পক্বান্নের বর্জন, গোময়োপলেপন, ব্রাহ্মণ কর্তৃক কুশোদক বা স্বর্ণোদক সিঞ্চন।
জল	গন্ধদ্রব্য, বর্ণ ও রসের মিশ্রণ।	এইরূপ জলের শোধনোপায় নাই। কিন্তু, বলা হইয়াছে যে, 'অক্ষোভ্য'[২] 'প্রভূত'[৩] জল কোন কারণেই অশুদ্ধ হয় না। বাসি জল বর্জনীয়।

বিভিন্ন প্রকার পাত্র সম্বন্ধে সাধারণ শুদ্ধিপ্রণালী এইরূপ। 'অব্জ' বা শঙ্খ, স্বর্ণ, মণি, মুক্তা, প্রবাল ও রৌপ্যনির্মিত পাত্র জলের দ্বারা শুদ্ধ হয়। কাংস্য পাত্র ও তাম্রভাণ্ডের শোধন হয় যথাক্রমে ভস্ম এবং 'অম্লাম্ব'[৪] দ্বারা। 'সিদ্ধার্থকল্ক'[৫] দ্বারা শৃঙ্গ ও পশুদন্তনির্মিত পাত্র শুদ্ধ হয়। কাষ্ঠনির্মিত দ্রব্য অত্যন্ত অশুদ্ধ হইলে উহা মৃত্তিকা, জল ও 'তক্ষণ'[৬] দ্বারা শুদ্ধ হয়। মৃদ্ভাণ্ড দহনের দ্বারা শোধিত হইতে পারে; কিন্তু মূত্রাদি দ্বারা অশুদ্ধ মৃদ্ভাণ্ড পরিত্যাজ্য।

বিভিন্ন ভাণ্ড সম্বন্ধে বিশেষ নিয়মগুলি নিম্নলিখিতরূপ।

কাংস্যপাত্র	(১) গাভীকর্তৃক আঘ্রাণ, শূদ্রের ভোজন, কুকুর ও কাকাদি কর্তৃক দূষণ।	দশবিধ ক্ষারের প্রয়োগ।
	(২) সুরা, মল ও মূত্রের সংস্পর্শ।	অগ্নিতাপ ও 'লিখন'[৭]।

১ আধুনিক যুগেও কোন কোন হিন্দুগৃহে গৃহাভ্যন্তরে মৃত্যু অতিশয় অশুভজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, গৃহাভ্যন্তরে মৃত ব্যক্তির আত্মা গৃহের চতুঃসীমায় আবদ্ধ হওয়ায় ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না।

২, ৩ এই দুইটি শব্দ হইতে এই প্রকার জলের গভীরতা বা পরিমাণ স্পষ্ট বুঝা যায় না।

৪ টক জল।

৫ শ্বেতসর্ষপের লেই (paste)।

৬ চাঁচা।

৭ মাজা।

'তৈজস'[১] পাত্র	(১) দীর্ঘকাল মল, মূত্র, শুক্র ও শোণিতের সংস্পর্শ।	অগ্নিতাপ।
	(২) উক্ত দ্রব্যগুলির সহিত অল্পকালের সংস্পর্শ।	মার্জন অথবা সপ্তরাত্র গোমূত্রে রক্ষণ।
বস্ত্র	সাধারণ অশুদ্ধির কারণ বিশেষভাবে লিখিত হয় নাই।	প্রোক্ষণ, প্রক্ষালন, সূর্যালোকে স্থাপন।

বস্ত্র সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য এই যে, ক্ষৌম বা উর্ণনির্মিত অপেক্ষাকৃত মূল্যবান্ বস্ত্রের শোধন 'অল্পশৌচে'র দ্বারাই বিহিত হইয়াছে। বাংলাদেশে অদ্যাবধি মূল্যবান্ বস্ত্রের শোধনপ্রণালী সাধারণ বস্ত্রের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। সম্ভবতঃ বিস্তারিত শোধনোপায়ে বহুমূল্য বস্ত্রের নাশের আশঙ্কাই এই সকল শোধনপদ্ধতির মূল কারণ।

বস্ত্রের সর্বাপেক্ষা অধিক অশুদ্ধির কারণ মল, মূত্র, শুক্র, শোণিত প্রভৃতির সংস্পর্শ। এইরূপ ক্ষেত্রে মৃত্তিকা ও জল শোধক বলিয়া পরিগণিত হয়।

'আমমাংস' ও ঘৃত অন্ত্যজ-স্পৃষ্ট হইলেও অশুদ্ধ হয় না। মানুষের নিকট নিজের শয্যা, ভার্যা, সন্তান, বস্ত্র, উপবীত, কমণ্ডলু সর্বদাই শুদ্ধ; কিন্তু অপরের নিকট এই সমস্ত দ্রব্য কারণবিশেষে অশুদ্ধ হইতে পারে। অশুদ্ধ স্থানে জাত বৃক্ষের পত্র, পুষ্প ও ফল অশুদ্ধ বলিয়া গণ্য হয় না।

প্রায়শ্চিত্তমূলক ব্রত

যে সমস্ত ব্রতের উদ্দেশ্য প্রায়শ্চিত্ত বা পাপক্ষয়, উহাদের সংখ্যা ও সংজ্ঞা গ্রন্থভেদে বিভিন্ন। বর্তমান প্রসঙ্গে প্রধান প্রধান প্রায়শ্চিত্তমূলক ব্রত ও উহাদের মোটামুটি লক্ষণ লিখিত হইল।

ব্রতের নাম	লক্ষণ
অতিকৃচ্ছ্র	যাজ্ঞবল্ক্যের মতে—প্রাজাপত্যের অনুরূপ; প্রভেদ শুধু এই যে, ইহাতে হাতে যেটুকু অন্ন ধরে সেটুকু মাত্র ভক্ষণ করিতে হইবে। এইরূপ নয়দিন করিয়া তিন দিন উপবাস।

[১] অর্থাৎ, ধাতুনির্মিত ভাণ্ড।

মনুর মতে—প্রাজাপত্যের ন্যায়; পার্থক্য শুধু এই যে, ইহাতে প্রতিবার ভোজনকালে এক গ্রাস মাত্র ভোজ্য গ্রহণ করিতে হইবে—এইরূপ নয়দিন, পরের তিনদিন উপবাস।

চ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র — বশিষ্ঠমতে—হাতে যে পরিমাণ জল ধরে মাত্র সেটুকু একবার পান করিতে হইবে—নয়দিন এই রূপ করিয়া তৎপর একাদিক্রমে তিনদিন উপবাস।
যাজ্ঞবল্ক্যমতে—একুশ দিন কেবল জল পান।

চান্দ্রায়ণ — মনুমতে—কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদে পঞ্চদশ গ্রাস আহার করিয়া তৎপর অমাবস্যা পর্যন্ত প্রতিদিন এক গ্রাস করিয়া খাদ্যহ্রাস এবং শুক্লপক্ষের প্রতিপদে এক গ্রাস বৃদ্ধি করিয়া দুই গ্রাস ও এইরূপে প্রতিদিন এক এক গ্রাস বৃদ্ধি করিয়া পূর্ণিমাতে উপবাস।

তপ্তকৃচ্ছ্র — যাজ্ঞবল্ক্যমতে—তপ্তজল, তপ্তদুগ্ধ, তপ্তঘৃত, উত্তপ্ত দুগ্ধের বাষ্প—ইহাদের প্রত্যেকটি দ্রব্য তিন দিন করিয়া গ্রহণ।

দ্বাদশবার্ষিক ব্রত — মনুমতে—বনে কুটীব নির্মাণ করিযা নরকপাল গ্রহণ পূর্বক ভিক্ষোপজীবী হইয়া দ্বাদশ বৎসর বাস।

পরাক — মনুমতে—দশ দিন উপবাস।

প্রাজাপত্য — মনুমতে—তিন দিন শুধু প্রাতে, পরের তিন দিন শুধু সন্ধ্যায়, তৎপর তিন সম্পূর্ণদিন 'অযাচিতাশী' থাকা এবং তাহার পরের তিন দিন উপবাস।

বৃদ্ধকৃচ্ছ্র — ইহা কৃচ্ছ্রের প্রকারভেদ।

ব্রহ্মকূর্চব্রত — জাবালমতে—একদিন এক রাত্রি, বিশেষতঃ পূর্ণিমাতিথিতে, উপবাস ও তৎপরদিবস প্রাতে পঞ্চগব্য ভক্ষণ।

মহাসান্তপন	যাজ্ঞবল্ক্যমতে—সান্তপনের ন্যায়। প্রভেদ শুধু এই যে, ইহাতে সান্তপনে বিহিত দ্রব্যগুলির এক একটি ক্রমে এক এক দিনে গ্রহণ করিতে হইবে এবং সপ্তম দিনে উপবাস।
শিশুকৃচ্ছ্র	মনুমতে—পর পর এক এক দিন নিম্নলিখিতরূপে খাদ্যগ্রহণ:—শুধু প্রাতে, শুধু সন্ধ্যায়, শুধু অযাচিত ভোজ্য, বায়ু[১]।
সান্তপন	যাজ্ঞবল্ক্যমতে—নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি একদিন ভক্ষণ করিয়া পরদিবসে উপবাস:—কুশোদক, গোদুগ্ধ, দধি, গোময়, গোমূত্র, ঘৃত।
সৌম্যকৃচ্ছ্র	যাজ্ঞবল্ক্যমতে—ক্রমশঃ এক একদিন নিম্নলিখিত দ্রব্য গ্রহণ ও তৎপর একদিন উপবাস:—পিণ্যাক বা খৈল, ফেন, 'তক্র', জল, 'শক্তু'।

নানা কারণে উক্ত ব্রতগুলির অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয় না বলিয়া নিবন্ধগুলিতে 'ধেনুসঙ্কলন' অর্থাৎ ব্রতের পরিবর্তে ব্রাহ্মণকে ধেনুদানের ব্যবস্থা আছে। ব্রতভেদে দেয় ধেনুব সংখ্যাও বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে।

(গ) ব্যবহার

স্মৃতিশাস্ত্রে 'ব্যবহার' পদটি মানুষের পরস্পরের প্রতি আচরণ, বিবাদ, বিচারপদ্ধতি, আইনকানুন সংক্রান্ত ব্যাপারে যোগদান করিবার যোগ্যতা প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে[২]। এখানে বিবাদ এবং বিচারপদ্ধতি

১ শূলপাণির মতে, ইহার অর্থ 'আবর্তিতদুগ্ধবাষ্প', অর্থাৎ দুগ্ধ যখন ফুটানো হয় তখন উহা হইতে যে বাষ্প উত্থিত হয়।

২ হি. ধ., ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৭।

(judicial procedure) অর্থেই এই শব্দটির প্রয়োগ করা হইয়াছে। বিচারপদ্ধতিরূপ অর্থটি কাত্যায়নের নিম্নোদ্ধৃত বচন[১] হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় :—

বি নানার্থেঽব সন্দেহে হরণং হার উচ্যতে।
নানাসন্দেহহরণাদ্ ব্যবহার ইতি স্মৃতঃ॥

ইহার মর্ম এই যে, যাহা নানা সন্দেহ নিরসন করে তাহা ব্যবহার। বিচারেই বিবাদের সন্দিগ্ধ বিষয়ের মীমাংসা হয় বলিয়া বিচার-পদ্ধতির নাম ব্যবহার।

ব্যবহারবিষয়ক গ্রন্থাবলী

বাংলাদেশের ব্যবহারবিষয়ক স্মৃতিনিবন্ধগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রধান :—

(১) জীমূতবাহনের 'ব্যবহারমাতৃকা',
(২) জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ',
(৩) রঘুনন্দনের 'দিব্যতত্ত্ব'।

ব্যবহার বিষয়ে অন্যান্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে রঘুনন্দনের 'দায়তত্ত্ব'[২] ও 'ব্যবহারতত্ত্ব'[৩], শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের 'দায়ক্রমসংগ্রহ'[৪] এবং শ্রীকর ভট্টাচার্যের 'দায়নির্ণয়' উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী কালের এই গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে কোলব্রুক্ (Colebrooke) যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন যে, এইগুলি জীমূতবাহনের ও রঘুনন্দনের গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্তসার ছাড়া আর বিশেষ কিছুই নহে[৫]।

উক্ত প্রধান গ্রন্থগুলির আলোচ্য বিষয় আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। বিষয়গুলিকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা— ১। বিচারপদ্ধতি, ২। দিব্য, ৩। দায়বিভাগ।

১ ব্যবহারমাতৃকা, পৃঃ ২৮৩।
২ স্মৃ. ত., ২, পৃঃ ১৬১-১৯৭।
৩ ঐ, পৃঃ ১৯৭-২৩৭।
৪ 'দায়ভাগে'র সহিত নীলকমল বিদ্যানিধিকর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।
৫ 'মিতাক্ষরা' ও 'দায়ভাগের' কোলব্রুক্-কৃত ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকা, পৃঃ ৭।

১। বিচারপদ্ধতি

জীমূতবাহনের 'ব্যবহারমাতৃকা'য় বিচারপদ্ধতি বিস্তীর্ণ। সমস্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে নিম্নলিখিতরূপে ভাগ করিয়া লওয়া যায়:—

সাধারণ কথা, ভাষা, উত্তর, ক্রিয়া, নির্ণয়।

বিবাদপদ সাধারণ কথা

নারদের প্রমাণ অনুযায়ী জীমূতবাহন নিম্নলিখিত অষ্টাদশটি বিবাদপদ বা বিবাদের বিষয় স্থির করিয়াছেন:—

ঋণাদান অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ না করা, উপনিধি বা কাহারও নিকট গচ্ছিত বস্তু, যৌথ ব্যবসায়, 'দত্তস্য পুনরাদানম্' বা কোন বস্তু দান করিয়া ফিরাইয়া নেওয়া, 'অভ্যুপেত্যাশুশ্রূষা' অর্থাৎ সেবার অঙ্গীকার করিয়া সেবা না করা, বেতন না দেওয়া, কোন বস্তুর স্বামী ভিন্ন অপর ব্যক্তি কর্তৃক উহার বিক্রয়, বস্তু বিক্রয় করিয়া না দেওয়া, বস্তু-ক্রয়ের পর তৎসম্বন্ধে অসন্তোষ, চুক্তিভঙ্গ, ক্ষেত্রসংক্রান্ত কলহ, নর-নারীর অবৈধ সম্বন্ধ, পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ, 'সাহস'[১], বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, দ্যূত, বিবিধ।

উক্ত বিবাদপদগুলিকে জীমূতবাহন দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা— 'ধনমূল' ও 'হিংসামূল'।

স্মৃত্যাচারব্যপেতেন মার্গেণাধর্ষিতঃ পরৈঃ।
আবেদয়তি চেদ্রাজ্ঞে ব্যবহারপদংহি তৎ॥

'যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি'র (ব্যবহারাধ্যায়—১।৫) উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া জীমূতবাহন বলিয়াছেন যে, স্মৃতির নিয়ম ও প্রচলিত আচারের প্রতিকূলে যদি কেহ অপরের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া রাজার নিকট প্রতিকারের জন্য আবেদন করে, তাহা হইলে উহা বিচারের বিষয় হইয়া থাকে। শ্লোকে 'আবেদয়তি' পদ হইতে জীমূতবাহন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিচারের কোন বিষয় রাজা নিজে উত্থাপন করিবেন না।

১ গ্রন্থান্তে শব্দকোষ দ্রষ্টব্য।

রাজার কর্তব্য

বিচারক, সভ্য, মন্ত্রী, পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণসমভিব্যাহারে রাজা স্বয়ং লক্ষ্য রাখিবেন যেন বিচার পক্ষপাত বা হিংসাদি দ্বারা দূষিত না হয়। রাজা শ্রুতি ও স্মৃতিবিরোধী কোন কাজ করিবেন না এবং শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ বিচার বর্জন করিবেন। নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া রাজা বিচারের পরিদর্শন নিজে করিতে না পারিলে প্রতিনিধিস্বরূপ নিম্নলিখিত গুণবিশিষ্ট একজন ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিবেন :—

বেদজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, উচ্চকুলজাত, পক্ষপাতহীন, শান্ত, স্থির, পরলোকে বিশ্বাসী, ধার্মিক, পরিশ্রমী, ক্রোধহীন।

উক্ত গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকেও রাজা প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারেন, কিন্তু, শূদ্র কখনও এই কার্যে নিযুক্ত হইতে পারে না। একটি প্রমাণবলে রঘুনন্দন বলিয়াছেন[১] যে, এই কার্যে বরং একজন 'দুঃশীল দ্বিজ'ও নিযুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু 'বিজিতেন্দ্রিয় শূদ্র' পারে না।

সভা ও সভ্য

বিচার-সভার[২] সভ্যের নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকা আবশ্যক :—

স্থির, ধর্ম- ও অর্থ-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, অপক্ষপাতী। সভ্যসংখ্যা হইবে সাত, পাঁচ বা তিন। সভ্য অন্যায় মন্তব্য করিলে, উৎকোচগ্রাহী হইলে এবং বঞ্চক হইলে নির্বাসনযোগ্য হইবেন। উৎকোচাসক্ত সভ্যকে সর্বস্ব-বঞ্চিত করা উচিত। বিচার শেষ হইবার পূর্বে সভ্য গোপনে বাদী কিম্বা প্রতিবাদীর সঙ্গে কথা বলিলে দণ্ডনীয় হইবেন।

১ স্মৃ. ত., ২. পৃঃ ১৯৮

২ জীমূতবাহন বলিয়াছেন :—
ভাঃ দীপ্তিঃ প্রকাশো জ্ঞানমিতি যাবৎ, তয়া সহ বর্ততে যা ভূমিঃ সা সভা। বিদ্বদধিষ্ঠানেন হি ভূমিরপি প্রকাশসহিতেতি ব্যপদিশ্যতে। ব্য. মা., পৃঃ ২৮০।
'সভা' পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে যাহা ভা বা দীপ্তির সহিত বর্তমান। বিদ্বান ব্যক্তি-গণের উপস্থিতিতে ভূমিও প্রদীপ্ত হয় বলিয়া সভার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে।

প্রাড্‌বিবাক

কাত্যায়নের প্রমাণবলে জীমূতবাহন বলিয়াছেন যে, নিম্নলিখিত শব্দ দুইটি হইতে 'প্রাড্‌বিবাক' পদটি গঠিত হইয়াছে—

(১) প্রাট্—যিনি বিচার্য বিষয় সম্বন্ধে (বাদী বা প্রতিবাদীকে) প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন।

(২) বিবাক—যিনি সত্যাসত্যের বিচারপূর্বক নিজের মত এমনভাবে প্রকাশ করেন যাহাতে বাদীর জয় বা পরাজয় হইয়া থাকে।

সুতরাং, 'প্রাড্‌বিবাক' শব্দে বিচারপতিকে বুঝায়; তিনি বাদী প্রতিবাদীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সত্যাসত্যের বিচারপূর্বক স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

বিচার সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বিচারপতি গোপনে বাদীর সঙ্গে কথা বলিলে দণ্ডনীয় হইবেন।

ব্যবহারের প্রকারভেদ

'সোত্তর' ও 'অনুত্তর' ভেদে ব্যবহারকে দ্বিবিধ বলা হইয়াছে। কোন কোন বিবাদে, ভাষা লিখিত হওয়ার পূর্বে, বিবদমান ব্যক্তিরা এই সর্তে বাজী রাখে যে, পরাজিত ব্যক্তি জয়ী ব্যক্তিকে বাজীর বস্তু হইতে একশতটি বেশী বস্তু দিবে; এইরূপ বিবাদকে 'সোত্তর' বিবাদ বলা হয়[১]। অপর প্রকার বিবাদের নাম 'অনুত্তর'।

বিচারে অনুসরণীয় মূল নীতি

বিচারে ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র এই উভয়রূপ শাস্ত্রই অনুসরণীয়। ঐ দুই শাস্ত্রের কোনরূপ বিরোধ দেখা গেলে অর্থশাস্ত্র অপেক্ষা ধর্মশাস্ত্রই অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। ধর্মশাস্ত্রের বচনসমূহের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে 'যুক্তি'ই মান্য। এখানে 'যুক্তি' পদের অর্থ লোকব্যবহার[২]।

১ ব্যবহারমাতৃকা, পৃঃ ২৮৩।

২ ইহার সহিত Privy Council-এর বিচারপতিগণের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি তুলনীয়: "Clear proof of usage will outweigh the written text of the law". Mulla: Principles of Hindu Law, p. 10.

যোগ্য বিচারক

রাজাকর্তৃক নিযুক্ত প্রাড্‌বিবাক ছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বিচারক হওয়ার যোগ্য। কখনও কখনও 'কুল', 'শ্রেণী' এবং 'গণ'ও বিচারকার্য করিতে পারেন। বাদী ও প্রতিবাদীর নিজ নিজ পরিবারভুক্ত লোককে কুল শব্দে বুঝান হয়। শিল্পিবণিগাদি সমূহের নাম শ্রেণী। গণ শব্দে বুঝায় 'বিপ্রাদিসমূহকে'। কুল অপেক্ষা শ্রেণীর এবং শ্রেণী অপেক্ষা গণের প্রাধান্য অধিকতর। প্রাড্‌বিবাক সর্বোচ্চ বিচারক। কাহারও বিচারে পরাজিত ব্যক্তি উচ্চতর বিচারকের নিকট পুনর্বিচারের প্রার্থনা করিতে পাবে। রাজার বিচারের বিরুদ্ধে পুনর্বিচারের আবেদন অগ্রাহ্য।

বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকের বিচার

'কৃষীবল'[১], 'কারুক'[২], 'মল্ল'[৩], 'কুসীদ'[৪], 'শ্রেণী'[৫], 'বর্তক'[৬] ও 'লিঙ্গী'[৭] প্রভৃতির বিচার রাজা তত্তদ্‌বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা করাইবেন।

বিচারের জন্য অগ্রাহ্য ব্যাপার

গুরু-শিষ্য, পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী ও প্রভু-ভৃত্যের বিবাদে বিচারের ভার নেওয়া নিষিদ্ধ। জীমূতবাহন কিন্তু স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, এই নিষেধ 'অল্পাপরাধবিষয়ে'ই কেবল প্রযোজ্য। এইরূপ বিবাদে গুরুতর অপরাধ দেখা গেলে বিচার অবশ্যকরণীয়। এইরূপ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিতরূপ অপরাধ অতি গুরুতর :—

শিষ্যের প্রতি গুরুর অন্যায়রূপে শাস্তিবিধান, কামাতুর পিতা কর্তৃক সমস্ত সম্পত্তি বেশ্যা প্রভৃতিকে দান, পিতার একমাত্র পুত্রকে বিক্রয়

১ কৃষক।
২ শিল্পী।
৩ কুস্তিগিরি যাহাদের পেশা।
৪ সুদে টাকা খাটান যাহাদের পেশা।
৫ সমরূপ ব্যবসায় যাহারা করে তাহাদের সঙ্ঘ।
৬ অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায় না।
৭ যাঁহারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। (দ্রঃ 'দায়ভাগ', জীবানন্দ-সম্পাদিত, পৃঃ ১০২।

বা দান করিবার সঙ্কল্প, স্বামী কর্তৃক পতিব্রতা পত্নীকে বিক্রয়ের ইচ্ছা, প্রভু কর্তৃক বিশ্বস্ত ভৃত্যকে বিক্রয়ের সঙ্কল্প।

কোন স্ত্রীলোকের স্বামী, পিতা, পুত্র অথবা ভ্রাতা যদি তাঁহার স্ত্রীধন আত্মসাৎ করিতে চাহে, তাহা হইলে তাঁহারা দণ্ডনীয় হইবেন।

স্ত্রীলোক, পুত্র, ভৃত্য অথবা শিশু কোন অভিযোগ করিলে উহা অগ্রাহ্য হইবে; কারণ, তাহারা 'অস্বতন্ত্র' অর্থাৎ নিজেদের কর্তা নিজেরা নহে। স্বতন্ত্র হইলেও, বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তির অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না। বিশেষ বিশেষ স্থলে অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে। যেমন, পিতার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার দ্রব্যসমূহ কোন ব্যক্তি বিক্রয় করিতে চেষ্টা করিলে পুত্রের অভিযোগ গ্রাহ্য। পিতার অনুমতিক্রমে অবশ্য পুত্র সর্বদাই অভিযোগ উপস্থাপিত করিতে পারে।

বিচারে পরিহার্য কর্ম

বিচারালয়ে নিম্নলিখিত কার্যগুলি বাদীর পক্ষে নিষিদ্ধ :—

> কোন অস্ত্র ধারণ করা, উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ না করা, মুক্তকচ্ছ থাকা, উপবিষ্ট থাকা, বাম হস্তে 'ভাষা' ধারণ করা।

শমনজারীর নিয়ম

বিচারে বিবাদী রাজমুদ্রা (seal)-যুক্ত পত্র বা আহ্বায়ক দ্বারা আহূত হইবে। এইরূপ আহ্বানের পরে সে উপস্থিত না হইলে দণ্ডনীয় হইবে। বিচারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপস্থিত না হওয়ার অধিকার আছে; ইহাদের পক্ষে 'আসেধ'ও[১] প্রযোজ্য নহে :—

> বিবাহকার্যে রত, পীড়িত, যজ্ঞকর্মে উদ্যত, বিপন্ন, অপর ব্যক্তি কর্তৃক অভিযুক্ত, রাজকার্যে উদ্যত, গোষ্ঠস্থ গোপালক, শস্য-ক্ষেত্রস্থ কৃষক, শিল্পকার্যরত শিল্পী, যুদ্ধরত সশস্ত্র ব্যক্তি, ষোড়শ বর্ষ বয়স পর্যন্ত বালক, দূত, দানরত, ব্রতের সঙ্কল্পকারী ইত্যাদি।

১ বিচারের ফলে আটক রাখা (legal restraint)।

বিচারে প্রতিনিধি

বাদী কিম্বা বিবাদী নিম্নলিখিতরূপ হইলে বিচারে তাহাদের প্রতিনিধি থাকিতে পারে :-

জড়বুদ্ধি, উন্মাদ, বৃদ্ধ, পীড়িত, স্ত্রীলোক। কিন্তু, ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয় এবং গুর্বঙ্গনাগমন—এই চারিটি মহাপাতকে কাহারও প্রতিনিধি চলে না।

বিবদমান ব্যক্তিগণের দ্বারা নিযুক্ত না হইয়া তাহাদের পক্ষে বিচারে কেহ অংশ গ্রহণ করিলে সে দণ্ডনীয় হইবে।

প্রতিভূসংক্রান্ত নিয়ম

বিচারে উভয় পক্ষের প্রতিভূকেই রাজা স্বীকার করিবেন। জীমূতবাহন বলিয়াছেন যে, বাদীরও প্রতিভূ থাকা আবশ্যক ; কারণ, পরাজিত হইলে বাদীও পলায়ন করিতে পারে।

বাদীর প্রকারভেদ

বাদী প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। যথা—

(১) ধনার্থী—যে ধন সংক্রান্ত ব্যাপারে বিচারপ্রার্থী।

(২) সম্মানার্থী—যে বিচারে সম্মান ফিরিয়া পাওয়ার প্রার্থী।

বিচারে সময়দান

কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাদীকে সময় দেওয়া যাইতে পারে। সাধারণতঃ সময়ের প্রার্থনা করা মাত্র বাদী বিচারে পরাজিত বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু, দৈবক্রমে বা রাজার কোন কার্যের জন্য বাদীর কালক্ষেপ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তাহাকে উপযুক্ত সময় দেওয়া হইবে।

ভাষা (Plaint)

অভিযোগ দ্বিবিধ—শঙ্কাভিযোগ ও তত্ত্বাভিযোগ। প্রথম প্রকারের অভিযোগ শঙ্কা বা সন্দেহের উপর প্রতিষ্ঠিত ; যেমন, চোরের সংসর্গে থাকে বলিয়া কোন ব্যক্তিকে চোর সন্দেহে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ। তত্ত্বাভিযোগ প্রকৃত

ঘটনার ভিত্তিতে হইয়া থাকে ; যেমন, অপরিশোধিত ঋণের জন্য অধমর্ণের বিরুদ্ধে উত্তমর্ণের অভিযোগ।

অভিযোগ যখন বিচারার্থে বিচারালয়ে যথাবিধি উপস্থাপিত হয় তখন তাহাকে বলা হয় পূর্বপক্ষ (বা শুধু পক্ষ), প্রতিজ্ঞা, বাদ বা ভাষা।

ভাষা বিধিবদ্ধ হইতে হইলে উহা প্রধানতঃ নিম্নলিখিতরূপ হওয়া আবশ্যক :—(১) সাধ্য—প্রমাণযোগ্য,

(২) স্বল্পাক্ষর-প্রভূতার্থ—অল্পকথায় লিখিত, কিন্তু বহু অর্থযুক্ত,

(৩) অসন্দিগ্ধ,

(৪) নিরাকুল—যাহা বিভ্রমজনক নহে,

(৫) বিরুদ্ধকারণমুক্ত।

জীমূতবাহন বলিয়াছেন যে, ভাষা একবার উপস্থাপিত হইলে উহাতে পরিবর্তন বা অন্য প্রকার অভিযোগ লিখিত হইতে পারে না। ভাষাতে সাধারণতঃ এইরূপ পরিবর্তন লোকে করিতে চাহে :—

প্রথমে লিখিত হইল যে মহিষ অপহৃত হইয়াছে, পরে বলা হইল বৃষ অপহৃত হইয়াছে, মহিষ নহে।

অথবা

প্রথমে লিখিত হইল, বাদীর স্ত্রী অপহৃতা হইয়াছে, পরে বলা হইল তিনি অপহৃতা হন নাই, অন্যায়রূপে রুদ্ধা হইয়াছেন।

ভাষাতে একরূপ অভিযোগ লিখিয়া নিম্নলিখিত ভাবে বিভিন্নরূপ অভিযোগ কেহ লিখিতে ইচ্ছা করিতে পারে :—

প্রথমে লিখিত হইল, বিবাদী আমার গচ্ছিত স্বর্ণ প্রত্যর্পণ করুক ; পরে লিখিত হইল—স্বর্ণের দরকার নাই, অন্তঃপুর হইতে বিবাদী আমার স্ত্রীকে কেন অপহরণ করিল ?

জীমূতবাহন বলিয়াছেন যে, ভাষাতে অভিযোগের আমূল পরিবর্তন না চলিলেও একই অভিযোগের আনুষঙ্গিক অন্য অভিযোগ পরে লিখিত হইতে পারে। যেমন, প্রথমে লিখিত হইল যে, ক খ-এর ঋণ শোধ করে না ; পরে লিখিত হইল যে, খ ঋণ পরিশোধের কথা বলায় ক তাহাকে পাদপ্রহার করিয়াছে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকিবে[১] :—

(১) 'বেলা'—ঘটনার বৎসর, মাস, পক্ষ, তিথি ও ঠিক কাল,

(২) 'বিষয়'—বাদী-বিবাদীর বাসস্থান,

(৩) বাদী-বিবাদীর নাম, বর্ণ, বয়স ও অন্যান্য বিবরণ,

(৪) প্রমাণের জন্য যে সকল দলিলপত্র ব্যবহৃত হইবে তাহাদের পরিচয়,

(৫) যে অর্থ সম্বন্ধে বিবাদ তাহার পরিমাণ,

(৬) অভিযোগ।

বিবাদী উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত ভাষাতে অনুমোদিত রূপে পরিবর্তন করা যাইতে পারে।

পক্ষাভাস

ভাষাতে কতকগুলি দোষ থাকিলে উহাকে বলা হয় পক্ষাভাস এবং উহা বিচারালয়ে গ্রাহ্য হয় না। ঐ দোষগুলি এইরূপ[২] :—

(১) অপ্রসিদ্ধ—যাহা কেহ কখনও করিতে পারে না; যেমন, ক খ-এর 'শশবিষাণ'[৩] অপহরণ করিয়াছে।

(২) দোষাভাব—যাহাতে কাহারও ক্ষতি হয় নাই; যেমন, ক-এর গৃহস্থিত প্রদীপে খ-এর গৃহ আলোকিত হইয়াছে।

(৩) নিরর্থ[৪]—যাহাতে বাদীর ক্ষতির পরিমাণ নগণ্য; যেমন, ক খ-এর উদ্দেশ্যে স্মিতহাস্য করিয়াছে।

১ তুলনীয়—Order VII, rule 1, of the Civil Procedure Code (Act V of 1908)।

২ নিম্নের উদাহরণগুলিতে ক বিবাদী ও খ বাদী।

৩ শশকের শৃঙ্গ। ইহা অসম্ভব বস্তু।

৪ তুলনীয় Indian Penal Code-এর ৯৫ ধারা—di minimis non curat lex (the law does not recognise trifles; অর্থাৎ, তুচ্ছ বিষয়কে আইন গ্রাহ্য করে না)।

(৪) নিষ্প্রয়োজন—যাহাতে করণীয় কিছু নাই; যেমন, বলা হইল যে ক গ-কে প্রহার করিয়াছে, অথচ খ বাদী।

(৫) অসাধ্য—যাহা প্রমাণ করা যায় না; যেমন, ক খ-এর প্রতি ক্রূর ভাবে হাস্য করিয়াছে।

(৬) বিরুদ্ধ—স্বতোবিরোধী ব্যাপার; ক মূকব্যক্তি; খ অভিযোগ করিল যে, ক তাহাকে গালাগালি করিয়াছে।

উল্লিখিত দোষগুলি ছাড়াও একটি 'ভাষা'তে অনেকগুলি অভিযোগ থাকিলে সেই 'ভাষা' অগ্রাহ্য[১]।

কোন্ প্রকার বিবাদে রাজা স্বয়ং প্রবৃত্ত হইবেন?

পক্ষ ও পক্ষাভাসের আলোচনা প্রসঙ্গে জীমূতবাহন বলিয়াছেন যে, অষ্টাদশ প্রকার বিবাদের মধ্যে যে কোনরূপ বিবাদ সম্বন্ধেই রাজা অভিযোগ শুনিবেন ও বিচার করিবেন। কিন্তু, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে তিনি স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া বিচার করিবেন[২]:—

(১) শস্যাদির ষষ্ঠাংশের অপহরণ[৩], (২) রাজাজ্ঞার অবমাননা, (৩) ভূগর্ভে প্রাপ্ত ধন, (৪) হত্যা, (৫) নারীহরণ, (৬) চৌর্য, (৭) বিচারে অবরোধের আদেশ লঙ্ঘন।

উক্ত স্থলগুলি ছাড়া অন্যপ্রকার কোন বিবাদে রাজা বা তাঁহার কর্মচারী স্বয়ং প্রবৃত্ত হইবেন না, কোন বাদী অভিযোগ করিলেই শুধু বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন।

এককালীন একাধিক অভিযোগ

কোন একটি বিবাদে একজনের বেশী বাদী হইতে পারে না। আবার, একজন বাদী একই কালে একাধিক অভিযোগ উপস্থাপিত করিতে পারে না।

১ অনেকপদসঙ্কীর্ণঃ পূর্বপক্ষো ন সিধ্যতি—ব্য. মা., পৃঃ ২৯৬।

২ নিম্নলিখিত সমস্ত প্রকার অপরাধই রাজার স্বার্থের ক্ষতিকর অথবা রাজাজ্ঞার অপালন-জনিত।

৩ শস্যাদির ষষ্ঠভাগ প্রাচীনকালে করস্বরূপ রাজার প্রাপ্য ছিল (ম. স্মৃ. ৭।১৩১)।

'ভাষা'র লেখনপদ্ধতি

'পাণ্ডুলেখ' বা খড়িমাটি[১] দ্বারা একটি 'ফলকে' বা ভূমিতে ভাষার একটি খসড়া প্রস্তুত করিতে হইবে। তৎপর, আবশ্যকমত সংশোধন করিয়া উহা পত্রে লিখিতে হইবে।

লেখক বাদী বা বিবাদীর ঈপ্সিত বস্তু বিকৃতভাবে লিখিলে তস্করের ন্যায় দণ্ডনীয় হইবে।

উত্তর (Reply)

সাধারণতঃ বিবাদীর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সে বাদীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উপস্থাপিত করিতে পারে না। কিন্তু, নিম্নলিখিত বিশেষ বিশেষ স্থলে, বিচার চলিতে থাকিলেও, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে :—

(১) দণ্ডপারুষ্য, (২) চৌর্য, (৩) কোন স্ত্রীলোকের সহিত অবৈধ যৌন সম্পর্ক। এই নিয়মটির তাৎপর্য সম্ভবতঃ এই যে, উক্তরূপ স্থলে বিবাদীও বাদীর বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ আনিতে পারে।

সাধারণ নিয়ম এই যে, বিবাদী অভিযোগ শুনিয়া লিখিত উত্তর দিবে। কিন্তু, যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে, উত্তরের জন্য বিবাদীকে একদিন হইতে এক বৎসর কাল পর্যন্ত সময় দেওয়া যাইতে পারে। নিম্নলিখিতরূপ অপরাধের অভিযোগে অবশ্য বিবাদী অতিরিক্ত সময় পাইবে না :—

(১) সাহস অর্থাৎ বিষপ্রয়োগে বা অস্ত্রদ্বারা নরহত্যা[২], (২) চৌর্য,

১ কারণ, কলম দিয়া লিখিলে তাহাতে সংযোজন করা বা কোন অংশ মুছিয়া ফেলা কঠিন।

২ বিষশস্ত্রাদিনিমিত্তং প্রাণব্যাপাদনাদি—যা. স্মৃ. ২।২।১২ শ্লোকের 'মিতাক্ষরা' টীকা।

(৩) পারুষ্য—বাক্‌পারুষ্য অথবা দণ্ডপারুষ্য, (৪-৬) 'গো-অভিশাপ-অত্যয়'[১], (৭) স্ত্রীলোকের প্রতি অন্যায়াচরণ—ইহা দ্বিবিধ হইতে পারে; যথা—

(১) উত্তমকুলজাতা নারীর চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ,

(২) দাসীর প্রভুত্ববিষয়ক বিবাদ।

দৈব বা রাজকীয় কোন ব্যাপারে বিলম্ব ঘটিলে বিবাদীকে প্রদত্ত সময়ের বৃদ্ধি করিতে হইবে। এইরূপ ব্যাপার অবশ্য বিবাদীকে সাক্ষীর সাহায্যে প্রমাণিত করিতে হইবে।

শঠতাবশতঃ উপযুক্ত সময়ের মধ্যে বিবাদী উপস্থিত না হইলে সে পরাজিত ত হইবেই, তাহাকে দণ্ডও ভোগ করিতে হইবে।

জীমূতবাহনের মতে, 'উত্তীর্যতে অভিযোগোঽনেনেতি উত্তরম্'; অর্থাৎ, যাহা দ্বারা অভিযোগ উত্তীর্ণ হওয়া যায় তাহার নাম উত্তর।

নির্দোষ উত্তরে নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা আবশ্যক :—

(১) ভাষায় লিখিত সমস্ত অভিযোগের খণ্ডন, (২) সত্যতা, (৩) অসন্দিগ্ধত্ব, (৪) স্ববিরোধহীনতা, (৫) অব্যাখ্যাগম্যতা অর্থাৎ, অনায়াসবোধ্যতা।

উত্তর নিম্নলিখিতরূপে বিভিন্নপ্রকার হইতে পারে :—

(১) সত্য বা সম্প্রতিপত্তি—যাহাতে বাদীর অভিযোগ বিবাদী স্বীকার করে।

(২) মিথ্যা—যাহাতে মিথ্যার আশ্রয় নিয়া বিবাদী বাদীর অভিযোগ অস্বীকার করে। ইহা চারিপ্রকার হইতে পারে; যথা—অভিযোগটি মিথ্যা, আমি ইহার বিষয় জানি না, যেখানে ব্যাপারটি ঘটিয়াছিল আমি সেখানে ছিলাম না, সেই সময়ে আমার জন্ম হয় নাই।

১ বিজ্ঞানেশ্বরের মতে, মনে হয়, দুগ্ধবতী গাভীর প্রতি অপরাধ, পাতকের অভিযোগ এবং কাহারও ধন বা প্রাণের প্রতি হিংসাত্মক চেষ্টা। শূলপাণির মতে, দুগ্ধবতী বা ভারবাহিনী গাভীর প্রতি অপরাধ, মহাপাতকের অভিযোগ এবং কাহারও কোন দ্রব্য বিনাশের অভিযোগ। (দ্রঃ—'দীপকলিকা'—ঘরপুরের সংস্করণ, পৃঃ ৩৮)।

(৩) প্রত্যবস্কন্দন বা কারণ—এইরূপ উত্তরে, বিবাদী বাদীর অভিযোগ স্বীকার করিয়া মুক্তি পাইবার জন্য একটি কারণ প্রদর্শন করে। যেমন—খ অভিযোগ করিল যে ক তাহার নিকট হইতে টাকা ধার করিয়াছে। ক অভিযোগ মানিয়া লইয়া বলিল যে, সে ঐ টাকা পরিশোধ করিয়াছে।

(৪) পূর্বন্যায় বা প্রাঙ্ন্যায়—ইহাতে বিবাদী প্রমাণ করে যে, পূর্বে ঠি বর্তমান বিবাদের বিষয়ের বিচার হইয়া গিয়াছে[১]।

বৃদ্ধশাতাতপের প্রমাণবলে জীমূতবাহন নিম্নলিখিত অপর দুই প্রকার উত্তরের উল্লেখ করিয়াছেন :—

(১) সংসৃষ্ট—ইহা অংশতঃ মিথ্যা-উত্তর ও অংশতঃ প্রত্যবস্কন্দন-উত্তর। যেমন, খ অভিযোগ করিল যে, তাহার নিজ বাড়ীতে বিশেষ একটি সময়ে দৃষ্ট নিজের গাভীটিকে সম্প্রতি ক-এর বাড়ীতে দেখা যায়, সুতরাং, ক-এর উহা খ-কে ফিরাইয়া দেওয়া উচিত। ক উত্তর দিল যে, খ যে সময়ের কথা বলিয়াছে তাহার বহুকাল পূর্বেই গাভীটি ক্রীত হইয়াছিল এবং তখন হইতে উহা ক-এর বাড়ীতে আছে।

(২) বিপ্রতিপত্তি—ইহাতে বিবাদী বাদী কর্তৃক উপস্থাপিত অভিযোগে বাদীকেই অভিযুক্ত করে। যেমন, যে গাভীটি ক নিয়াছে বলিয়া খ অভিযোগ করে, সেই গাভীটিকেই খ নিয়াছে বলিয়া ক অভিযোগ করে।

জীমূতবাহন কিন্তু শেষোক্ত উত্তর দুইটিকে স্বীকার করেন না; তাঁহার মতে, এই দুইটি 'কারণ' উত্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

রঘুনন্দনের মতে, উত্তর নিম্নলিখিত তিন প্রকার :—

(১) বলবৎ—প্রত্যবস্কন্দন উত্তরের উদাহরণ এখানেও প্রযোজ্য। ইহাতে সত্যতা প্রমাণের ভার থাকে বিবাদীর উপরে।

১ তুলনীয়—Res' Judicata, Civil Procedure Code, Sec. 11

(২) তুল্যবল—খ বলিল যে, একটি জমি সে পূর্বপুরুষের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছে। প্রতিবাদে ক বলিল যে, অনুরূপ প্রকারে সে উহা পাইয়াছে। এখানে সত্যতা প্রমাণের ভার থাকে বাদীর উপরে; তাহার অক্ষমতাপক্ষে প্রমাণের ভার থাকে বিবাদীর উপরে।

(৩) দুর্বল—খ একটি জমি তাহার কুলক্রমাগত বলিয়া দাবী করিল। ক বলিল যে, ঐ জমির স্বত্বাধিকারী সে যেহেতু উহা দশ বৎসর যাবৎ তাহার দখলে আছে। এখানে প্রমাণের ভার বাদীর উপরে।

উত্তরাভাস[১]

নিম্নলিখিত দোষের দ্বারা উত্তর দুষ্ট হইয়া থাকে :—

(১) সন্দিগ্ধ, (২) নিগূঢ় অর্থযুক্ত, (৩) 'আকুল' অর্থাৎ বিভ্রমজনক, (৪) 'ব্যাখ্যাগম্য' অর্থাৎ আয়াসবোধ্য, (৫) 'অসার' অর্থাৎ যাহাতে উপযুক্ত যুক্তি নাই, (৬) 'পক্ষৈকদেশব্যাপী'—যাহা পক্ষের একটি অংশ মাত্রকে খণ্ডন করে।

উক্ত দোষগুলির মধ্যে শেষোক্ত দোষটিই, জীমূতবাহনের মতে, সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। তিনি ইহার উদাহরণ এইরূপে দিয়াছেন :—

খ অভিযোগ করিল যে, ক তাহার নিকট হইতে একশত মুদ্রা ধার করিয়াছে। ক উত্তর দিল যে, সে পঞ্চাশটি মুদ্রা পরিশোধ করিয়াছে। এই উত্তরে ক ঋণ অস্বীকার করিল না, একশত মুদ্রার পরিশোধের কথা স্বীকার বা অস্বীকার করিল না এবং অভিযোগটি সত্য বলিয়াও মানিল না। অতএব, ইহা সম্পূর্ণ অভিযোগের উত্তর হইল না।

'সঙ্কর' নামে অপর একটি দোষেও উত্তর দুষ্ট হইতে পারে। এইরূপ উত্তরে অনেক প্রকার উত্তরের মিশ্রণ হয় বলিয়া ইহার এই নামকরণ হইয়াছে। ইহা তখনই হয় যখন উত্তরটি অভিযোগের একাংশে সত্য হয়, কিন্তু অপরাংশে মিথ্যা এবং কারণ উত্তরের অনুরূপ হয়।

১ দোষযুক্ত অগ্রাহ্য উত্তর।

ক্রিয়া বা প্রমাণ—(Evidence)

বিবাদীর উত্তর দুষ্ট হইলে সেই দোষেই সে পরাজিত হয়, সুতরাং তখন ক্রিয়ার কোন প্রয়োজন হয় না। উত্তর যথাযথ হইলেই প্রমাণের আবশ্যকতা হয়। বাদী ও বিবাদী[১] উভয়কেই নিজ নিজ প্রমাণ দিতে হয়।

প্রমাণের ভার (onus probandi) সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই মনে হয় যে, প্রাঙ্‌ন্যায় ও কারণরূপ উত্তরে ইহা বিবাদীর উপর থাকে। মিথ্যা উত্তরে প্রমাণের দায়িত্ব হয় বাদীর। সম্প্রতিপত্তিরূপ উত্তরে প্রমাণভারের কোন প্রশ্নই উঠে না।

মানুষী ও দৈবী ভেদে ক্রিয়া দ্বিবিধ। মানুষী প্রমাণ নিম্নলিখিত রূপ :—

(১) ভুক্তি, (২) লিখিত, (৩) সাক্ষী, (৪) অনুমান।

দৈব প্রমাণ বলিতে বুঝায় ধট ও ধর্ম প্রভৃতি দিব্যগুলিকে[২]। দৈবী ক্রিয়া অপেক্ষা মানুষী ক্রিয়ার প্রাধান্য বঙ্গীয় লেখকগণ স্বীকার করিয়াছেন। মানুষী ক্রিয়াগুলির মধ্যে আবার উল্লিখিত ক্রমে প্রাবল্য স্বীকৃত হইয়াছে, অর্থাৎ, পূর্ব পূর্বটি পর পর ক্রিয়ার তুলনায় প্রবলতর।

ভুক্তি সম্বন্ধে নানা যুক্তিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া জীমূতবাহন দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। এখানে আমরা শুধু এই সম্বন্ধে প্রধান প্রধান বিষয়গুলি আলোচনা করিব।

১ যা. স্মৃ. ২।১।৭ শ্লোকে প্রযুক্ত 'অর্থী' শব্দের ব্যাখ্যায় জীমূতবাহন বলিয়াছেন—অর্থীতি দ্বয়োরপি গ্রহণং, স্বপক্ষসাধনপরপক্ষনিগ্রহেণার্থিত্বাৎ—ব্য. মা., পৃঃ ৩০৬। অর্থাৎ, স্বপক্ষের সমর্থন ও পরপক্ষের খণ্ডন করিতে হয় বলিয়া 'অর্থী' শব্দে বাদী ও বিবাদী উভয়কেই বুঝায়।

২ পরে দিব্য-প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

লিখিত কোন প্রমাণ না থাকিলেও ভোগ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে, যদি কোন ভূমি কোন ব্যক্তির পিতাসহ তিন পুরুষ নিরবচ্ছিন্নভাবে এবং কাহারও বিনা বাধায়[১] ভোগ করিয়া থাকে। ঐ ভূমি আদিতে অন্যায়ভাবে অর্জিত হইলেও[২] উক্তরূপ ভোগের দ্বারা তাহাতে ভোগকারীর স্বামিত্ব স্বীকৃত হইবে।

সূক্ষ্ম বিচার করিয়া জীমূতবাহন ত্রিপুরুষ ভোগ ও ত্রৈপুরুষিক ভোগ এই দুইটির প্রভেদ দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে, যখন কাহারও প্রপিতামহ, পিতামহ ও পিতা তিনজনই জীবিত থাকিয়া কোন বস্তু ভোগ করেন তখন ত্রিপুরুষ ভোগ হইয়া থাকে। এরূপ ভোগ স্বামিত্বের প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না; কারণ, বঙ্গদেশীয় স্মৃতিকারগণের মতে, পিতার জীবদ্দশায় তাঁহার সম্পত্তিতে পুত্রের কোন অধিকার জন্মে না। সুতরাং, উক্ত স্থলে উক্ত সম্পত্তিতে কেবল প্রপিতামহের স্বামিত্ব আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। রঘুনন্দনেরও এই মত[৩]। জীমূতবাহন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এইরূপ ভোগ ষাট বৎসর ব্যাপী হইলেও স্বামিত্বের প্রমাণ হয় না[৪]। ঐ সম্পত্তিতে উক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে একের মৃত্যুর পর অপরের ভোগ হইলে ত্রৈপুরুষিক ভোগ হইবে এবং উহা স্বামিত্বের প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইবে[৫]।

ত্রৈপুরুষিক ভোগ কিন্তু অন্ততঃ ষাট বৎসর ব্যাপী না হইলে প্রামাণ্য হয় না। সুতরাং, শুধু তিন পুরুষের একের মৃত্যুর পর অপরে ভোগ করিলেই ত্রৈপুরুষিক ভোগ হইবে না। জীমূতবাহন, ব্যাসের প্রমাণবলে, এক পুরুষের ভোগ অন্ততঃ বিশ বৎসর ব্যাপী বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন।[৬]

১ শক্তস্য সন্নিহিতস্য বিরোধং বিনা—ব্য. মা., পৃঃ ৩৪১।

২ অন্যায়েনাপি যদ্ভুক্তম্—ঐ, পৃঃ ৩৪১।

৩ স্মৃ, ত., ২, পৃঃ ২২৪।

৪ যুগপজ্জীবৎসু ষষ্টিবর্ষভোগেঽপি ন ত্রৈপুরুষিকঃ —ব্য. মা., পৃঃ ৩৪১।

৫ একেন ভাবদ্ভুক্তং, তস্মিন্ মৃতে তৎপুত্রেণ, তয়োশ্চ মৃতয়োস্তৃতীয়েন, তস্মিন্ মৃতে চতুর্থস্য ত্রৈপুরুষিকভোগো ভবতি—ঐ, পৃঃ ৩৪১।

৬ দ্রষ্টব্য—জীমূতবাহনকর্তৃক উদ্ধৃত ব্যাসের শ্লোক, ব্য. মা., পৃঃ ৩৪১।

ইহা হইতে বুঝা যায়, ষাট বৎসরেব ন্যূন কালের মধ্যে উক্ত তিনপুরুষ মৃত হইলে ত্রৈপুরুষিক ভোগ হইবে না। কোন এক পুরুষ বিশ বৎসরেব পূর্বে মৃত হইলেও তিন পুরুষেব মোট ভোগকাল ষাট বৎসব হইলে কোন আপত্তি নাই বলিয়াই মনে হয়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, অন্যায়রূপে অর্জিত সম্পত্তিতেও ত্রৈপুরুষিক ভোগের বলে স্বামিত্ব হইতে পাবে। কিন্তু, অন্যায়রূপে অর্জিত সম্পত্তি ভোগ হেতু নাবদ যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করিয়াছেন[১], তাহার সম্বন্ধে বক্তব্য কি? উত্তবে জীমূতবাহন বলেন যে, ঐ শাস্তিবিধান 'আহর্তৃবিষয়' অর্থাৎ যে ঐরূপ সম্পত্তি অন্যায়ভাবে প্রথম ভোগ কবিতে আবম্ভ করিয়াছিল, তাহাব পক্ষেই প্রযোজ্য, সে যত বৎসবই উহা ভোগ করুক দণ্ডনীয় হইবেই। বঘুনন্দনেব মতে, এই দণ্ডবিধায়ক বচন শুধু স্ত্রীধন ও বাজধন বিষয়ে প্রযোজ্য[২], যত বৎসবেব ভোগই হউক, এই দুই প্রকাব সম্পত্তিতে অন্য কাহাবও অধিকাব জন্মে না।

ত্রৈপুরুষিক ভোগও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না:—

(ক) যে ভোগ কবে সে যদি প্রকৃত অধিকাবীর সপিণ্ড, সকুল্য, সনাভি, বান্ধব বা অপব কোন নিকট আত্মীয় হয়, তাহা হইলে তৎকর্তৃক ভোগ প্রামাণ্য নহে। শ্রোত্রিয়, রাজা বা রাজামাত্য যে ভোগ করে তাহাও স্বামিত্বেব প্রমাণ হয় না। রঘুনন্দনেব মতে, জামাতা কর্তৃক ভোগও প্রামাণ্য নহে।

(খ) যখন সম্পত্তির অধিকারী হয় রোগার্ত, বালক[৩], ভীত,

১ অনাগমং তু—ইত্যাদি। ব্য মা, পৃঃ ৩৪৩।

২ অনাগমমিতি দণ্ডবিধায়কবচনং স্ত্রীধননৃপধনপরম্—স্মৃ ত, পৃঃ ২২৬।

৩ যাহার বয়স ষোল বৎসরের কম। এইরূপ বালককে পোগণ্ড, পৌগণ্ড বা অপৌগণ্ড নামেও অভিহিত করা হয়। এই শব্দগুলির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এইরূপ—পুতোহস্মুৎপন্নশ্মশ্রুর্গণ্ডঃ কপোলো যস্ত; অর্থাৎ যাহার গণ্ডস্থলে শ্মশ্রু জন্মে নাই।

প্রবাসী, স্ত্রী বা দেবতা তখন অপর কর্তৃক কোনরূপ ভোগ তাহার স্বামিত্বের প্রমাণ হয় না। 'শাসনারূঢ়' অর্থাৎ একের রাজদত্ত কোন সম্পত্তিতে অপরের ভোগে কোন অধিকার জন্মে না। রাজা, বৃদ্ধ ও জড়—এইরূপ ব্যক্তির সম্পত্তিতে অপরের ভোগের দ্বারা অধিকার জন্মে না।

(গ) নিম্নলিখিত শ্রেণীর সম্পত্তিতে ভোগের দ্বারা অপরের অধিকার জন্মে না:—

(১) আধি—যাহা গচ্ছিত রাখা হইয়াছে,
(২) সীমা,
(৩) দায়ধন—উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত,
(৪) নিক্ষেপ,
(৫) উপনিধি।

'সম্যক্' অর্থে আ উপসর্গযুক্ত গম্ ধাতু-নিষ্পন্ন 'আগম' শব্দে বুঝায় ক্রয় বা অন্য কোন ন্যায্য প্রকারে প্রাপ্তি।

স্বামিত্বের প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইতে হইলে ভুক্তির নিম্নলিখিত গুণযুক্ত হওয়া আবশ্যক:—

(১) সাগম—ক্রয়াদি ন্যায্য আগমযুক্ত,
(২) দীর্ঘকালব্যাপী,
(৩) নিশ্ছিদ্র—নিরবচ্ছিন্ন,
(৪) অন্যরবোজ্ঝিত—অপরের বাধাহীন,
(৫) প্রত্যর্থিসন্নিধান—বিবাদী বা প্রকৃত অধিকারীর সান্নিধ্যযুক্ত।

ভুক্তিহীন আগম যেমন স্বামিত্বের প্রমাণ হয় না, তেমনই আগমহীন ভোগও অপ্রামাণ্য, অবশ্য ত্রৈপুরুষিক ভোগের ক্ষেত্রে আগমের আবশ্যকতা নাই।

কোন সম্পত্তিতে কাহারও স্বত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিলে 'আহর্তা' অর্থাৎ যে ঐ সম্পত্তি অর্জন করিয়াছে সে 'আগম' প্রমাণিত করিয়া স্বত্বের

প্রমাণ করিবে। তাহার পুত্র বা পৌত্রের সময় স্বত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলে, তাহারা মুখ্যতঃ ভুক্তি প্রমাণিত করিবে, তাহাদের পক্ষে আগম গৌণ[১]। জীমূতবাহন কিন্তু বলিয়াছেন—

সতি সম্ভবে তেষামপ্যাগমশোধনং ভুক্তেরেব সুদৃঢ়সিদ্ধেঃ[২]।

অর্থাৎ, তাহাদের পক্ষেও ভুক্তিকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিপন্ন করিতে হইলে আগমের প্রমাণ আবশ্যক।

সাধারণ নিয়ম[৩] এই যে, স্বত্বাধিকারীর সমক্ষে তাহার বিনা আপত্তিতে তাহার ভূমি যদি কেহ নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ বৎসর ভোগ করে[৪], তাহা হইলে ঐ সম্পত্তিতে শেষোক্ত ব্যক্তির অধিকার জন্মে। অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে দশ বৎসরকাল ঐরূপ ভোগ করিলেই অপরের স্বত্ব জন্মে।

কিন্তু, 'ব্যবহারমাতৃকা'য় উদ্ধৃত[৫] বৃহস্পতিবচনে ঐরূপ ভোগের কাল ত্রিশ বৎসর বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। এই দুইটি বিধির বিরোধ নিরসন-কল্পে জীমূতবাহন বলিয়াছেন যে, স্বত্বাধিকারী কোন আপত্তি না করিলে বিশ বৎসর ভোগই যথেষ্ট। সাধারণ মৌখিক প্রতিবাদ হইলে ত্রিশবৎসরের ভোগ আবশ্যক[৬]। এইরূপ প্রতিবাদের ক্ষেত্রে জীমূতবাহন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে কোন পার্থক্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

১ আগমশোধনমাহর্ত্রা কার্যম্।... পুত্রপৌত্রয়োর্ভুক্তিঃ প্রধানং প্রমাণং, আগমস্তু সহকারী। ব্য. মা., পৃঃ ৩৫২। যা স্মৃ ২।২।২৮ শ্লোকেও অনুরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়, ইহা ব্য মা র ৩৫২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

২ ব্য. মা., পৃঃ ৩৪৩।

৩ পশ্যতোঽব্রুবতো ভূমের্হানির্বিংশতিবার্ষিকী।
পরেণ ভুজ্যমানায়া ধনস্য দশবার্ষিকী॥
যা. স্মৃ ২।২।২৪।

৪ Adverse possession

৫ পৃঃ ৩৪২।

৬ বাঙ্মাত্রেণাবিরোধে বিংশতিবচনং বোদ্ধব্যং, ত্রিংশদবর্ষবচনে...বিবাদঃ কলহাদিরূপঃ, স যত্র নাস্তি, বাচনিকমাত্রস্তু বিদ্যতে তত্রৈব ইত্যবিরোধঃ। ব্য. মা., পৃঃ ৩৪৫।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—ত্রিশ বা বিশ বৎসরের ভোগেই যদি স্বত্ব উৎপাদিত হয়, তাহা হইলে ত্রৈপুরুষিক ভোগের প্রয়োজন কি ? জীমূতবাহন কর্তৃক অনুসৃত শ্রীকরের মতে মনে হয়, স্বত্বাধিকারীর সমক্ষে তাহার সম্পত্তিতে অপরের স্বামিত্বলাভের জন্য উক্তরূপে ত্রিশ বা বিশ বৎসরের ভোগ আবশ্যক। কিন্তু, স্বত্বাধিকারীর পরোক্ষে তাহার সম্পত্তিতে পূর্ণ স্বত্ব অর্জন করিতে ত্রৈপুরুষিক ভোগের প্রয়োজন।

'লিখিত' বা দলিলপত্রকে মোটামুটি তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা :—

(১) রাজলেখ্য বা নৃপশাসন,

(২) স্থানকৃত বা জানপদ,

(৩) স্বহস্তলিখিত বা স্বহস্তক।

রাজলেখ্য নিম্নলিখিত তিন প্রকার হইতে পারে :—

(১) তাম্রপট্ট—ভূমিদান প্রভৃতি সম্বন্ধে রাজাদেশ তামার পাতে লিখিত থাকে।

(২) অন্য প্রকারে লিখিত রাজাজ্ঞা।

(৩) বিচারালয়ে বিচার সংক্রান্ত বিষয় যাহাতে লিখিত আছে।

'স্থানকৃত' সম্ভবতঃ সেই দলিলকে বুঝায়, যাহা কোন সুপরিচিত স্থানে পেশাদার লেখক কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। ইহা সপ্তবিধ ; যথা :—

(১) ভাগলেখ্য—উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির বিভাগ সম্বন্ধে ভ্রাতৃগণ কর্তৃক লিখিত। ইহাকে বিভাগপত্রও বলা হয়।

(২) দানলেখ্য— কাহারও কর্তৃক ভূমিদান সংক্রান্ত দলিল।

(৩) ক্রয়লেখ্য— কাহারও কর্তৃক ক্রীত গৃহ বা ভূমি সম্বন্ধে লিখিত দলিল।

(৪) আধিলেখ্য—কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অপরের নিকট আধি (=রেহান, mortgage) রাখিয়া সম্পাদিত দলিল।

(৫) সংবিৎপত্র—কোন স্থানের অধিবাসিগণ কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিপত্র।

(৬) দাসপত্র— নিরন্ন বা বস্ত্রহীন ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত দাসখত।

(৭) ঋণলেখ্য বা উদ্ধারপত্র—সুদে টাকা ধার নিয়া অধমর্ণ কর্তৃক সম্পাদিত দলিল।

স্থামলেখ্যরূপ দলিলে দলিল-সম্পাদক, লেখক ও সাক্ষীর নিজেদের নাম, নিজ নিজ পিতার নাম ও দলিল-সম্পাদনের বৎসর, মাস, পক্ষ ও দিবস লিখিত থাকিবে।

স্বহস্তলিখিত দলিল তখনই গ্রাহ্য হইবে যখন বলপ্রয়োগের ফলে বা 'উপধি'[১]র প্রস্তাবে উহা লিখিত হয় নাই।

উক্ত তিন প্রকার দলিলের মধ্যে, জীমূতবাহনের মতে, তৃতীয়টির অপেক্ষা দ্বিতীয়টির এবং দ্বিতীয়টির অপেক্ষা প্রথমটির প্রামাণ্য অধিকতর।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক সম্পাদিত দলিল অগ্রাহ্য :—

(১) মুমূর্ষু ব্যক্তি, (২) 'অস্বতন্ত্রবাল' অর্থাৎ নাবালক, (৩) ভয়াতুর ব্যক্তি, (৪) স্ত্রীলোক, (৫) মত্ত ব্যক্তি, (৬) ব্যসনাতুর লোক, (৭) দাস।

কোন দলিলের শুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলি বিচার করিয়া শুদ্ধি-অশুদ্ধি নির্ণীত হইতে পারে :—

(১) যুক্তিপ্রাপ্তি—দলিলে লিখিত বিষয়বস্তুর সহিত উহাতে লিখিত স্থান ও কালের সম্বন্ধের বিচার,

(২) ক্রিয়া— দলিলে লিখিত সাক্ষী,

(৩) চিহ্ন— দলিলে ব্যবহৃত মুদ্রাদি,

(৪) সম্বন্ধ— অর্থাৎ, বাদী ও বিবাদীর মধ্যে দানগ্রহণাদি সম্বন্ধ,

(৫) আগম— দ্রব্যাদি অর্জনের সম্ভাবনা।

এইরূপ সন্দেহস্থলে দলিল-সম্পাদক, লেখক ও সাক্ষীর হস্তলিপির বিচারও আবশ্যক।

সাক্ষী সম্বন্ধে জীমূতবাহন শাস্ত্রীয় নানা প্রকার যুক্তি, প্রতিযুক্তি ও প্রমাণাদির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি মোটামুটিভাবে বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইবে।

১ উপধির অর্থ—ছললোভক্রোধভয়মদাদি। যা. স্মৃ. ২।৬।৮৯ শ্লোকের 'মিতাক্ষরা' টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রত্যক্ষ দর্শনকারী ও শ্রবণকারী ভেদে সাক্ষী প্রধানতঃ দ্বিবিধ। বলা হইয়াছে যে, বাদী ও প্রতিবাদীর সমক্ষে যদি এইরূপ ব্যক্তি কোন ব্যাপার দর্শন ও শ্রবণ করিয়া থাকেন, তবেই শুধু ইঁহার সাক্ষ্য গ্রহণীয় হইবে।

কৃত ও অকৃত ভেদে আবার সাক্ষী দ্বিবিধ। বিবদমান ব্যক্তিগণ কর্তৃক নিযুক্ত সাক্ষী কৃত, অনিযুক্ত ব্যক্তি অকৃত। ইহাদিগকে যথাক্রমে লেখ্যারূঢ় এবং মুক্তক নামেও অভিহিত করা হয়। নিম্নলিখিত সাক্ষিগণ প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত :—

(১) লিখিত— যে কোন দলিলে নিজের নাম সাক্ষীস্বরূপ লেখে,

(২) স্মারিত— যাহার নাম দলিলে লিখিত নাই, কিন্তু যাহাকে ঘটনার কথা মনে করাইয়া দেওয়া হয়,

(৩) যদৃচ্ছাভিজ্ঞ—যে ঘটনার সময় দৈবাৎ উপস্থিত হয় এবং পরে সাক্ষী বলিয়া গৃহীত হয়,

(৪) গূঢ়— যে আত্মগোপন করিয়া বিবদমান ব্যক্তিদের কথাবার্তা শোনে,

(৫) উত্তর— প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর প্রবাসগমনকালে বা মৃত্যুসময়ে তাহার নিকট হইতে যে ঘটনাটি জানিয়া রাখে।

নিম্নলিখিত সাক্ষিগণ 'অকৃত' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত :—

(১) গ্রাম— স্বগ্রামবাসী (?),

(২) প্রাড্‌বিবাক—বিচারপতি,

(৩) রাজা— যখন তিনি বিবদমান ব্যক্তিদেব কথোপকথন স্বকর্ণে শ্রবণ করেন,

(৪) কাযমধ্যগত—বিবদমান ব্যক্তিদেব ব্যাপারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত,

(৫) অর্থিপ্রহিত—একের নিকট হইতে অপরের নিকট প্রেরিত দূত,

(৬) কুল্য বা পরিবারস্থ ব্যক্তি—'ঋকৃথ-বিভাগ' প্রভৃতি কুলবিবাদে এইরূপ সাক্ষী গ্রাহ্য।

'কৃত' শ্রেণীর সাক্ষিগণের মধ্যে 'লিখিত' সাক্ষীর সাক্ষ্য সকল সময়েই গ্রাহ্য। কিন্তু, ঐ শ্রেণীর অপর সাক্ষিগণ শুধু নিম্নলিখিত সময় পর্যন্ত গ্রহণীয় :—

স্মারিত— ঘটনাকালের অষ্টম বর্ষ পর্যন্ত,
যদৃচ্ছাভিজ্ঞ— পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত,
গূঢ়— তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত,
উত্তর— এক বৎসর পর্যন্ত।

বিচারে একজন মাত্র সাক্ষীর সাক্ষ্য অগ্রাহ্য। সাক্ষ্য গ্রহণীয় হইতে হইলে সাক্ষিসংখ্যা হওয়া উচিত নয়, সাত, পাঁচ, চার, তিন বা অন্ততঃ দুই। দুইজন সাক্ষীই শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ হইলে তাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে। জীমূতবাহন বলিয়াছেন যে, উক্ত সংখ্যাগুলির মধ্যে পূর্ব পূর্ব সংখ্যা পর পর সংখ্যার তুলনায় অধিকতর গ্রাহ্য[১]।

কাহারও সাক্ষ্য বিচারে গ্রহণীয় হইতে হইলে তাহার নিম্নলিখিত গুণযুক্ত হওয়া আবশ্যক :—

(১) গৃহী অর্থাৎ কৃতদার, (২) পুত্রী, (৩) বাদী বা প্রতিবাদীর স্বস্থানবাসী, (৪) ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রবর্ণসম্ভূত[২], (৫) বিবদমান ব্যক্তিগণ কর্তৃক নিযুক্ত, (৬) বিশ্বস্ত, (৭) 'সর্বধর্মাভিজ্ঞ', (৮) নির্লোভ।

'মনুস্মৃতি'র ৮।৬২ শ্লোকের 'ন যে কেচিদনাপদি'—এই অংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জীমূতবাহন বলিয়াছেন যে, সাধারণতঃ উক্ত গুণসম্পন্ন না হইলে কেহ সাক্ষী হওয়ার যোগ্য হয় না; কিন্তু আপদকালে[৩] যে কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণীয় হয়, অবশ্য যদি সে কোন গর্হিত দোষযুক্ত না হয়[৪]।

যাজ্ঞবল্ক্যের প্রমাণানুসারী[৫] জীমূতবাহনের মতে, সাক্ষী নিম্নলিখিতরূপ হওয়া উচিত :—

(১) তপস্বী, (২) দানশীল, (৩) কুলীন, (৪) সত্যবাদী,

১ নবাদিষু পূর্বপূর্বালাভে পরঃ পরো গ্রাহ্যঃ —ব্য. মা., পৃঃ ৩১৭।
২ ব্রাহ্মণ সাক্ষী অল্পসংখ্যক হইলেও গ্রাহ্য—ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে।
৩ বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, নারীহরণ, চৌর্য ও সাহস প্রভৃতি ব্যাপারে। (ম. স্মৃ.র ৮।৬২ শ্লোকের উপর কুল্লূকের টীকা দ্রষ্টব্য)।
৪ যে কেচিৎ…নির্দোষতামাত্রেণ সাক্ষিত্বমর্হন্তি—ব্য. মা., পৃঃ ৩১৭।
৫ যা. স্মৃ., ২।৫।৬৮-৬৯।

(৫) ধার্মিক, (৬) ঋজু, (৭) ধনবান্, (৮) 'শ্রৌতস্মার্তক্রিয়ারত', (৯) বাদী বা বিবাদীর সমজাতি ও সমবর্ণ—'জাতি' শব্দে এখানে মূর্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ প্রভৃতি বর্ণসঙ্করকে বুঝায়[১]। এই নিয়মের তাৎপর্য এই যে, বিবদমান ব্যক্তি যে বর্ণের তাহার সাক্ষীও সেই বর্ণের হইবে এবং সঙ্কীর্ণ বর্ণের লোকের সাক্ষী সঙ্কীর্ণ বর্ণের লোকই হইবে।

যাজ্ঞবল্ক্যের উল্লিখিত প্রমাণে (২।৫।৬৯) আছে 'সর্বে সর্বেষু বা স্মৃতাঃ'; অর্থাৎ, সকলেই সর্ববর্ণের বিবাদে সাক্ষী হইতে পারে। ইহা জীমূতবাহনও স্বীকার করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, বিবদমান ব্যক্তিগণের সমজাতি ও সমবর্ণের সাক্ষী না পাওয়া গেলে যে কোন বর্ণের সাক্ষী যে কোন বর্ণেব বাদী বা বিবাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে।

বিচারে একজন মাত্র সাক্ষীর গ্রাহ্যত্ব বিষয়ে সপক্ষে ও বিপক্ষে বহু যুক্তির উদ্ধার করিয়া জীমূতবাহন যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা মোটামুটি এইরূপ।

সাধারণতঃ একজন মাত্র সাক্ষী গুণবান্ হইলেও বিচারে অগ্রাহ্য[২]। কিন্তু, বিহিতগুণযুক্ত ব্যক্তি উভয়পক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হইলে তাহার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য নহে। বিবদমান ব্যক্তিগণের সম্মতি ছাডাও নিম্নলিখিতরূপ এক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রাহ্য :—

(১) যাহার সমক্ষে একজন কর্তৃক অপরের নিকট কোন দ্রব্য 'নিক্ষেপ' স্বরূপ গোপনে রাখা হইয়াছে,

(২) বহুমূল্য দ্রব্য চাহিবার অভিপ্রায়ে একের নিকট অপর কর্তৃক প্রেরিত দূত,

১ সঙ্কীর্ণজাত্যভিপ্রায়েণ—ব্য. মা., পৃঃ ৩১৭।
জাতয়ঃ মূর্ধাভিষিক্তাদয়ঃ অনুলোমজাঃ প্রতিলোমজাশ্চ —
যা. স্মৃ. র ২।৫।৬৯ শ্লোকের 'মিতাক্ষরা' টীকা।

২ একঃ সাক্ষী সর্বথা ন গ্রাহ্যঃ। গুণবতোঽপি অগ্রহণমিতি সর্বথাপদস্যার্থঃ—ব্য. মা., পৃঃ ৩১৮।

(৩) শুচিক্রিয়—অর্থাৎ, সৎকর্মকারী ব্যক্তি,

(৪) ধর্মজ্ঞ,

(৫) 'অনুভূতবাক্'—যাহার বাক্যের সত্যতা পূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে, বিচারে, বিশেষতঃ 'সাহস' নামক অপরাধের বিচারে, এইরূপ একজন সাক্ষীই যথেষ্ট,

(৬) 'ভাষোত্তরলেখক'—যে ভাষা ও উত্তর লেখে,

(৭) বিবদমান ব্যক্তিগণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত,

(৮) সভাস্থ রাজা—যখন বিচারার্থ কোন বিষয় তিনি শ্রবণ করিয়াছেন,

(৯) প্রাড্ন্যায়ের ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ[১] ও সভ্যগণ,

(১০) প্রধান বিচারপতি বা সভ্য অথবা লেখক—যখন রাজা স্বয়ং বিচার করেন।

নিম্নলিখিত শ্রেণীর লোকের বিবাদে সেই সেই শ্রেণীর লোকই সাক্ষী হইতে পারিবে :—

(১) শ্রেণী—সমব্যবসায়ী ব্যক্তিগণের সঙ্ঘ,

(২) বর্গী—গণ, পূগ প্রভৃতি,

(৩) বহির্বাসী—কোন স্থানের প্রান্তবাসী,

(৪) স্ত্রীলোক।

সাক্ষী হইবার অযোগ্য ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :—

(ক) শাস্ত্রীয় বচনানুসারে অযোগ্য

(১) ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, (২) তপস্বী, (৩) বৃদ্ধ, (৪) প্রব্রজিত।

(খ) যাহারা সত্যপরায়ণ নহে

(১) চোর, (২) দস্যু, (৩) চণ্ড অর্থাৎ ভীষণ চরিত্রের লোক, (৪) কিতব—দ্যূতাসক্ত, (৫) নরঘাতক, (৭) অরাতি।

(গ) একই ব্যাপারে যাহাদের পরস্পরের সাক্ষ্যে বিরোধ দেখা যায়।

(ঘ) যাহারা বিবদমান ব্যক্তিগণের দ্বারা নিযুক্ত না হইয়া স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া সাক্ষ্য দেয়।

১ অর্থাৎ, বিচারপতি। অধ্যক্ষো রাজবন্দিতঃ প্রাড্বিবাকঃ—ব্য. মা, পৃঃ ৩২২

(ঙ) 'মৃতান্তর' অর্থাৎ

(১) গো, ভৃত্য প্রভৃতি বিবাদের বিষয়ীভূত বস্তু বা ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ঐ সম্বন্ধে সাক্ষী অগ্রাহ্য,

(২) যাহা কর্তৃক সাক্ষী নিযুক্ত হইয়াছে, তাহার মৃত্যু হইলে ঐ সাক্ষী গ্রাহ্য নহে।

উক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর অযোগ্য সাক্ষিগণের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণের অযোগ্যতার কারণ জীমূতবাহন এইরূপে বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত, তপস্বী এবং প্রব্রজিত—ইঁহারা সকলেই সম্মানার্হ। যাঁহারা 'ব্যবহারদ্রষ্টা' বা বিচারক তাঁহারা অভিশাপের ভয়ে ইঁহাদিগকে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন না, ইঁহারা কোন অপরাধ করিলে ইঁহাদিগকে দণ্ড দিতে পারিবেন না এবং সর্বদা অগ্নিহোত্রাদি ধর্মকার্যে ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া ইঁহারা অপরের কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন না। রঘুনন্দন বলেন যে, স্বীয় ধর্মকার্যাদিতে রত থাকায় তাঁহারা অপরের কার্য ভুলিয়া যাইতে পারেন[১]।

বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়াদি শিথিল হইয়া পড়ে বলিয়া তাঁহারা সাক্ষী হওয়ার অযোগ্য[২]। পূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ সাক্ষী হইতে পারেন। সুতরাং, মনে হয়, বর্তমান বিধি পূর্বোক্ত বিধির বিরোধী। জীমূতবাহন স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, বর্তমান বিধিতে যাঁহাদিগকে সাক্ষীর অযোগ্য বলা হইল তাঁহারা সাক্ষিস্বরূপ নিযুক্ত হইতে পারিবেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা স্বয়ংপ্রবৃত্ত হইয়া সাক্ষী হইলে তাঁহাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হইবে না[৩]।

উক্ত ব্যক্তিগণ ছাড়াও নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাক্ষী হইবার অযোগ্য :—

(১) নাবালক, (২) 'দুষ্টকৃৎ'—অসৎকর্মকারী, (৩) 'বান্ধব'—নিকট আত্মীয়। রঘুনন্দনের মতে, যাঁহাদের সত্যবাদিতা প্রমাণিত হইয়াছে, তাঁহারা, বান্ধব হইলেও সাক্ষী হওয়ার যোগ্য[৪]।

১ স্বীয় বৈদিককর্মকরণব্যগ্রতয়া পরকীয়কার্যে বিস্মরণসম্ভবাৎ —স্মৃ. ত., ২, পৃঃ ২১৪।

২ বৃদ্ধত্বাদ্ গ্লানেন্দ্রিয়ত্বাদিত্যর্থঃ —ব্য. মা., পৃঃ ৩২৪।

৩ তে সাক্ষিণঃ ন কর্তব্যাঃ। অকৃতাস্তু ভবন্ত্যেব সাক্ষিণঃ। ব্য. মা., পৃঃ ৩২৪।

৪ যদি…বান্ধবাদীনামপি সত্যবাদিত্বং নিশ্চীয়তে তদা তেঽপি সাক্ষিণো ভবিতুমর্হন্তি। স্মৃ. ত., ২, পৃঃ ২১২।

দ্বিজবর্ণের সাক্ষিগণ উত্তর বা পূর্বমুখী হইয়া সাক্ষ্য দিবেন। পূর্বাহ্ণে দেবতা বা ব্রাহ্মণের সান্নিধ্যে এইরূপ সাক্ষীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। বাদী ও বিবাদীর সমক্ষে সমস্ত সাক্ষীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে; তাহাদের অগোচরে কখনও কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে না। সাক্ষিগণের সাক্ষ্যগ্রহণে বিলম্ব অত্যন্ত দোষজনক। জীমূতবাহনের মতে, যে ব্যাপার অনেক সাক্ষী একত্র হইয়া অবগত হইয়াছে সে ব্যাপারে সকল সাক্ষীর সাক্ষ্যই একত্র গৃহীত হইবে। যখন কোন ঘটনা সম্বন্ধে সাক্ষিগণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জ্ঞাত হইয়াছে, তখন তাহাদের সাক্ষ্যও পৃথক্ ভাবে গৃহীত হইবে।

নিম্নলিখিত চিহ্নগুলি কূটসাক্ষীর লক্ষণ :—

(১) পদদ্বারা ভূমি-বিলিখন, (৫) ওষ্ঠের শুষ্কতা,
(২) বাহুর উপরে বস্ত্র কম্পিত করা, (৬) ঊর্ধ্বদিকে বা তির্যক্‌ভাবে দৃষ্টিপাত,
(৩) মুখরাগের পরিবর্তন, (৭) ত্বরিত বাক্যপ্রয়োগ,
(৪) কপালে ঘর্ম, (৮) অপৃষ্ট অবস্থায় বাক্যপ্রয়োগ।

এইরূপ সাক্ষীর উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত। যে সাক্ষী, ঘটনাটি জানিয়াও মৌন অবলম্বন করে, সেও অনুরূপ দণ্ডার্হ। যে সাক্ষী, আহূত হইয়া, নীরোগ থাকা সত্ত্বেও, উপস্থিত হয় না সে এবং যে পৃষ্ট না হইয়াই সত্য কথা বলে তাহারাও দণ্ডনীয়।

যে যে স্থলে কূটসাক্ষ্য দিলেও সাক্ষী দণ্ডনীয় হয় না, সেই সেই স্থলগুলি জীমূতবাহন কর্তৃক উদ্ধৃত[১] নিম্নলিখিত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে :—

রাজদণ্ডে ব্রাহ্মণার্থে প্রাণিনাং বধহেতবে।
বিবাহেচ ভিষক্‌পানে মিথ্যায়াঃ সত্যবাগ্‌ভবেৎ॥

ব্রাহ্মণকে রাজদণ্ড হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, কাহাকেও মৃত্যুদণ্ড হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এবং বিবাহ ও ঔষধসেবন সংক্রান্ত ব্যাপারে যদি কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তথাপি সে সত্যবাদী বলিয়াই গণ্য হইবে।

১ ব্য. মা., পৃঃ ৩৫২।

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কোন কোন প্রাচীন স্মৃতির বচনানুসারে[১], যে স্থলে সত্যকথা বলিলে চতুর্বর্ণের মধ্যে কোন বর্ণের লোকের মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে, সেস্থলে কূটসাক্ষ্য শাস্ত্রানুমোদিত। কিন্তু, বাঙ্গালী জীমূতবাহন এই নিয়মের যথেষ্ট ব্যতিক্রম করিয়াছেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তাঁহার মতে, মিথ্যাসাক্ষ্য তখনই অনুমোদিত হয় যখন কোন ব্রাহ্মণের (অপর বর্ণের লোকের নহে) কোন রাজদণ্ড (শুধু মৃত্যুদণ্ড নহে) ভোগ করিবার সম্ভাবনা থাকে এবং যখন কোন ব্যক্তির (শুধু চতুর্বর্ণের লোকের নহে) মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা দেখা যায়।

এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, উক্তরূপ বিশেষ স্থলে মিথ্যাসাক্ষ্যদান হেতু প্রাচীন স্মৃতি সাক্ষীর প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছে[২]। কিন্তু, জীমূতবাহন এইজন্য কোন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেন নাই। ইহা হইতে মনে হয়, তৎকালীন বাংলাদেশে ঐরূপস্থলে কূটসাক্ষ্য মোটেই প্রায়শ্চিত্তার্হ বলিয়া গণ্য হইত না।

রঘুনন্দন কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন যে, চতুর্বর্ণের কোন লোকের প্রাণরক্ষার্থেই শুধু মিথ্যাসাক্ষ্য দোষণীয় হইবে না। এইরূপ স্থলেও মিথ্যাসাক্ষ্যজনিত পাপের ক্ষালনার্থে রঘুনন্দন যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন। মনে হয়, জীমূতবাহনের পরে প্রায় চারিশত বৎসরের মধ্যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহাই রঘুনন্দনের গ্রন্থে প্রতিফলিত হইয়াছে।

সাক্ষীর বর্ণভেদে সম্বোধনের প্রভেদ হয়। 'ব্রূহি' পদে ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিতে হইবে। 'সত্যং ব্রূহি' বলিয়া ক্ষত্রিয়কে সম্বোধন করিতে হইবে। বৈশ্যকে সম্বোধন করিবার সময়ে, গো, বীজ ও কাঞ্চন অপহরণ-জনিত পাপের কথা বলিতে হইবে; তাৎপর্য এই যে, সে মিথ্যা কথা বলিলে তাহারও ঐরূপ পাপ হইবে। শূদ্র সাক্ষীর সম্বোধনকালে সর্বপ্রকার পাপের উল্লেখ করিতে হইবে; ইহার অর্থ এই যে, সে মিথ্যা কথা বলিলে তাহারও ঐ সমস্ত পাপ হইবে।

১ যেমন, বর্ণিনাং হি বধো যত্র তত্র সাক্ষ্যনৃতং বদেৎ—যা. স্মৃ., ২।৫।৮৩।

২ তৎপাবনায় নির্বাপ্যশ্চরুঃ সারস্বতো দ্বিজৈঃ —যা. স্মৃ., ২।৫।৮৩।

বর্তমান কালে বিচারালয়ে সাক্ষীকে Oath বা প্রতিজ্ঞা করান হয় এই বলিয়া যে সে মিথ্যা কথা বলিবে না। সেই যুগেও কতকটা এই ধরণের ব্যাপার ছিল। সাক্ষী বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দেওয়ার পূর্বে নানা শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইত যে, মিথ্যা সাক্ষ্যের পাপে ইহকাল ও পরকালে নানারূপ যাতনা লোককে ভোগ করিতে হয় এবং সত্য সাক্ষ্য দিলে সেই পুণ্যবলে লোকে ইহজীবনে ও পরজন্মে নানাবিধ সুখের অধিকারী হয়। তৎকালে সাক্ষীর কোন প্রতিজ্ঞা করার বিধান ছিল বলিয়া মনে হয় না।

'অনুমান' শব্দে এই প্রসঙ্গে বিবদমান ব্যক্তির সাধুতা ও অসাধুতা সম্বন্ধে অনুমান বুঝায়। তাহাদের রূপ, গতিবিধি ও আচরণ লক্ষ্য করিয়া বিচারক বাদী-বিবাদীর চরিত্রের সাধুতা অসাধুতা অনুমান করিবেন।

নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি বিবদমান ব্যক্তির অসাধুতার নির্দেশক :—

১। গাত্রকম্প,
২। ঘর্ম,
৩। ওষ্ঠ-শুষ্কতা
৪। ভূমি-বিলেখন,
৫। ঊর্ধ্বদিকে কুটিল দৃষ্টিক্ষেপ,
৬। কণ্ঠরোধ
৭। ইতস্ততঃ গমনাগমন,
৮। ওষ্ঠ-লেহন,
৯। মুখের পাণ্ডুতা,
১০। চাটুবাক্যের প্রয়োগ,
১১। বিরুদ্ধ বাক্যের প্রয়োগ,
১২। প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া,
১৩। অপরের চোখের দিকে না চাওয়া।

নির্ণয়

বিচারান্তে বিচারক জয়ী ব্যক্তিকে জয়পত্র[১] দান করিবেন। ইহাতে ভাষা, উত্তর, ক্রিয়া প্রভৃতির সঙ্গে বিচারকের সিদ্ধান্তও লিখিত থাকিবে।

১ ইহা বর্তমান কালের Judgmentএর অনুরূপ [দ্রষ্টব্য—Civil Procedure Code, Order XX এবং Sec. 33.]

২১। দিব্য

বিচারপদ্ধতি প্রসঙ্গে ভুক্তি, লিখিত ও সাক্ষী প্রভৃতি যে প্রমাণসমূহের আলোচনা করা হইল উহারা 'মানুষ' প্রমাণ। এইরূপ প্রমাণ ছাড়াও, দৈব প্রমাণ যে সুপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতে প্রচলিত ছিল প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থগুলি তাহার সাক্ষী। যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ ও কাত্যায়ন প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিকারেরা এই দৈব প্রমাণ বা দিব্য সম্বন্ধে নানারূপ বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী কালে স্মৃতিনিবন্ধ-যুগেও সম্ভবতঃ দিব্যের প্রচলন ছিল ; ঐ সকল গ্রন্থেও দিব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে। বাঙ্গালাদেশে এই বিষয়ে রঘুনন্দনের 'দিব্যতত্ত্ব'[১] সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

'দিব্যতত্ত্বে'র বিষয়বস্তুকে নিম্নলিখিতরূপে ভাগ করিয়া নেওয়া যায় :—

(১) সাধারণ কথা,

(২) দিব্য-প্রয়োগের স্থান,

(৩) দিব্য-প্রয়োগের কাল,

(৪) বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের যোগ্যাযোগ্য দিব্য,

(৫) দিব্যসমূহের স্বরূপ ও প্রয়োগপ্রণালী।

কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগ যদি উক্ত তিন প্রকার মানুষ-প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত না হয়, তাহা হইলে দিব্যপ্রমাণ আবশ্যক[২]। রঘুনন্দনের মতে, মানুষ-প্রমাণ সত্ত্বেও, কোন কোন ক্ষেত্রে, দিব্যের প্রয়োজন। সাধারণতঃ অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদে দিব্য প্রযোজ্য, অবশ্য যখন মানুষ-প্রমাণ থাকে না। ঋণাদান প্রভৃতি সাধারণ বিবাদে, মানুষ-প্রমাণ সত্ত্বেও, দিব্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে যদি বিবাদী এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেয় যে দিব্যে তাহার পরাজয় হইলে সে উপযুক্ত দণ্ড দিবে[৩]।

১ স্মৃ. ত., ২, পৃঃ ৫৭৪-৬১৩।

২ মানুষপ্রমাণানির্ণয়েঽপি নির্ণায়কং যৎ তদ্দিব্যমিতি লোকে প্রসিদ্ধম্। স্মৃ. ত., ২, ৫৭৪।

৩ স্মৃ. ত., ২, পৃঃ ৫৮০।

ভিন্ন ভিন্ন রূপ অপরাধীর জন্য দিব্যপ্রয়োগের বিভিন্ন স্থান নির্দেশিত হইয়াছে। স্থানগুলি নিম্নলিখিতরূপ :—

(১) ইন্দ্রস্থান[১]—মহাপাতকীব জন্য।

(২) বাজদ্বাব—বাজপ্রাসাদের দ্বাব। এইস্থান নৃপদ্রোহীর জন্য।

(৩) চতুষ্পথ—প্রতিলোমজাত ব্যক্তিব জন্য।

(৪) সভা—বিচাবালয়। উক্ত প্রকার অপরাধী ভিন্ন অন্যান্য অপবাধীব জন্য এই স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে।

বিভিন্ন প্রকাব দিব্যেব জন্য বিভিন্ন সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে। বৈশাখ, অগ্রহায়ণ ও চৈত্র—এই মাসগুলিতে সর্বপ্রকাব দিব্যই প্রযোজ্য। কিন্তু, নিম্নলিখিত দিব্যগুলির[২] জন্য বিশিষ্ট কাল নির্দিষ্ট হইয়াছে :—

(১) ধট—সর্বঋতুতেই প্রযোজ্য, কিন্তু, যখন প্রবল বায়ু বহে তখন এই দিব্য প্রয়োগ কবা উচিত নহে।

(২) অগ্নি—বর্ষা, হেমন্ত ও শীতকাল।

(৩) উদক—গ্রীষ্ম ও শরৎ কাল।

(৪) বিষ—হেমন্ত ও শীতকাল।

(৫) কোষ—যে কোন সময়ে প্রযোজ্য।

অপর দিব্যগুলিব জন্য প্রাচীন স্মৃতিসমূহে বিশেষ কোন কাল নির্দিষ্ট নাই। ইহা হইতে রঘুনন্দন অনুমান কবিয়াছেন যে, উহাবা যে কোন সময়ে প্রযোজ্য হইতে পাবে[৩]।

১ শব্দটির অর্থ পণ্ডিতপ্রবর কাণে করিয়াছেন 'সুবিদিত দেবমন্দির' (হি ধ, ৩, পৃঃ ৩৬৭)। কিন্তু, এই অর্থ খুব সঙ্গত মনে হয় না। 'দিব্যতত্ত্বে' (স্মৃ ত, ২, পৃঃ ৫৭৬) রঘুনন্দন ইহার প্রতিশব্দ দিয়াছেন 'ইন্দ্রধ্বজস্থান'। মনে হয়, ইহাতে সেই স্থানকে বুঝান হইত যেথানে শক্রোৎসবের সময়ে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে পতাকা স্থাপিত হইত। (দ্রষ্টব্য :—Monier Williamsএর Sanskrit-English Dictionary)।

২ দিব্যগুলির স্বরূপ পরে বর্ণিত হইয়াছে।

৩ তণ্ডুলাদীনাং তু বিশেষকালানভিধানাৎ সার্বকালিকত্বম্। (দিব্যতত্ত্ব)

কতক সময় কোন কোন দিব্যের প্রয়োগে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা :—

(১) শীতকাল[১]—উদকদিব্য নিষিদ্ধ, (৩) বর্ষাকাল—বিষদিব্য নিষিদ্ধ,
(২) উষ্ণকাল[২]—অগ্নিদিব্য নিষিদ্ধ, (৪) প্রবাত[৩]—তুলাদিব্য নিষিদ্ধ।

অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে, শনি ও মঙ্গলবারে এবং মলমাসে সর্বপ্রকার দিব্যই নিষিদ্ধ।

নানা শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করিয়া এই সম্বন্ধে রঘুনন্দন যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা এইরূপ। চতুর্বর্ণের উপযোগী দিব্য নিম্নলিখিত-রূপ :—

ব্রাহ্মণ—ধট, বৈশ্য—উদক,
ক্ষত্রিয়—অগ্নি, শূদ্র—বিষ।

চতুর্বর্ণের পক্ষে প্রযোজ্য দিব্যসম্বন্ধে উক্ত নিয়ম থাকিলেও, মনে হয়, কোষ ও তুলা সকলের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণের পক্ষে বিষ স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে[৪]।

বর্ণ, বয়স ও অবস্থানির্বিশেষে স্ত্রীলোকের ও ষোড়শবর্ষ বয়স পর্যন্ত বালকের পক্ষে তুলাই একমাত্র দিব্য। অশীতিবর্ষের ঊর্ধ্বে যাহাদের বয়স, যাহারা অন্ধ, পঙ্গু এবং রোগার্ত তাহাদের পক্ষেও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

প্রাচীন স্মৃতির একটি বচনে বলা হইয়াছে যে, যাহারা কোন ব্রতগ্রহণ করিয়াছে এবং যাহারা অত্যন্ত আর্ত ও কঠিন রোগাক্রান্ত, তাহাদের পক্ষে দিব্য প্রযোজ্য নহে; তপস্বী সম্বন্ধেও এই বিধি। শূলপাণির অনুসরণকারী রঘুনন্দনের মতে, এই বিধির তাৎপর্য এই যে, উক্ত ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে তণ্ডুলদিব্য ভিন্ন অন্য সর্বপ্রকার দিব্য নিষিদ্ধ। 'মিতাক্ষরা'র প্রমাণবলে

১ রঘুনন্দনের মতে, নারদ-প্রযুক্ত এই শব্দ শীত ছাড়াও বর্ষা এবং হেমন্তকালকে বুঝায়।
২ রঘুনন্দন ইহার অর্থ করিয়াছেন গ্রীষ্ম ও শরৎকাল।
৩ যখন বায়ু প্রচণ্ডবেগে বহে।
৪ বিষবর্জং ব্রাহ্মণস্য ইত্যাদি—স্মৃ. ত., পৃঃ ৫৭৭।

রঘুনন্দন বিধান করিয়াছেন যে, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে বিবাদে পুরুষ বাদী কিংবা বিবাদী যাহাই হউক তাহার পক্ষেই শুধু দিব্য প্রযোজ্য।

সাধারণ নিয়ম এই যে, অপরাধী নিজে অশক্ত হইলে সে দিব্যে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারে। নিম্নলিখিত অপরাধীরা ব্যক্তিগতভাবে দিব্য গ্রহণ করিতে পারে না:—

রাজহন্তা, পিতৃহন্তা, দ্বিজহন্তা, আচার্যঘাতী, বালক- ও স্ত্রী-হন্তা, মহাপাতকী ও নাস্তিক।

এই ব্যাপারে তাহারা কোন সজ্জনকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবে।

নিম্নলিখিত দিব্যগুলি পার্শ্বে লিখিত ব্যক্তিগণের পক্ষে নিষিদ্ধ:—

অগ্নি—লৌহশিল্পী, শ্বিত্রী, অন্ধ, কুষ্ঠী।

সলিল—অম্বুজীবী[১], স্ত্রীলোক ও বালক, শ্বাসরোগী।

তণ্ডুল—মুখরোগযুক্ত ব্রাহ্মণ।

বিষ—পিত্তপ্রধান ব্যক্তি।

দিব্যগুলির স্বরূপ ও প্রয়োগের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে রঘুনন্দন বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। গ্রন্থ-বিস্তার ভয়ে এই সম্বন্ধে খুঁটিনাটির কোন উল্লেখ না করিয়া বর্তমান প্রসঙ্গে দিব্যগুলির মোটামুটি স্বরূপ ও প্রয়োগ-প্রণালী বর্ণিত হইতেছে।

ধটদিব্য

তুলারই নাম ধট। একটি তুলাতে শোধ্য[২]কে তাহার শরীরের ওজনের অনুরূপ একটি ভারের সহিত ওজন করিতে হইবে। ইহার পরে সে তুলা হইতে নামিয়া নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিয়া দেওয়ার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে। তৎপর তুলাতে পুনরায় আরোহণ করিলে সে যদি পূর্বের ওজন অপেক্ষা অধিকতর ভারী হয়, তবে সে দোষী বলিয়া বিবেচিত হইবে; লঘুতর হইলে সে নির্দোষ প্রতিপন্ন হইবে।

১ মৎস্যজীবী বা নৌকাবাহী।
২ যাহার প্রতি দিব্য প্রযুক্ত হয়।

অগ্নিদিব্য

ভূমিতে নয়টি বৃত্ত অঙ্কিত করিতে হইবে। শোধ্য একটি উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড হস্তে নিয়া ধীরে ধীরে এক বৃত্ত হইতে অপর বৃত্তে যাইতে যাইতে অষ্টম বৃত্তে যাইবে। সেখান হইতে লৌহপিণ্ডটি নবম বৃত্তে সে নিক্ষেপ করিবে। ইহার পরেও যদি তাহার হস্তে কোনরূপ দাহচিহ্ন না থাকে তবে সে নির্দোষ বলিয়া ঘোষিত হইবে।

উদকদিব্য

একটি জলাশয়ের তীরে বিচারক একটি 'তোরণ' নির্মাণ করাইবেন। তিনটি শরও নির্মিত হইবে। কিয়দ্দূরে একটি লক্ষ্যবস্তু স্থাপিত হইবে। একটি লোক একটি খুঁটি ধরিয়া জলমধ্যে দণ্ডায়মান হইবে। শোধ্যও জলে থাকিবে। অপর এক ব্যক্তি উক্ত তোরণ হইতে লক্ষ্যের প্রতি ঐ তিনটি শর নিক্ষেপ করিবে। আর একটি লোক যে স্থানে দ্বিতীয় শরটি পতিত হইবে, ধাবিত হইয়া সেস্থানে পৌঁছিয়া শরটি ধারণ করিয়া থাকিবে। তখন, বিচারকের হাততালি শুনিবামাত্র শোধ্য যে ব্যক্তি খুঁটি ধরিয়া দণ্ডায়মান আছে তাহার উরুদেশ অবলম্বন করিয়া জলমগ্ন হইবে। তৎক্ষণাৎ তোরণস্থিত ব্যক্তি দ্বিতীয় শরের পতনস্থানে দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া যাইবে। সে সেখানে পৌঁছামাত্রই তথায় দণ্ডায়মান ব্যক্তি দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া তোরণের নিকট পৌঁছিবে। এইরূপে তোরণে পৌঁছিতে পৌঁছিতে সে যদি শোধ্যকে না দেখিতে পায় অথবা তাহার মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ মাত্র দেখে তাহা হইলে শোধ্য নির্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

বিষদিব্য

দিব্যের জন্য শার্ঙ্গ[১], বৎসনাভ[২] অথবা হৈমবত নামক বিষ প্রযুক্ত হইতে পারে[৩]। রাত্রির শেষ যামে ত্রিশগুণ ঘৃতসহ নির্দিষ্ট পরিমাণের[৪] বিষ শোধ্য পান করিবে। তাহার পরে একটি ছায়াশীতল স্থানে রক্ষিগণ-

১ শৃঙ্গ নামক উদ্ভিদ্ হইতে উৎপন্ন।

২ Aconite.

৩ কাহারও কাহারও মতে, একই বিষের এই তিনটি বিভিন্ন নাম।

৪ ঋতুভেদে পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে।

কর্তৃক সে রক্ষিত হইবে। সমস্ত দিনের পরে যদি শোধ্যের মধ্যে বিষের কোন ক্রিয়া লক্ষিত না হয়, তাহা হইলে সে নির্দোষ প্রতিপন্ন হইবে। কিন্তু, লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন ঐ সময়ের মধ্যে শোধ্য বিষনাশক কোন দ্রব্য ব্যবহার না করে।

কোষদিব্য

শোধ্য রুদ্র, দুর্গা ও আদিত্য প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে জলে স্নান করাইবে। সে ঐ জলের তিন অঞ্জলি পান করিবে। তাহার পরে চতুর্দশ দিবসের মধ্যে তাহার কোন বিপদ না হইলে সে নির্দোষ বিবেচিত হইবে। কিন্তু মহামারী প্রভৃতি সকলেরই যে বিপদ সেই বিপদ তাহার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিপদ বলিয়া গণ্য হইবে না।

তণ্ডুলদিব্য

কতক তণ্ডুল মাটির পাত্রে রাখিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। তারপর যে জলে সূর্যের মূর্তি স্নাত হইয়াছে, সেই জল কিঞ্চিৎ পরিমাণে ঐ পাত্রে ঢালিয়া এক রাত্রি রাখিতে হইবে। পরের দিন শোধ্য ঐ তণ্ডুল তিনবার গিলিয়া খাইবে। তৎপর সে ভূর্জপত্রে নিষ্ঠীবন করিবে। ঐ নিষ্ঠীবনের সঙ্গে রক্ত মিশ্রিত থাকিলে সে দোষী বিবেচিত হইবে।

তপ্তমাষ

কিছু ঘৃত ও তৈল একটি পাত্রে রাখিয়া অতিশয় উত্তপ্ত করিতে হইবে এবং উহাতে এক মাষা সোনা নিক্ষেপ করিতে হইবে। শোধ্য ঐ স্বর্ণখণ্ডটি উহা হইতে তুলিয়া লইবে। ইহাতে যদি তাহার হস্তে দাহ-চিহ্ন না হয় তবে সে নির্দোষ।

ফালদিব্য

নির্দিষ্ট ওজনের একটি লৌহনির্মিত লাঙ্গল-ফালকে অতিশয় উত্তপ্ত করিলে শোধ্য তাহার জিহ্বাদ্বারা উহা লেহন করিবে। ইহাতে তাহার জিহ্বা দগ্ধ হইলে সে দোষী প্রতিপন্ন হইবে। নচেৎ সে নির্দোষ।

ধর্মদিব্য

ধর্ম ও অধর্ম এই দুইটির মূর্তি নির্মাণ করিতে হইবে অথবা দুইটি চিত্র বস্ত্রে বা ভূর্জপত্রে অঙ্কিত করিতে হইবে। সেই দুইটি মূর্তি বা চিত্র দুইটি

মৃৎপিণ্ড অথবা গোময়পিণ্ডে স্থাপিত হইবে। তৎপর ঐ পিণ্ড দুইটিকে একটি পাত্রে রাখিতে হইবে। উহাদের মধ্য হইতে শোধ্য একটি পিণ্ড বাহিরে আনিবে। যদি সে ধর্মের মূর্তি বা চিত্র আনে তবে সে নির্দোষ।

পিতামহের প্রমাণবলে রঘুনন্দন ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, রাজা বা বিচারক নিজের সমক্ষে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও প্রকৃতির দিব্য প্রয়োগ করিবেন। 'প্রকৃতি' শব্দে রঘুনন্দন নিম্নলিখিত সপ্ত রাজ্যাঙ্গ বুঝিয়াছেন ঃ—

স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল।

'পৌরশ্রেণী' বা নাগরিকগণের সঙ্ঘের পক্ষেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। ইঁহারা সকলেই সম্মানার্হ ব্যক্তি বলিয়া সম্ভবতঃ এই নিয়মের প্রয়োজন হইয়াছিল।

৩। দায়ভাগ ও উত্তরাধিকার[১]

বাংলাদেশে যদি একমাত্র জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ' নামক গ্রন্থটিই রচিত হইত, তথাপি এই দেশ স্মৃতিশাস্ত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারিত। দায়বিভাগ ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সমগ্র ভারত বিজ্ঞানেশ্বরের 'মিতাক্ষরা'কে অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু, বাংলাদেশের চিন্তাধারার যে স্বাতন্ত্র্য ছিল এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বিজ্ঞানেশ্বর পূর্বপুরুষের সম্পত্তিতে জন্মগত অধিকার স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু, জীমূতবাহন পিণ্ডদানের অধিকার ও যোগ্যতার উপর সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই মূল নীতিতেই বিজ্ঞানেশ্বর ও জীমূতবাহনের মতানৈক্য সর্বাধিক পরিস্ফুট।

১ এই বিষয় সম্বন্ধে প্রধান বঙ্গীয় নিবন্ধকারগণের মতামত বর্তমান গ্রন্থকার কর্তৃক 'Jimutavahana, Sulapani and Raghunandana on certain laws of inheritance' শীর্ষক প্রবন্ধে (নি. ই. এ্যা., ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৯৭) আলোচিত হইয়াছে।

ব্রিটিশ শাসকেরা হিন্দুদের দায়াধিকার সম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্রের চিরপ্রচলিত মূল নিয়মগুলির সাহায্যেই বিবাদের বিচার করিতেন। তাঁহারাও বাংলাদেশে জীমূতবাহনের গ্রন্থকেই প্রামাণ্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন।

জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ' ছাড়া রঘুনন্দনের 'দায়তত্ত্ব' এবং শ্রীকৃষ্ণের 'দায়ক্রমসংগ্রহ'ও এই বিষয় লইয়া রচিত। তবে শেষোক্ত গ্রন্থ দুইটিতে 'দায়ভাগে'র তুলনায় বিশেষ কিছু নূতন কথা নাই। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা 'দায়ভাগে' আলোচিত বিষয়গুলিকে নিম্নলিখিতরূপে ভাগ করিয়া জীমূতবাহনের সিদ্ধান্তগুলিকে মোটামুটিভাবে লিপিবদ্ধ করিব।

(১) স্বত্বের উৎপত্তি,
(২) বিভাগের কাল,
(৩) পৈতৃক সম্পত্তির বিভাগ,
(৪) স্ত্রীধন,
(৫) দায়াধিকারে বঞ্চিত ব্যক্তিগণ,
(৬) অবিভাজ্য সম্পত্তি,
(৭) অপুত্রক ব্যক্তির সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার,
(৮) সংসৃষ্টী ব্যক্তিগণের সম্পত্তির বিভাগ,
(৯) বিভাগের পরে আবিষ্কৃত প্রচ্ছন্ন সম্পত্তির বিভাগ,
(১০) বিভাগ সম্বন্ধে সন্দেহনিরসন।

(১) স্বত্বের উৎপত্তি

এই সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে, পিতার জীবদ্দশায় পূর্বপুরুষের সম্পত্তিতে কাহারও স্বত্ব জন্মে না। পিতার মৃত্যু হইলেই পুত্রের ঐরূপ সম্পত্তিতে অধিকার হয়। এখানে 'মৃত্যু' শব্দটির দ্বারা পাতিত্য এবং প্রব্রজ্যাকেও বুঝান হইয়াছে।[১] পিতার জীবদ্দশায় পুত্রগণ যদি সম্পত্তিটি ভাগ করিয়া লয়, তাহা হইলেই পুত্রদের অধিকার জন্মিবে না, কারণ, জীমূতবাহন বলিয়াছেন যে, শুধু বিভাগই যদি স্বত্বোৎপত্তির মূল হইত তাহা হইলে কোন নিঃসম্পর্কিত

১ ন চোপরমমাত্রমেব বিবক্ষিতং, কিন্তু পতিতপ্রব্রজিতত্বাদ্যুপলক্ষয়তি স্বত্ববিনাশহেতুসাম্যাৎ —দা. ভা., ১।৩১।

ব্যক্তির সম্পত্তি অপর লোকে ভাগ করিয়াই তাহাতে স্বত্ব উৎপাদন করিতে পারিত।

(২) বিভাগের কাল[১]

পিতার পাতিত্য, বিষয়ে বৈরাগ্য ও মৃত্যু প্রভৃতির যে কোন একটি ঘটিলে পুত্রগণ তাঁহার সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইতে পারে। পিতা বর্তমান থাকিলেও তাঁহার ইচ্ছানুসারে তদীয় সম্পত্তি পুত্রগণ ভাগ করিয়া নিতে পারে।

মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে এবং পিতার অনুমতি থাকিলে পিতামহের সম্পত্তি তদীয় পৌত্রগণ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া নিতে পারে।

(৩) পৈতৃক সম্পত্তির বিভাগ

এই সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, পিতার মৃত্যুর পরে তদীয় সম্পত্তিতে পুত্রদের স্বত্ব জন্মিলেও মাতার জীবৎকালে তাহারা ধর্মসম্মত ভাবে উহা ভাগ করিতে পারে না[২]। অবশ্য মাতার অনুমতিক্রমে উহা ভাগ করা যায়।

পুত্রদের মধ্যে যদি একজনও বিভাগ চাহে তথাপি উহা করণীয়।

বিভাগ কালে যদি কেহ নাবালক থাকে বা প্রবাসী হয় তাহা হইলে নাবালক সাবালক না হওয়া পর্যন্ত এবং প্রবাসী ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত তাহার অংশ বন্ধু[৩] ও মিত্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে।

পুত্রগণের মধ্যে বিভাগ পৌত্র এবং প্রপৌত্র পর্যন্ত প্রযোজ্য বুঝিতে হইবে; অবশ্য, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পিতার জীবিত অবস্থায় তদীয় সম্পত্তিতে পুত্রের স্বত্ব উৎপন্ন হয় না। কাহারও এক পুত্র এবং অপর মৃত পুত্রের দুই পুত্র বর্তমান থাকিলে তদীয় সম্পত্তিটি প্রথমে দুই সমান ভাগে বিভক্ত হইবে। তৎপর মৃত পুত্রের অংশ সমান দুই ভাগে পৌত্র দুইজনের মধ্যে বিভক্ত হইবে। তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়াইবে—$\frac{১}{২}+\frac{১}{৪}+\frac{১}{৪}$। এই নীতিকেই স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হইয়াছে 'পিতৃতো ভাগকল্পনা'[৪]।

১ দা. ভা., ১।৪৪-৪৫।

২ পুত্রাণাং মাতরি জীবন্ত্যাং ন পরস্পরবিভাগে স্বাতন্ত্র্যম্—দা. ভা., ৩।১।১৩।

৩ গ্রন্থশেষে শব্দকোষ দ্রষ্টব্য।

৪ বর্তমান আইনে ইহাকে বলা হয় Succession per stirpes।

কোন কোন স্মৃতির বচনে দেখা যায়, কনিষ্ঠ ভ্রাতারা নিজ নিজ অংশ হইতে কিছু কিছু করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দিবেন। আবার, কোন কোন স্মৃতিকার ভ্রাতৃগণের মধ্যে সমবিভাগেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে জীমূতবাহনের মত এই যে, সাধারণতঃ ভ্রাতৃগণের অংশ সমানই হইবে; কিন্তু, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতারা তাঁহাকে নিজ নিজ অংশ হইতে কিছু কিছু দিতে পারেন—এই ব্যাপার তাঁহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

কেহ যদি তাহার প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'কিঞ্চিৎ[১]' দিয়া বিভাগ করিয়া লইতে হইবে, ভবিষ্যতে যেন কোন গোলযোগ উপস্থিত না হয় সেই জন্য এই ব্যবস্থা আবশ্যক।

সহোদর ভ্রাতারা পিতৃসম্পত্তির বিভাগ করিলে তাহারা মাতাকে এক পুত্রের সমান অংশ দিবে[২]। এখানে মাতা শব্দে জননীকে বুঝায়, বিমাতাকে নহে[৩]। জননীকে যদি পিতা সম্পত্তির কোন অংশ দান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত অংশের মাত্র অর্ধেক পাইবেন।

বিমাতা যদি পুত্রহীনা হন, তাহা হইলে তিনি জননীর সমান অংশ পাইবেন[৪]।

বিভিন্ন বর্ণের মাতৃগণ সেই সেই বর্ণের পুত্রদের সমান অংশ পাইবেন, যেমন, ব্রাহ্মণী মাতা ব্রাহ্মণ পুত্রের সমান অংশের অধিকারিণী হইবেন।

পিতৃসম্পত্তিতে কন্যাগণের অধিকার সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, পুত্রগণ 'তুরীয়ক' অংশ কন্যাকে দিবে। 'তুরীয়ক' বা চতুর্থ ভাগের অর্থ করা হইয়াছে পুত্রের অংশের চতুর্থভাগ। ভ্রাতারা অবিবাহিতা ভগ্নীর বিবাহের ব্যয়ও বহন

১ জীমূতবাহন কর্তৃক উদ্ধৃত মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের বচনে প্রযুক্ত এ শব্দটির অর্থ স্পষ্ট নহে। জীমূতবাহনের মতে, ইহার অর্থ তণ্ডুলপ্রস্থ অর্থাৎ কতক পরিমাণ চাউল।

২ দা. ভা., ৩।২।২৯। এইরূপ সম্পত্তিতে তাঁহার ভোগস্বত্ব মাত্র থাকিবে; দান বিক্রয়াদির ক্ষমতা থাকিবে না।

৩ ঐ, ৩।২।৩০।

৪ ঐ, ৩।২।৩২।

করিবেন। ভ্রাতৃগণকর্তৃক ভগ্নীকে নিজ নিজ অংশের চতুর্থভাগ দান সম্বন্ধে জীমূতবাহনের মত এই যে, ইহা তখনই প্রযোজ্য হইতে পারে যখন ভ্রাতার সংখ্যা ভগ্নীর সংখ্যার সমান। সংখ্যা সমান না হইলে নিম্নলিখিতরূপে সমস্যার সৃষ্টি হইতে পারে :—

(১) একটি ভ্রাতা অপেক্ষা একটি ভগ্নীর অংশ অধিকতর হইতে পারে।

(২) একটি ভ্রাতা পিতৃসম্পত্তি হইতে একেবারে বঞ্চিত হইতে পারে।

এই সমস্যাগুলির উদ্ভব এইরূপে সম্ভবপর:—ধরা গেল, ভ্রাতা চারিটি, ভগ্নী একটি এবং সম্পত্তির মূল্য ১। তাহা হইলে, প্রত্যেক ভ্রাতা পাইবে $\frac{১}{৪}$ এবং ভগ্নীর অংশ হইবে ($\frac{১}{৪}$ এর $\frac{১}{৪}$) $\times$ ৪ $=$ $\frac{১}{১৬}$ $\times$ ৪ $=$ $\frac{১}{৪}$। ভগ্নীর অংশ বিয়োগ করিলে প্রত্যেক ভ্রাতার অংশ অবশিষ্ট থাকিবে $\frac{১}{৪}$—$\frac{১}{১৬}$ $=$ $\frac{৩}{১৬}$। আবার, ধরা গেল, ভগ্নী চারিটি, ভ্রাতা একটি। তাহা হইলে ভগ্নীরা পাইবে $\frac{১}{৪}$ $\times$ ৪ $=$ ১ ; তাহা হইলে ভ্রাতার কিছুই থাকে না।

এই সমস্ত সমস্যার সমাধানকল্পে জীমূতবাহন 'তুরীয়ক' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'বিবাহোচিত-ধনম্'[১]। কন্যা অপেক্ষা পুত্রের প্রাধান্য জীমূতবাহন স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন[২]।

জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ' পাঠে বুঝা যায়, তিনি অনুলোম বিবাহ সমর্থন করিতেন[৩]। উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের বিবাহের নাম অনুলোম বিবাহ। প্রতিলোম বিবাহকে, অর্থাৎ নিম্নবর্ণের পুরুষ কর্তৃক উচ্চবর্ণের নারীর বিবাহকে, তিনি স্পষ্টভাবেই নিষেধ করিয়াছেন[৪]। তাঁহার মতে, সবর্ণ-বিবাহই বিধেয়। অনুলোম বিবাহ অনুমোদিত হইলেও ইহা দোষমুক্ত নহে ; তবে, প্রতিলোমের অপেক্ষা অনুলোম বিবাহের দোষ সামান্য। অনুলোম বিবাহ তাঁহার অনুমোদিত হইলেও দ্বিজ কর্তৃক শূদ্রাবিবাহকে তিনি তীব্র নিন্দা করিয়াছেন[৫]।

১ দা. ভা., ৩।২।৩৯।

২ পুত্রস্য প্রাধান্যাৎ—দা. ভা., ৩।২।৪০।

৩, ৪ দা. ভা., ৯।২।

৫ ঐ, ৯।৯।

ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর পুত্র জ্যেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা গুণবান্ হইলে সে ব্রাহ্মণীব পুত্রগণের সহিত সমান অংশ পাইবে। তাঁহার বৈশ্যা স্ত্রীর পুত্র অনুরূপ অবস্থায় ক্ষত্রিয়াপুত্রের সমান অংশ পাইবে। ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রীর পুত্র নিষাদ নামে অভিহিত। উক্তরূপ ক্ষেত্রে সে বৈশ্যা পুত্রের সমান অংশ পাইবে।

ব্রাহ্মণের অসবর্ণ পুত্র যদি তাঁহার একমাত্র পুত্র হয়, তাহা হইলে সে পিতৃসম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ মাত্র পাইবে, অবশিষ্ট দুই ভাগ পিতার সপিণ্ড ও তদভাবে তাঁহার সকুল্যগণ পাইবে। এইরূপ কেহই না থাকিলে তাঁহার সম্পত্তির উক্ত দুই ভাগ সেই ব্যক্তি পাইবে যে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পারলৌকিক কার্য করিবে।[১]

দ্বিজের শূদ্রা পত্নীর পুত্র তাঁহার ভূমিতে কখনই অধিকার লাভ করে না। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দানস্বরূপ যে ভূমি প্রাপ্ত হন, তাহার নাম ব্রহ্মাদায়[২]। ইহাতে তাঁহার ব্রাহ্মণী স্ত্রীর পুত্র ভিন্ন অপর কোন পুত্রের অধিকার জন্মে না[৩]।

ব্রাহ্মণের অসবর্ণ পুত্র তাঁহার একমাত্র পুত্র হইলে সে পিতৃসম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পাইবে—ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু, সে যদি শূদ্রার পুত্র হয় তাহা হইলে সম্পত্তির উক্ত অংশ পাইতে হইলেও তাহাকে বিদ্যা ও বিনয় সম্পন্ন হইতে হইবে[৪]।

শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের জারজ পুত্র তাঁহার সম্পত্তি হইতে গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে[৫]।

ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা স্ত্রীর পুত্র জ্যেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা গুণবান্ হইলে ক্ষত্রিয়াপুত্রের সহিত সমান অংশ পাইবে।

ক্ষত্রিয়ের শূদ্রা স্ত্রীর পুত্র যদি একমাত্র পুত্র হয় তাহা হইলে সে পিতৃ-সম্পত্তির অর্ধাংশ পাইবে অবশিষ্ট অর্ধাংশ তাহারা পাইবে, যাহারা মৃত

১ ঐ, ৯।২৪।
২ ঐ, ৯।১৯।
৩ ঐ, ৯।১৭।
৪ দা. ভা, ৯।২৭।
৫ ঐ, ৯।২৮। এইরূপ পুত্রকে বলা হয় 'পারশব'।

ব্যক্তি অপুত্রক হইলে সম্পত্তির অংশ পাইত[১]। এক্ষেত্রেও শূদ্রাপুত্র বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন হইলেই উক্ত অংশ পাইবে।

বৈশ্যের শূদ্রা স্ত্রীর পুত্র যদি একমাত্র পুত্র হয়, তাহা হইলে সে ক্ষত্রিয়ের শূদ্রা স্ত্রীর পুত্রের ন্যায়ই অংশের অধিকারী হইবে।

পিতৃসম্পত্তিতে অসবর্ণ পুত্রের অংশ প্রসঙ্গে জীমূতবাহন বলিয়াছেন যে, শূদ্রের দাসীগর্ভজাত পুত্র বা অপর কোন অবিবাহিতা শূদ্রার গর্ভজাত জারজ পুত্র বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রদের সঙ্গে সমান অংশ পাইবে; অবশ্য, যদি এই বিষয়ে পিতার অনুমতি থাকে। ঐরূপ অনুমতি না থাকিলে দাসীপুত্র বা অবিবাহিতা শূদ্রার পুত্র 'অর্ধাংশ'[২] মাত্র পাইবে।

উক্ত দাসীপুত্র বা জারজপুত্র যদি একমাত্র পুত্র হয়, তাহা হইলে সে মৃতব্যক্তির সমগ্র সম্পত্তির অধিকারী হইবে। কিন্তু, মৃত ব্যক্তির দৌহিত্র থাকিলে, ঐ দাসীপুত্র ও জারজপুত্র তাহার সহিত সমান অংশ পাইবে[৩]। এই বিষয়ে জীমূতবাহন নিম্নলিখিতরূপ যুক্তি দিয়াছেন :—

> অবিবাহিতা নারীর গর্ভজাত হইলেও পুত্র পুত্রই এবং বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাতা হইলেও কন্যা কন্যাই। যেহেতু সর্বদা কন্যা অপেক্ষা পুত্রেরই প্রাধান্য, সেই হেতু এক্ষেত্রে পুত্র ও দৌহিত্রের সমান অংশ অযৌক্তিক নহে[৪]।

জীমূতবাহন এইরূপ পুত্রগণের প্রকারভেদ করিয়াছেন, যথা—

(১) বিভাগের পরে গর্ভস্থ ও প্রসূত,

(২) বিভাগের পূর্বে গর্ভস্থ হইলেও অজ্ঞাত এবং পরে প্রসূত।

পূর্বোক্ত প্রকার পুত্র পিতার অংশ পাইবে[৫]। এইরূপ ব্যবস্থা তখনই হইতে

১ দা. ভা., ৯।২৬।

২ 'মিতাক্ষরা' (যা. স্মৃ, ২।৪।১৩৪।) ও 'বালভট্টি'র মতে, ইহার অর্থ পুত্রের প্রাপ্য অংশের অর্ধেক।

৩ দা. ভা., ৯।৩১।

৪ ঐ।

৫ ঐ, ৭।২।

পায়ে যখন পিতা স্বীয় অংশ প্রাপ্ত হইয়া এবং অপর পুত্রগণের সঙ্গে সংসৃষ্টী না হইয়া পরলোকগমন করেন। কিন্তু, পিতা যদি কতক পুত্রের সহিত সংসৃষ্টী হইয়া মৃত হন, তাহা হইলে বিভাগানন্তর জাত পুত্র পিতার সহিত সংসৃষ্টী পুত্রগণের নিকট হইতে নিজের অংশ লাভ করিবে[১]। শেষোক্ত প্রকার পুত্র অপর পুত্রগণের নিকট হইতে ভাগ পাইবে। জীমূতবাহন স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, বিভাগের পূর্বে জাত পুত্রের পিতার প্রাপ্য অংশে কোন অধিকার নাই এবং বিভাগানন্তর জাত পুত্রের ভ্রাতৃগণের অংশে কোন অধিকার নাই[২]।

বিভাগানন্তর জাত পুত্রের প্রাপ্য অংশ সম্বন্ধে 'যাজ্ঞবাল্ক্যস্মৃতি'তে (২।৮।১২২) যে ব্যবস্থা আছে, জীমূতবাহনের মতে তাহা পৈতামহ সম্পত্তিতে প্রযোজ্য[৩]। নচেৎ, বিভাগের পরে জাত পুত্রের অপর পুত্রগণের অংশে কোন ভাগ থাকে না বলিয়া যে বিধান আছে, তাহার সহিত বর্তমান ব্যবস্থার বিরোধ উপস্থিত হয়।

প্রবাস যতকালেরই হউক, কোন পুত্র প্রত্যাগত হইলে তাহার প্রাপ্য অংশ সে পাইবেই।

যদি কোন পুত্র কুল পরিত্যাগ করিয়া প্রবাসেই জীবন যাপন করে, তাহা হইলে তাহার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ পর্যন্ত তাহার প্রাপ্য অংশের অধিকারী হইবে, অবশ্য তাহাদিগকে নিজেদের জন্ম ও নাম সম্বন্ধে প্রমাণ দিতে হইবে।

এই সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে কত প্রকার পুত্র সমাজে স্বীকৃত হইত তাহা বলা প্রয়োজন। প্রাচীন স্মৃতিকারেরা নিম্নলিখিত দ্বাদশবিধ পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। মনে হয়, জীমূতবাহন সকল প্রকার পুত্রকেই স্বীকার করিয়াছেন।

১ দা. ভা., ৭।২ ।
২ ঐ, ৭।৬ ।
৩ দা. ভা., ৭।১৩ ।

বিভিন্নপ্রকার পুত্র

(১) ঔরস

(২) পুত্রিকাসুত--অপুত্রক ব্যক্তি কর্তৃক পুত্রস্বরূপে মনোনীতা কন্যা অথবা ঐ কন্যার পুত্র হইলে সেই পুত্র তাহার পুত্র-রূপে গণ্য হইবে বলিয়া মনোনীত।

(৩) ক্ষেত্রজ— একের স্ত্রীতে অপর কর্তৃক নিয়োগপ্রথায় উৎপাদিত পুত্র।

(৪) গূঢ়জ— কাহারও অনুপস্থিতিতে তদীয় পত্নীতে অপর ব্যক্তি কর্তৃক উৎপাদিত পুত্র, এক্ষেত্রে পুত্রের জনক অজ্ঞাত।

(৫) কানীন— অবিবাহিতা কন্যার পুত্র। কন্যা যতদিন অবিবাহিতা থাকে ততদিন এই পুত্রের অধিকারী তাহার মাতামহ। কন্যা বিবাহিতা হইলে, এই পুত্র হইবে তাহার স্বামীর।

(৬) পৌনর্ভব— পুনর্বিবাহিতা বিধবার পুত্র।

(৭) দত্তক

(৮) ক্রীত— পিতামাতার নিকট হইতে কোন ব্যক্তি কর্তৃক ক্রীত।

(৯) কৃত্রিম— মাতাপিতৃহীন পুত্র যখন কোন ব্যক্তি কর্তৃক পুত্র স্বরূপে গৃহীত হয়।

(১০) দত্তাত্মা— মাতাপিতৃহীন বা মাতাপিতৃপরিত্যক্ত পুত্র যখন নিজেকে অপরের পুত্রস্বরূপ প্রদান করে।

(১১) সহোঢ়জ— বিবাহকালে অন্তঃসত্ত্বা নারীর গর্ভজাত পুত্র।

(১২) অপবিদ্ধ— কোন ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত মাতাপিতৃপরিত্যক্ত পুত্র।

পুত্রিকাপুত্র ও ঔরসপুত্রের মধ্যে বিভাগ

উভয়েই সবর্ণ হইলে সমান অংশ পাইবে।

ঔরস পুত্রের পূর্বে যদি পুত্রিকার পুত্র জন্মিয়া থাকে তাহা হইলেও সে ঔরসপুত্র অপেক্ষা অধিকতর অংশ পাইতে পারে না; কারণ, পুত্রিকা পুত্রেরই ন্যায় বলিয়া তৎপুত্র পৌত্রের ন্যায়। সুতরাং, পৌত্র কখনও পুত্র অপেক্ষা অধিকতর অংশ পাইতে পারে না।

তাহারা পরস্পর অসবর্ণ হইলে অসবর্ণ পুত্রের অংশ সম্বন্ধে পূর্বে যে ব্যবস্থা বলা হইয়াছে তাহাই প্রযোজ্য হইবে।

পুত্রিকা অপুত্রক অবস্থায় বিধবা হইলে অথবা বন্ধ্যা হইলে কোন অংশ পাইবে না, কারণ, তাহাতে পুত্রলাভের সঙ্কল্প করিয়াই পুত্রিকা পুত্রের ব্যবস্থা করা হয় এবং সে যদি পুত্রহীনাই হয় তাহা হইলে সে সাধারণ কন্যাবই ন্যায়।

একদিকে ঔরস ও অপর দিকে ক্ষেত্রজ প্রভৃতি পুত্রগণের মধ্যে বিভাগ

এরূপ ক্ষেত্রে, ক্ষেত্রজাদি পুত্র পিতার সবর্ণ হইলে এবং ঔরসপুত্রেব সমবর্ণ বা তদপেক্ষা উচ্চতরবর্ণ হইলে তাহারা ঔরস পুত্রের প্রাপ্য অংশেব এক তৃতীয়াংশ পাইবে[১]।

যখন ক্ষেত্রজাদি পুত্র পিতা অপেক্ষা নিম্নতর বর্ণেব কিন্তু ঔরস অপেক্ষা উচ্চতর বর্ণের হয়, তখন ক্ষেত্রজাদি পুত্র, গুণবান্ হইলে, ঔরস পুত্রেব অংশের $\frac{১}{৫}$ ভাগ পাইবে; নিগুর্ণ হইলে পাইবে $\frac{১}{৬}$।

যখন ক্ষেত্রজাদি পুত্র পিতা ও ঔরস পুত্র উভয়ের অপেক্ষা নিম্নতর বর্ণের হয়, তখন তাহারা শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারী হয়।

ঔরস পুত্রের অভাবে অন্যপ্রকার পুত্রেরাই পিতার সমগ্র সম্পত্তির অধিকারী হয়।

একদিকে ঔরস পুত্র ও অপরদিকে যদি এমন পুত্র থাকে যে পিতার অনুমতি ভিন্ন অপর ব্যক্তি কর্তৃক তৎপত্নীতে উৎপাদিত হইয়াছে, তাহা

১ দা. ভা., ১০।৭।

হইলে তাহারা নিজ নিজ বীজীর বা জনকের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে[১]।

উক্ত দ্বাদশবিধ পুত্রকে জীমূতবাহন, দেবলের প্রমাণবলে, নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন[২] :—

(ক) আত্মজ –নিজের দ্বারা উৎপাদিত :—

(১) ঔরস, (২) পৌনর্ভব, (৩) পুত্রিকা।

(খ) পরজ—অপরের দ্বারা উৎপাদিত।

(গ) লব্ধ—পুত্র স্বরূপে গৃহীত :—

(১) দত্তক, (২) ক্রীত, (৩) সহোঢ়জ, (৪) কানীন, (৫) কৃত্রিম।

(ঘ) যাদৃচ্ছিক—যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত :—

(১) অপবিদ্ধ, (২) স্বয়মুপাগত, (৩) গূঢ়জ।

ইহাদের মধ্যে, ঔরসাদি ছয় প্রকার পুত্র শুধু পৈতৃক সম্পত্তিরই নহে, সপিণ্ডাদি জ্ঞাতিদের সম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হয়; অন্যবিধ পুত্রেরা কেবল পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারে।

(৪) স্ত্রীধন

জীমূতবাহনের মতে, তাহাই স্ত্রীধন যাহাতে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ স্বত্ব আছে; অর্থাৎ, যাহা সে পতির অনুমতি ব্যতিরেকেই দান, বিক্রয় বা ভোগ করিতে পারে[৩]। সাধারণতঃ মাতাপিতা এবং পতি ভিন্ন অপর কাহারও নিকট হইতে অথবা মাতাপিতার এবং পতির কোন আত্মীয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত অথবা তাহার স্বোপার্জিত ধনে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধিকার থাকে না; তাহার স্বামীও ঐরূপ ধন ব্যবহার করিতে পারেন। সুতরাং, ঐরূপ ধন স্ত্রীধন নহে।

১ দা. ভা, ১০।১৬।

২ দা. ভা., পৃঃ ১৪৭ (শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের টীকাও দ্রষ্টব্য)।

৩ তদেব চ স্ত্রীধনং যত্র ভর্তৃতঃ স্বাতন্ত্র্যেণ দানবিক্রয়ভোগান্ কর্তু্মধিকরোতি—দা. ভা., ৪।১।১৮।

জীমূতবাহন কর্তৃক উদ্ধৃত নানা শাস্ত্রীয় বচন হইতে মনে হয়, তাঁহার মতে, স্ত্রীধন নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত :

(১) অধ্যগ্ন্যুপাগত—বিবাহকালীন অগ্নির সমক্ষে যাহা স্ত্রীলোককে প্রদত্ত হইয়াছে,

(২) আধিবেদনিক—দ্বিতীয়া স্ত্রীকে বিবাহ করিবার সময় পতি কর্তৃক প্রথমা পত্নীকে প্রদত্ত,

(৩) অন্বাধেয়— বিবাহের পরে স্ত্রীলোকের পতি ও পতির আত্মীয় কর্তৃক এবং পিতামাতা ও তাঁহাদের আত্মীয় কর্তৃক প্রদত্ত,

(৪) অধ্যাবাহনিক—স্ত্রীলোকের বিবাহের পরে যখন তাহাকে পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে নেওয়া হয় তখন তাহাকে যাহা প্রদত্ত হয়,

(৫) ভর্তৃদায়— পতিকর্তৃক দত্ত,

(৬) শুল্ক— বিবাহকালে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্বামীকে যাহা দেওয়া হয়[১],

(৭) সৌদায়িক— বিবাহের পূর্বে অথবা পরে পিতৃগৃহে এবং পতিগৃহে প্রাপ্ত,

(৮) উল্লিখিত ধন ছাড়া, স্ত্রীলোকের পিতা, মাতা, পতি বা ভ্রাতা কর্তৃক প্রদত্ত সর্বপ্রকার ধন।

মনু ষড়্‌বিধ স্ত্রীধনের কথা বলিয়াছেন[২]। এই সম্বন্ধে জীমূতবাহন বলিয়াছেন যে, মনূক্ত ছয়টি প্রকার উদাহরণস্বরূপ দেওয়া হইয়াছে মাত্র, বস্তুতঃ, নানা শাস্ত্রকার নানারূপ স্ত্রীধনের কথাই বলিয়াছেন এবং ইহার প্রকারভেদের কোন স্থিরতা নাই[৩]।

১ জীমূতবাহন বলিয়াছেন যে, এখানে 'বিবাহকালে' শব্দটি উদাহরণস্বরূপ প্রযুক্ত হইয়াছে, দাতার উদ্দেশ্যই এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীর স্বত্ব-উৎপাদনের কারণ, সময়বিশেষ নহে।

২ ম. স্মৃ., ৯।১৯৪।

৩ দা. ভা, ৪।১।১৮।

যদিও সাধারণ নিয়ম এই যে স্ত্রীধনে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ স্বত্ব আছে, তথাপি পতির নিকট হইতে প্রাপ্ত স্ত্রীধনরূপ স্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে সে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে না। কিন্তু, অপর কাহারও নিকট হইতে স্ত্রীধনস্বরূপ প্রাপ্ত স্থাবর সম্পত্তি সে সাধারণ স্ত্রীধনের ন্যায় যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে[১]।

সাধারণতঃ, পতি, পুত্র, পিতা ও ভ্রাতা প্রভৃতি কাহারও স্ত্রীধনে কোন স্বত্ব থাকে না। কিন্তু, নিম্নলিখিত অবস্থাগুলিতে পতি পত্নীর স্ত্রীধন ব্যবহার করিতে পারে :–

দুর্ভিক্ষ, ধর্মকার্য, ব্যাধি ও 'সম্প্রতিরোধক'[২]।

উক্ত অবস্থায় স্ত্রীধনে পতির এইটুকু অধিকার থাকিলেও সে যদি স্ত্রীধন গ্রহণের পরে অপর স্ত্রীকে নিয়া বাস করে এবং যাহার ধন নিয়াছে তাহাকে অবহেলা করে তাহা হইলে সে ঐ স্ত্রীধন প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য।

স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারের নিয়মগুলি নিম্নলিখিত কারণগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় :—

(১) স্ত্রীলোকের সন্তান থাকা বা না থাকা,

(২) যে পদ্ধতিতে স্ত্রীলোকের বিবাহ হইয়াছিল তাহা অনুমোদিত কি অননুমোদিত,

(৩) স্ত্রীধনের প্রকারভেদ।

কাহারও স্ত্রীধনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে পর পর ব্যক্তি অপেক্ষা পূর্ব পূর্ব ব্যক্তির দাবী অধিকতর।

(১) পুত্র ও অবিবাহিত কন্যা—সমান অংশের ভাগী[৩]। ইহাদের মধ্যে একের অভাবে অপর সমস্ত সম্পত্তিই পাইবে[৪]।

১ দা. ভা., ৪।১।২৩।

২ ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত উত্তমর্ণ কর্তৃক অধমর্ণের স্নানভোজনাদিতে বাধা সৃষ্টি।

৩ দা. ভা., ৪।২।২। শুধু অবিবাহিতা কন্যাই স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারিণী হইবে —এই মত জীমূতবাহন সমর্থন করেন না (দা. ভা., ৪।২।৭)।

৪ দা. ভা., ৪।২।৯।

(২) বিবাহিতা কন্যা— এইরূপ অনেক কন্যা থাকিলে পুত্রবতী এবং 'সম্ভাবিতপুত্রা' কন্যার দাবী অগ্রগণ্য, এইরূপ উভয়বিধা কন্যা তুল্যাংশে উত্তরাধিকারিণী হইবে[১]। বিধবা এবং বন্ধ্যা কন্যা, জীমূতবাহনের মতে, মাতাব স্ত্রীধনেব উত্তরাধিকাব লাভ করে না।

(৩) পৌত্র,

(৪) দৌহিত্র,

(৫) বন্ধ্যা ও বধবা কন্যা।

উল্লিখিত নিয়মটি সাধারণরূপে পালিত হইবে। কিন্তু, বিশেষ বিশেষ প্রকারের স্ত্রীধনের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ নিয়মও লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

'যৌতক' পদটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এইরূপে দেওয়া হইয়াছে:—

যু মিশ্রণে ইতি ধাতোর্যুত ইতি পদং মিশ্রতাবচনং, মিশ্রতা চ স্ত্রীপুরুষয়ো-রেকশরীরতা, ববাহাচ্চ তত্তবতি, অতো বিবাহকাললব্ধং যৌতকম্।

'যু' ধাতুর অর্থ মিশ্রণ বা যোগ করা। সুতরাং, 'যুত' পদেব অর্থ যুক্ত বা মিশ্রিত। স্ত্রীপুরুষের মিশ্রণ অর্থ তাহাদের একশরীরত্বলাভ। বিবাহের দ্বারাই ইহা হয় বলিয়া বিবাহকালে স্ত্রীলোককে যাহা প্রদত্ত হয় তাহা যৌতক। পরিণয়কালে প্রদত্ত বলিয়া ইহা 'পাবিণায্য' নামেও অভিহিত হয়[২]। ইহা পূর্বলিখিত অধ্যগ্ন্যুপাগত শ্রেণী হইতে অভিন্ন।

১ দা. ভা.। এই ব্যাপারেও প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানের যোগ্যতাই উত্তরাধিকারের নিয়ামক। দৌহিত্র পিণ্ডদানের অধিকারী বলিয়া পুত্রবতী কন্যা এবং যে কন্যার পুত্র লাভের সম্ভাবনা আছে, তাহার দাবীই অগ্রগণ্য। এই কারণেই বন্ধ্যা ও বিধবা কন্যাব দাবী সর্বশেষে গ্রাহ্য।

২ দা. ভা, ৪।২।১৪।

শুধু কন্যারাই মাতার স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারিণী হইবে—গৌতম নারদ প্রভৃতির এই বিধান, জীমূতবাহনের মতে, একমাত্র যৌতকশ্রেণীর স্ত্রীধনে প্রযোজ্য[১]।

বিবাহের পরেও পিতৃদত্ত স্ত্রীধনে শুধু কন্যারই অধিকার জীমূতবাহন স্বীকার করিয়াছেন[২]।

যৌতক স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে পর পর ব্যক্তি অপেক্ষা পূর্ব পূর্ব ব্যক্তির দাবী অগ্রগণ্য :—

(১) অবিবাহিতা অ-বাগ্‌দত্তা কন্যা,

(২) অবিবাহিতা বাগ্‌দত্তা কন্যা,

(৩) বিবাহিতা কন্যা,

(৪) পুত্র।

এক্ষেত্রে, সর্বপ্রকার কন্যার অভাবে পুত্রের দাবী গ্রাহ্য[৩]।

উত্তরাধিকারের উল্লিখিত ক্রম তখনই প্রযোজ্য যখন যাহার স্ত্রীধন সে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য—এই কয়টি অনুমোদিত বিবাহপদ্ধতির কোন একটি পদ্ধতিতে বিবাহিতা হয়। রাক্ষস, আসুর, পৈশাচ ও গান্ধর্ব—এই নিন্দিত পদ্ধতিগুলির কোন এক পদ্ধতিতে যদি কোন স্ত্রীলোক বিবাহিত হয়, তাহা হইলে তাহার স্ত্রীধন তাহার 'পিতৃগামী' হইবে।

বিবাহের ও স্ত্রীধনের প্রকারভেদ অনুসারে এইরূপ নারীর স্ত্রীধনের উত্তরাধিকার নির্ণীত হইয়া থাকে। জীমূতবাহন বলিয়াছেন যে, সন্ততিহীনা নারীর স্ত্রীধনের উত্তরাধিকার-বিধি 'অতিগহন'[৪] অর্থাৎ অত্যন্ত জটিল। নিম্নে মোটামুটি নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ হইল।

'অন্বাধেয়' শ্রেণীর স্ত্রীধনের উত্তরাধিকার নিম্নলিখিত ক্রমে হইবে ; এই তালিকায় পূর্ব পূর্ব ব্যক্তির দাবী পর পর ব্যক্তি অপেক্ষা অগ্রগণ্য :—

১ দা. ভা., ৪।২।১৪।
২ ঐ, ৪।২।১৫।
৩ ঐ, ৪।২।২৫।
৪ দা. ভা., ৪।৩।৪২।

সহোদর ভ্রাতা, মাতা, পিতা, পতি[১]। কোন কোন মতে, মাতা অপেক্ষা পিতার দাবী অগ্রগণ্য, কিন্তু জীমূতবাহন এই মত সমর্থন করেন না বলিয়াই মনে হয়।

শুল্করূপ স্ত্রীধনের ক্ষেত্রেও উক্ত ক্রম প্রযোজ্য। কিন্তু, আসুর বিবাহে যে শুল্ক দেওয়া হয় তাহা, জীমূতবাহনের মতে, এই নিয়মের বহির্ভূত।

যদিও যাজ্ঞবল্ক্য (২।৮।১৪৫) ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য—এই চতুর্বিধ বিবাহপদ্ধতি অনুমোদন করিয়াছেন, তথাপি মনুর (৯।১৯৬) প্রমাণ অনুসারে, এক্ষেত্রে জীমূতবাহন গান্ধর্ব বিবাহকেও যোগ করিয়াছেন। এই পঞ্চ প্রকার বিবাহে, কোন নারীর সন্তান না থাকিলে, তদীয় স্ত্রীধন তৎপতিই পাইবেন[২]। বিশ্বরূপের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া জীমূতবাহন বলিয়াছেন যে, শুধু বিবাহকালে স্ত্রীলোক কর্তৃক প্রাপ্ত স্ত্রীধনের ক্ষেত্রেই এই বিধি প্রযোজ্য।

রাক্ষস, আসুর ও পৈশাচ—এই ত্রিবিধ বিবাহে, পতি জীবিত থাকিলেও, স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারিণী হইবেন মাতা, তদভাবে পিতা[৩]।

(৫) দায়াধিকারে বঞ্চিত ব্যক্তিগণ

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সম্পত্তির উত্তরাধিকারের অযোগ্য:

(ক) অপপাত্রিত—যে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে এবং সেই হেতু যাহার সংসর্গে জলপান নিষিদ্ধ হইয়াছে।

(খ) যে বেদজ্ঞ হইয়াও পিতৃপুরুষের পারলৌকিক কার্য করে না। এই সম্বন্ধে জীমূতবাহন স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, পিতার উদ্দেশ্যে পারলৌকিক কৃত্যের বেতন স্বরূপই পুত্র তদীয় সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়।

১ পতির পরে উত্তরাধিকার ক্রম অতি জটিল (দা ভা ৭। ৩১ ইত্যাদি)।

২ দা ভা, ৪।৩।৩।

৩ ঐ, ৪।৩।৬।

যেখানে সেই কৃত্যের অনুষ্ঠানই নাই, সেখানে বেতনেরও প্রশ্ন উঠে না[১]।

। নিম্নলিখিত শারীরিক ও মানসিক বিকারযুক্ত ব্যক্তিগণ:—

ক্লীব[২], জন্ম হইতে অন্ধ, জন্ম হইতে বধির, উন্মত্ত, জড়[৩], মূক 'নিরিন্দ্রিয়' বা বিকলেন্দ্রিয়, পতিত, পতিতের পুত্র, 'অচিকিৎস্যরোগার্ত'[৪], কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, 'সন্ন্যাসী' অর্থাৎ সংসারত্যাগী, 'প্রব্রজ্যাবসিত' বা যে কোন ধর্মসম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়াছে

[illegible] পতিত ব্যক্তি ও তৎপুত্র ভিন্ন উক্তরূপ অনংশক ব্যক্তিগণ গ্রাসাচ্ছাদনের দ্বারা পালনীয়।

'পিতৃদ্বিট্' ও 'মাতৃদ্বিট্' এবং উপপাতকী এই দ্বিবিধ ব্যক্তিও সম্পত্তির উত্তরাধিকারে বঞ্চিত। [illegible] সম্বন্ধে জীমূতবাহনের মতামত স্পষ্ট নহে

(ঘ) 'অক্রম বিবাহজাত পুত্র'

হীনবর্ণা কোন নারীকে বিবাহ করিবার পূর্বে যদি কেহ উত্তমবর্ণা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ উভয় বিবাহই ক্রমভঙ্গদোষে দুষ্ট হয়। ঐ উভয়প্রকার স্ত্রীতে [illegible] ব্যক্তিদ্বারা নিয়োগোৎপাদিত পুত্র

তৎকর্মবেতনং ধনসম্বন্ধিত্বম্ অতস্তদকৃত্বা ক্রতো বেতনম —দা ভা ৫।৮

২ জীমূতবাহন কর্তৃক উদ্ধৃত কাত্যায়নের শ্লোকে ক্লীবের লক্ষণ এইরূপ:—

ন মূত্রং ফেনিলং যস্য বিষ্ঠা চাপ্সু নিমজ্জতি
মেঢ্রশ্চোন্মাদশুক্রাভ্যাং হীনঃ ক্লীবঃ স উচ্যতে॥ দা ভা ৫।৮।

৩ বেদবিদ্যাগ্রহণে অক্ষম।

৪ দায়ভাগের ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে বিভাগের পরে যদি এইরূপ রোগ হইতে মুক্তিলাভ হয় তাহা হইলে এরূপ ব্যক্তি অংশভাগী হইবে।

৫ দা ভা ৫।১৫।

পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে না। 'অক্রম' বিবাহেও পতি কর্তৃক সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপাদিত পুত্র উত্তরাধিকারী হইবে। আবার, শুদ্ধক্রমে বিবাহ হইলে, অসবর্ণ পতি কর্তৃক উৎপাদিত পুত্রও ধনাধিকারী হইবে।

ক্লীবাদি দায়াধিকারবর্জিত ব্যক্তিগণের দোষরহিত পুত্র[১], পিতা স্বাভাবিক হইলে তিনি যে অংশ পাইতেন, সেই অংশই পাইবে[২]। ক্লীবাদির কন্যাগণ বিবাহকাল পর্যন্ত প্রতিপালনীয়া এবং নিঃসন্তান পত্নীগণ যাবজ্জীবন পোষণীয়া[৩]।

(৬) অবিভাজ্য সম্পত্তি

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত প্রকার সম্পত্তি বিভাগের অযোগ্য :—

(ক) বিদ্যালব্ধ[৪] –কোন সমস্যা সমাধানের ফলে প্রাপ্ত পারিতোষিক, শিষ্যদত্ত দ্রব্য, পৌরোহিত্যের দক্ষিণা, বিদ্যাপ্রদর্শনের ফলে লব্ধ, চিত্রকর ও স্বর্ণকার প্রভৃতির দ্বারা শিল্পচাতুর্য প্রদর্শনের ফলে প্রাপ্ত। জীমূতবাহন 'বিদ্যা' শব্দের অর্থে বুঝিয়াছেন, যে কোন বিদ্যা বা কৌশল। 'বিদ্যালব্ধ' পদের অর্থ অধ্যাপনাদ্বারা লব্ধ—এই মত জীমূতবাহন গ্রহণ করেন নাই[৫]। এই প্রসঙ্গে জীমূতবাহন ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, কোন ভ্রাতা পিতৃসম্পত্তির ব্যবহার করিয়া বা না করিয়া যে বিদ্যা অর্জন করিয়াছেন, তাহাদ্বারা লব্ধ ধন তাহার অপর বিদ্যাসম্পন্ন ভ্রাতৃগণের মধ্যে ভাগ করিতে হইবে[৬], বিদ্যাহীন ভ্রাতৃগণের মধ্যে নহে।

১ ক্লীবের ক্ষেত্রজ পুত্র থাকিতে পারে।
২ দা. ভা., ৫।১৯।
৩ ঐ।
৪ ইহার সহিত তুলনীয় Hindu Gains of Learning Act, 1930।
৫ দা. ভা., ৬।২।১৭।
৬ ঐ, ৬।১।১৭।

(খ) পিতৃসম্পত্তি বা যৌথসম্পত্তির ব্যবহার না করিয়া এবং অপর ভ্রাতৃগণের সাহায্য ব্যতিরেকে অর্জিত।

(গ) পিতামাতা, মিত্র অথবা কোন স্নেহপরায়ণ আত্মীয়কর্তৃক প্রদত্ত এবং বিবাহকালে প্রাপ্ত।

(ঘ) স্বীয় বীরত্বের দ্বারা লব্ধ।

(ঙ) যে পৈতৃক বা পূর্বপুরুষের লুপ্ত সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে।

(চ) পিতার জীবিতকালে কোন ভ্রাতা কর্তৃক বাসগৃহের সীমার মধ্যে নির্মিত গৃহ বা উদ্যান।

(৭) অপুত্রক ব্যক্তির সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার

এই বিষয়টি অতিশয় জটিল। এই সম্বন্ধে নানাশাস্ত্রের মতামত অসংখ্য। বিবিধ বচনাদি আলোচনা করিয়া জীমূতবাহন যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা নিম্নলিখিতরূপ।

সাধারণ নিয়ম এই যে, অপুত্রক ব্যক্তির অভাবে তদীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবেন তাহার স্ত্রী। এখানে জীমূতবাহন 'পুত্র' শব্দের অর্থ করিয়াছেন পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র। এই নিয়মেরও মূলে পারলৌকিক কার্যে অধিকার, প্রপৌত্র পর্যন্তই পিণ্ডদানের অধিকারী[১]। সুতরাং, নিয়মটি দাঁড়াইল এই যে, কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পরে, তাহার পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্র না থাকিলে, তদীয় স্ত্রী তৎসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবেন। এই সম্বন্ধে একটি মত এই যে, স্ত্রী শুধু স্বীয় পালনযোগ্য ধন পাইবেন। জীমূতবাহন এই মত বর্জন করিয়া বলিয়াছেন যে, স্ত্রী সম্পূর্ণ সম্পত্তিই পাইবেন[২]।

কাহারও কাহারও মতে, স্ত্রীর উক্তরূপ অধিকার শুধু সেই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেখানে তাঁহার স্বামী অপর ভ্রাতৃগণ হইতে পৃথক্ বা অসংসৃষ্টী ছিলেন। স্বামী তাঁহার ভ্রাতৃগণের সহিত একান্নভুক্ত বা সংসৃষ্টী থাকিলে তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় তাঁহার ভ্রাতারা। জীমূতবাহন এই মত

১ দা ভা, ১১।১।৩১।

২ কৃৎস্নধনগোচর এব পত্ন্যা অধিকারঃ —দা ভা, ১১। ১ ।২৬।

সমর্থন না করিয়া বলিয়াছেন যে, স্বামী অপর ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত থাকুক বা না থাকুক, তাঁহার সম্পত্তি তাঁহার স্ত্রীরই প্রাপ্য[১]।

স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর তখনই শুধু উত্তরাধিকার থাকে যখন তিনি বৈধব্যের পরে ব্রতাদির দ্বারা পতির পারলৌকিক সদ্গতি কামনা করেন, নচেৎ নহে।

বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রী সম্বন্ধে জীমূতবাহনের মত এই যে, পতির সবর্ণা স্ত্রী, সর্বকনিষ্ঠা হইলেও, জ্যেষ্ঠা বলিয়া গণ্য হইবেন[২], কারণ, বৈয়াকরণিক অর্থে পত্নীত্ব[৩] শুধু তাঁহারই —কেবল তিনিই স্বামীর সহিত যজ্ঞাদি সম্পাদনে সক্ষম[৪]। অপর স্ত্রীগণ অপেক্ষা সবর্ণা স্ত্রীরই উত্তরাধিকারের দাবী অগ্রগণ্য। সবর্ণা স্ত্রীর অভাবে, তদপেক্ষা ঠিক নিম্নতর বর্ণের স্ত্রীর অধিকার অগ্রগণ্য। জীমূতবাহন স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, দ্বিজের শূদ্রা স্ত্রী তদীয় সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী কখনই হন না[৫]। যে স্ত্রীগণ 'পত্নী' নহেন, তাঁহারা শুধু নিজেদের ভরণপোষণযোগ্য ধন পাইবেন[৬]।

স্ত্রীকর্তৃক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত স্বামীর সম্পত্তিতে তাঁহার সম্পূর্ণ স্বত্ব হয় না, নিম্নলিখিত সর্তাধীনে তাঁহার ভোগস্বত্ব জন্মে মাত্র :-

(১) তিনি উহার দান, বিক্রয় বা 'আধান'[৭] করিতে পারেন না।

(২) তিনি উহা যথেচ্ছ ভোগ করিতে পারেন না, স্বর্গীয় পতির হিতার্থে তিনি উহার ব্যবহার করিতে পারেন।

১ দা ভা, ১১।১।৪৭।
২ ঐ, ১১।১।৪৭।
৩ পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে —পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'র সূত্র (৪।১।৩৩)।
৪ দা. ভা, ১১।১।৪৭।
৫ ঐ।
৬ ঐ, ১১।১।৪৮।
৭ রেহাণ (mortgage) —ঐ, ১১।১।৫৬।

(৩) পতির পারলৌকিক কৃত্যের জন্য প্রয়োজন হইলে তিনি ঐ সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিতে পারেন[১]। জীবনধারণের অন্য উপায়ের অভাবেও তিনি উহার বিক্রয়াদি করিতে পারেন।

(৪) কন্যার বিবাহের জন্য পতির সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ তাঁহাকে দিতে হইবে[২]।

(৫) পতির ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়ার নিমিত্ত 'ভর্তৃপিতৃব্যাদিকে' 'অর্থানুরূপ' উপহারাদি দান করিতে হইবে[৩]।

স্ত্রীর অভাবে অপুত্রক ব্যক্তির সম্পত্তি পাইবে তাহার কন্যা। কন্যাগণের মধ্যে অবিবাহিতা কন্যার দাবী অগ্রগণ্য। বিবাহিতা কন্যাগণের মধ্যে পুত্রহীনা অপেক্ষা পুত্রবতীর দাবী অধিকতর। সকল বিবাহিতা কন্যাই পুত্রহীনা হইলে যাহার পুত্রলাভের সম্ভাবনা আছে তাহার দাবী অগ্রগণ্য[৪]। বন্ধ্যা বিধবা কন্যা এবং যে কন্যার পুত্রলাভের সম্ভাবনা নাই সে এই ব্যাপারে বর্জনীয়।

কন্যার উত্তরাধিকার সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য বিধান এই যে, পিতার একমাত্র সবর্ণা কন্যাই তদীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে। বিবাহিতা কন্যা তখনই পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারের যোগ্যা হয়, যখন পিতার সবর্ণ ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাহ হয়। এই নিয়মটির যুক্তি এই যে, পিতার অসবর্ণা কন্যার পুত্র অথবা অসবর্ণ ব্যক্তির সহিত বিবাহিতা কন্যার পুত্র মাতামহের পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদনে অক্ষম, সুতরাং, তাদৃশী কন্যা উত্তরাধিকারে বর্জিতা[৫]।

১ দা. ভা., ১১।১।৬১।

২ ঐ, ১১।১।৬৬।

৩ 'পিতৃব্যাদি' শব্দে জীমূতবাহন যে আত্মীয়গণ বুঝিয়াছেন তাহাদের পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য দা. ভা., ১১।১।৬৩-৬৪।

৪ দা. ভা., ১১।২।১১ হইতে মনে হয়, জীমূতবাহনের মতে, পুত্রবতী ও পুত্রলাভের সম্ভাবনাযুক্তা কন্যার দাবী সমান।

৫ দা. ভা., ১১।২।৯।

উত্তরাধিকারের যোগ্য। কন্যার অভাবে তৎপুত্র মাতামহ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে।

দৌহিত্রের অভাবে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি পাইবেন তাহার পিতা[১]। পিতা অপেক্ষা দৌহিত্রের দাবী অধিকতর হওয়ার কারণও পারলৌকিক ক্রিয়াতে দৌহিত্রের অধিকতর যোগ্যতা।

পিতার পরেই মাতার স্থান। কাহারও কাহারও মতে, শাস্ত্রে পিতা অপেক্ষা মাতা অধিকতর সম্মানার্হা বলিয়া এই ব্যাপারে পিতা অপেক্ষা মাতার দাবী অগ্রগণ্য। জীমূতবাহন এই মতকে উপহাস করিয়া বলিয়াছেন যে, সম্মানের মাত্রাই যদি উত্তরাধিকারের যোগ্যতার মানদণ্ড হইত, তাহা হইলে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তদীয় সম্পত্তিতে তাহার পিতা অপেক্ষা আচার্যের দাবী হইত অধিকতর, ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্র অপেক্ষা পিতৃব্যাদির দাবী হইত অগ্রগণ্য[২]।

উল্লিখিত উত্তরাধিকারিগণের অভাবে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি পাইবে তদীয় ভ্রাতা। কোন কোন মতে, ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র তুল্যাংশে উক্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবে। জীমূতবাহন এই মত খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন যে, মৃতব্যক্তির বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পর্যন্ত কোন উত্তরাধিকারী যদি না থাকে, তাহা হইলে তখনই শুধু ভ্রাতুষ্পুত্রের দাবী গ্রাহ্য[৩]। এ ব্যাপারেও প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে পারলৌকিক ক্রিয়ার যোগ্যতাই উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রিত করিবে; মৃতব্যক্তির ভ্রাতুষ্পুত্র অপেক্ষা ভ্রাতারই এই যোগ্যতা অধিকতর।

বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অপেক্ষা সহোদর ভ্রাতার দাবী অধিকতর।

১ দা. ভা, ১১।৩।১।

২ ঐ, ১১।৪।৩। 'উৎপাদকব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা' (ম. স্মৃ., ২।১৪৬) —পিতা অপেক্ষা আচার্যের অধিকতর সম্মান সম্বন্ধে জীমূতবাহন মনুর এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৩ সপত্নভ্রাতৃপর্যন্তাভাবে এব ভ্রাতৃপুত্রাণামধিকারঃ কথিতঃ —দা. ভা., ১১।৫।৬।

সংসৃষ্ট ভ্রাতৃগণ সম্বন্ধে জীমূতবাহন নানা শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া নিম্নলিখিত ক্রম নির্ধারণ করিয়াছেন :—

(১) সহোদর ভ্রাতৃগণের মধ্যে অসংসৃষ্ট অপেক্ষা সংসৃষ্ট ভ্রাতার দাবী অধিকতর।

(২) অসংসৃষ্ট সহোদর ভ্রাতা ও সংসৃষ্ট বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তুল্যাংশে অধিকারী।

(৩) বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে অসংসৃষ্ট অপেক্ষা সংসৃষ্টের দাবী অধিকতর।

বৈমাত্রেয় ভ্রাতাব পুত্র অপেক্ষা সহোদর ভ্রাতার পুত্রের যোগ্যতা অধিকতর। জীমূতবাহনেব মতে, মৃতব্যক্তির পারলৌকিক কৃত্যে তদীয় পিতৃব্য অপেক্ষা ভ্রাতুষ্পুত্রের যোগ্যতা অধিকতর বলিয়া ভ্রাতার অভাবে ভ্রাতুষ্পুত্রই তদীয় সম্পত্তিব উত্তরাধিকারী হইবে।

ভ্রাতুষ্পুত্রেব অভাবে মৃতব্যক্তির সম্পত্তির দায়ক্রমও জীমূতবাহন নিধারণ করিযাছেন। গ্রন্থবিস্তারভয়ে ঐ দায়ক্রম বর্তমানে আলোচিত হইল না[১]। এখানে উল্লেখযোগ্য এহ যে, এই দায়ক্রমের মূলেও জীমূতবাহন মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে পারলৌাকক ক্রিয়াকেহ মুখ্য কারণ বলিয়া নির্দেশ কারয়াছেন অর্থাৎ, পারলৌকিক ক্রিয়াতে যাহার যেমন যোগ্যতা উত্তরাধিকারেও তাহার তেমন দাবী।

জীমূতবাহন কর্তৃক নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে কেহই যদি না থাকে, তাহা হইলে সম্পত্তি রাজগামী হইবে। জীমূতবাহন বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণের সম্পত্তিতে এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না। কিন্তু, উত্তরাধিকারী না থাকিলে ব্রাহ্মণের সম্পত্তির গতি কি হইবে সেই সম্বন্ধে জীমূতবাহনের মত স্পষ্ট নহে[২]।

১ বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দা. ভা., একাদশ অধ্যায়, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

২ দা. ভা., ১১।৬।৩৪।

বানপ্রস্থ, যতি ও আজীবন ব্রহ্মচারীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার-ক্রম নিম্নলিখিতরূপ :—

(১) একাশ্রমী, (৩) আচার্য,
(২) সতীর্থ, (৪) সৎশিষ্য,
(৫) ধর্মভ্রাতা।

ইঁহাদের মধ্যে পূর্ব পূর্ব ব্যক্তির দাবী উত্তরোত্তর ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর।

'উপকুর্বাণ' ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকারী হইবেন পিত্রাদি।

(৮) সংসৃষ্টী ব্যক্তিগণের সম্পত্তির বিভাগ

বিভাগের পরে যদি কেহ পিতা, ভ্রাতা বা পিতৃব্যের সহিত প্রীতিবশতঃ মিলিত হইয়া বাস করে, তাহা হইলে তাহাকে বলা হয় সংসৃষ্টী বা সংসৃষ্ট।

জীমূতবাহন কর্তৃক উদ্ধৃত মনুর শ্লোকানুসারে[১] সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে সম্পত্তির বিভাগ হইলে সকলেই তুল্যাংশে অধিকারী হইবে, জ্যেষ্ঠভ্রাতা অতিরিক্ত কিছু পাইবে না। জীমূতবাহন বিধান করিয়াছেন যে, এই নিয়ম সবর্ণ ভ্রাতৃগণের পক্ষে প্রযোজ্য। সবর্ণ ও অসবর্ণ ভ্রাতৃগণ সংসৃষ্ট হইয়া পুনরায় সম্পত্তির বিভাগ করিলে সাধারণ বিভাগের নিয়ম প্রযোজ্য হইবে[২]।

(৯) বিভাগের পরে আবিষ্কৃত প্রচ্ছন্ন সম্পত্তির বিভাগ

বিভাগকালে কোন অংশীদার কর্তৃক প্রচ্ছন্ন সম্পত্তি বিভাগের পরে আবিষ্কৃত হইলে উহা সকল অধিকারীই সবর্ণ অসবর্ণ নির্বিশেষে তুল্যাংশে পাইবে, জ্যেষ্ঠভ্রাতা অতিরিক্ত কিছু পাইবে না[৩]।

কোন কোন মতে, যে অংশভাগী সম্পত্তিটি প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিল, সে চৌর্যের অপরাধে কোন অংশই পাইবে না, বা পাইলেও অপরের অংশ অপেক্ষা কম পাইবে। এই মত জীমূতবাহন গ্রহণ করেন নাই; কারণ

১ ৯।২১০।
২ দা. ভা., ১২।২।
৩ ঐ, ১৩।২।

তাঁহাব মতে, যে সম্পত্তিতে নিজেবও অংশ আছে তাহা প্রচ্ছন্ন বাখিলে চৌর্য হইতে পাবে না[১]।

বন্ধু কর্তৃক কোন সম্পত্তি অপহৃত হইয়া থাকিলে সামাদি উপায়ের দ্বাবা উহা ফিবিয়া পাওয়াব চেষ্টা কবা কর্তব্য, বলপ্রয়োগে নহে। অবিভক্ত অবস্থায় যদি কেহ স্বীয় অংশেব অধিক ভোগ কবিয়া থাকে তাহা হইলে উহা তাহাব নিকট হইতে নেওয়া হইবে না[২]।

১০) বিভাগ সম্বন্ধে সন্দেহনিরসন

কোন সম্পত্তিব বভাগেব পবে বিভাগ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে, জীমূতবাহনেব মতে, সাক্ষী, লিখিত ও অনুমানাদি দ্বাবাই বিভাগ প্রমাণ কবিতে হইবে। সাক্ষী অপেক্ষা লিখিতেব এবং অনুমান অপেক্ষা সাক্ষীব প্রমাণেব প্রাবল্য হইবে[৩]।

সপিণ্ড, বন্ধু ও উদাসীন[৪] ব্যক্তিগণেব মধ্যে পূর্ব পর্ব ব্যক্তি সাক্ষী হিসাবে উত্তবোত্তব ব্যক্তি অপেক্ষ অধিকতব প্রামাণ্য।

উক্ত 'লিখিত' শব্দে বুঝায 'ভাগলেখ্য'[৫] অর্থাৎ বিভাগেব দলিল deed of partition)

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অনুমানেব আশ্রয গ্রহণ কবিতে হইবে:—

এক ভ্রাতা কর্তৃক অপব ভ্রাতাকে গৃহদান ও অপব ভ্রাতাব গ্রহণ, ঋণাদি গ্রহণকালে এক ভ্রাতা কর্তৃক অপব ভ্রাতাব প্রতিভূস্বরূপ নিয়োগ, ভ্রাতৃগণেব মধ্যে বম্পব ঋণদান, ঋণগ্রহণ ইত্যাদি[৬]।

১ দা ভা, ত্রয়োদশ অধ্যায।

২ সামাদিনা দাপ্যো ন বলাৎ, অবিভক্তেন তু যদধিকং ভুক্তং তদসৌ ন দাপ্যঃ—দা ভা, ১৩।৭।

৩ দা ভা, ১৪।৬, ১১।

৪ নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তি।

৫ দা ভা, ১৪।১ (শ্রীকৃষ্ণেব ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে 'ভোগলেখ্য'ও বলিযাছেন)।

৬ দা ভা, ১৪।৯।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক প্রভাব[১]

বাংলাদেশের স্মৃতিনিবন্ধগুলিতে পুরাণের প্রমাণ ও পৌরাণিক শ্লোকাদির উদ্ধৃতি অসংখ্য। প্রশ্ন হইতে পারে—এই ব্যাপক পৌরাণিক প্রভাবের কারণ কি?

জনসাধারণের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ব্যাপকভাবে প্রসারের চেষ্টাই পুরাণ-সাহিত্য সৃষ্টির মূল কারণ। স্ত্রীলোক ও শূদ্র প্রভৃতি যাহাদের বৈদিকধর্মচর্যার অধিকার ছিল না, তাহাদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিল পুরাণ। কালক্রমে পুরাণগুলি অতিশয় জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং সংস্কার, প্রায়শ্চিত্ত ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপারে পুরাণপ্রোক্ত রীতিনীতি ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হইয়াছিল। ফলে, সমাজশাসক স্মার্তগণ পুরাণের প্রমাণ স্বীয় নিবন্ধসমূহে স্বীকার করিতে বাধ্য হন। যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় প্রাচীন স্মৃতিকারও পুরাণকে ধর্মের অন্যতম উৎস বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন[২]। 'আপস্তম্বীয়ধর্মসূত্রে' প্রামাণ্যগ্রন্থ স্বরূপে পুরাণের

১ ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণের পারস্পরিক সম্বন্ধের বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য :—

(১) হি. ধ., ১,পৃঃ ১৬০-১৬৭,

(২) Indian Culture, Vol I, No. 4 (আর. সি হাজরা-রচিত প্রবন্ধ — Puranas in the History of Smriti) ।

বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধে তান্ত্রিক প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ডাঃ হাজরার প্রবন্ধ :—

(১) এ্যা. ভা. ই., ১৫শ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ ভাগ,

(২) ই. হি কো., ৯ম বর্ষ ,পৃঃ ৬৭৮-৭০৪ ।

২ যা. স্মৃ , ১।১।৩।

উল্লেখ আছে[1]। এই ধর্মসূত্র সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ৬০০ হইতে ৩০০ অব্দের মধ্যে কোন কালে রচিত হইয়াছিল[2]। সুতরাং, পুরাণগুলি স্মৃতিসংহিতা-সমূহের মাধ্যমে স্মৃতিনিবন্ধ গ্রন্থাবলীকে প্রভাবিত করিয়াছিল বলিয়া ডাঃ হাজরার সিদ্ধান্ত[3] যুক্তিসহই মনে হয়।

বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধসমূহে 'ব্রহ্ম', 'মৎস্য' ও 'বিষ্ণু' প্রভৃতি পুরাণগুলির প্রভাব বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়। এইগুলি ছাড়া, নিম্নলিখিত পুরাণগুলির উল্লেখ ও উহাদের বচনের উদ্ধৃতি এই দেশের নিবন্ধগ্রন্থাবলীতে গণনাতীত:—

অগ্নি, আদি, কালিকা, কূর্ম, গরুড়, দেবী, নরসিংহ, নন্দী, নন্দিকেশ্বর, নারদ, নৃসিংহ, পদ্ম, বৃহন্নন্দিকেশ্বর, বৃহন্নারদীয়, ব্রহ্মবৈবর্ত, ব্রহ্মাণ্ড, ভগবতী, ভবিষ্য, ভবিষ্যোত্তর, মহাব্রহ্ম, মার্কণ্ডেয়, লিঙ্গ, বরাহ, বামন, বায়ু, শাম্ব, স্কন্দ।

রঘুনন্দনের 'স্মৃতিতত্ত্বে' (২য় ভাগ, পৃঃ ৩৩০ ও ৫৫৭) 'স্বল্পমৎস্যপুরাণ' নামক একটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। ইহা সম্ভবতঃ 'মৎস্যপুরাণে'র একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। রঘুনন্দনের 'দুর্গাপূজাতত্ত্বে' (পৃঃ ৮) একটি 'দুষ্প্রাপ্য' 'কালিকাপুরাণে'র উল্লেখ আছে।

এই দেশের স্মৃতিনিবন্ধসমূহে, বিশেষতঃ রঘুনন্দনের গ্রন্থাবলীতে, তান্ত্রিক প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। তান্ত্রিক প্রভাব সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রাচীনতর নিবন্ধগুলি অপেক্ষা পরবর্তী গ্রন্থসমূহে ইহা স্পষ্টতর। বস্তুতঃ, শূলপাণি ভিন্ন প্রাক-রঘুনন্দন কোন নিবন্ধকার একটি তন্ত্রগ্রন্থেরও উল্লেখ করেন নাই, যদিও তাঁহাদের রচিত কোন কোন গ্রন্থে কিয়ৎপরিমাণের তান্ত্রিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শূলপাণিও মাত্র কয়েকটি নিবন্ধে তন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। রঘুনন্দন-রচিত গ্রন্থগুলিতেই বহু তন্ত্রের উল্লেখ ও উদ্ধৃতি রহিয়াছে।

১ বুলারের সংস্করণ, ২।৯।২৪।৬।
২ হি. ধ., ১, পৃঃ ৪৫।
৩ Studies in the Puranic Records ইত্যাদি, পৃঃ ২৬৪।

রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ তন্ত্রোক্ত আচার অনুষ্ঠানাদির বিরোধী ছিলেন। সুতরাং, ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্তম্ভস্বরূপ স্মৃতিকারগণ কর্তৃক তন্ত্রের প্রমাণ ও প্রভাবের স্বীকৃতি একটু অদ্ভুতই মনে হয়। কিন্তু, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর সামাজিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, রঘুনন্দনের উপর তান্ত্রিক প্রভাবের বিস্তার অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল। রঘুনন্দনের সমসাময়িক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ একদিকে নবদ্বীপে তান্ত্রিকধর্মের প্রসার করিলেন, অপর দিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক চৈতন্যদেব প্রেমধর্মের অপূর্ব ভাবধারাতে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিলেন। এই সময়ে সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্মের সহিত তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রচণ্ড সঙ্ঘাত উপস্থিত হইল[১]। তৎকালীন বঙ্গে মুস্লিম-শাসনের ফলেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম অনেকাংশে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

এই যুগে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব—এই দ্বৈতরূপে তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রসারে সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইল। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়াতত্ত্বের[২] অনুপ্রবেশে বেদকেন্দ্রিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের মূল পর্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। এবম্বিধ অবস্থায় সমাজকে ব্রাহ্মণ্যধর্মসম্মত আচারাদিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিবার গুরুভার রঘুনন্দন গ্রহণ করিলেন। রঘুনন্দন সংস্কারে ও শিক্ষায় রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ হইলেও সমাজসংস্কারকের অন্তর্দৃষ্টি তাঁহার যথেষ্টই ছিল। তিনি যখন লক্ষ্য করিলেন যে, সমাজদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তন্ত্রধর্ম সংক্রামিত হইয়াছে, তখন তিনি, সুবিবেচকের ন্যায়, ইহাকে অস্বীকার করিলেন না, তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানকে অনেক পরিমাণে তিনি ধর্মজীবনের অঙ্গ বলিয়া মানিয়া লইলেন।

১ এই সময়ের বাংলাদেশে সমাজ- ও ধর্ম-জীবনের বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য:— এস্. কে. দে-রচিত Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal, কলিকাতা, ১৯৪২।

২ সহজিয়াতত্ত্বের বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য— শশিভূষণ দাশগুপ্ত-প্রণীত Obscure Religious Cults, কলিকাতা, ১৯৪৬।

বাংলার ব্রত, দুর্গাপূজা এবং অপরাপর অনেক ধর্মচর্যাতে তন্ত্রোক্ত রীতিনীতি অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল অনুষ্ঠানে রহস্যময় তান্ত্রিক মন্ত্র, মণ্ডল, মুদ্রা ও যন্ত্রাদির ব্যাপক ব্যবহার অদ্যাবধি লক্ষণীয়[১]।

ডাঃ হাজরার মতে, পুরাণগুলি প্রথমতঃ তন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পরে স্মৃতিনিবন্ধের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল[২]। অর্থাৎ, স্মৃতিনিবন্ধের উপরে তন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই। বঙ্গীয় নিবন্ধের ক্ষেত্রে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত খুব সমীচীন মনে হয় না। কারণ, পূর্বেই লক্ষ্য করা হইয়াছে যে, শূলপাণির পূর্বে কোন বঙ্গীয় নিবন্ধকারের রচনায় তন্ত্রের কোন উল্লেখ নাই এবং তান্ত্রিক প্রভাব থাকিলেও উহা নিতান্তই ক্ষীণ। পুরাণের মাধ্যমেই যদি স্মৃতিনিবন্ধগুলি তন্ত্র-প্রভাবিত হইত, তাহা হইলে প্রাক্-শূলপাণি বঙ্গীয় নিবন্ধকারগণ শুধু পৌরাণিক প্রভাবেই প্রভাবিত হইতেন না, তন্ত্রকেও প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতেন। আমাদের মনে হয়, বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধসমূহে তন্ত্রের প্রভাবের জন্য দায়ী পুরাণ নহে, তদানীন্তন বঙ্গসমাজ। ডাঃ হাজরার মতে, খ্রীঃ অষ্টম শতকের শেষভাগ হইতেই পুরাণ তান্ত্রিক ধর্মকে স্বীকার করিয়া আসিতেছিল[৩]। সুতরাং, খ্রীষ্টীয় একাদশ হইতে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত বঙ্গীয় নিবন্ধগুলি পুরাণের মাধ্যমে তন্ত্রদ্বারা অনায়াসেই প্রভাবিত হইতে পারিত।

বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধসমূহে যে যে তন্ত্রের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত তন্ত্রগুলি প্রধান :—

কপিলপঞ্চরাত্র, কাশ্যপপঞ্চরাত্র, গৌড়তন্ত্র, তন্ত্ররত্ন, তন্ত্রপ্রকাশ, নারদপঞ্চরাত্র, নারায়ণীয়কপিলপঞ্চরাত্র, নারায়ণীয় মহাকপিলপঞ্চরাত্র, ভুবনেশ্বরীতন্ত্র, মৎস্যতন্ত্র, মহাকপিলপঞ্চরাত্র, মহার্ণবতন্ত্র, মৎস্যসূক্ত-মহাতন্ত্র, যোগিনী, রুদ্রযামল, বশিষ্ঠপঞ্চরাত্র, বারাহীতন্ত্র, বিষ্ণুযামল, বীরতন্ত্র, শারদাতিলক, শিবাগম, ষড়ৃম্নয়মহাতন্ত্র, স্কন্দযামল।

১ দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য রঘুনন্দনের 'যাত্রাতত্ত্ব' (পৃঃ ৯৫), 'স্মৃতিতত্ত্ব', ২, পৃঃ ৬৫৫-৬৫৭।

২ Studies in the Puranic Records ইত্যাদি, পৃঃ ২৬২।

৩ ঐ, পৃঃ ২৫০।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধে সামাজিক চিত্র

স্মৃতিনিবন্ধগুলির আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, ব্রাহ্মণশাসিত সমাজে লোকের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে পালনীয় রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান, পূজাপার্বণ এবং সম্ভাব্য পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত—এই সমস্তই উহাদের আলোচ্য। এই বিষয়সমূহের আলোচনায় তদানীন্তন সমাজের একটি চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। একথা অবশ্য বলা যায় না যে, স্মৃতির সমস্ত শাসন সমাজের সকলেই মানিয়া লইয়াছিল। আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, এই গ্রন্থগুলিতে তাৎকালিক সামাজিক চিত্র কিয়দংশে প্রতিফলিত হইয়াছে এবং অপরাংশে সমাজশাসকগণের মতে আদর্শ সমাজের অবস্থা পরিস্ফুট হইয়াছে। স্মৃতিনিবন্ধে অঙ্কিত চিত্রের কতটুকু বাস্তব ও কতটুকু আদর্শ, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। এই গ্রন্থগুলিতে যে সামাজিক অবস্থার আভাস আমরা পাইলাম, তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য।

এখানে একটি কথা স্মরণীয় এই যে, বঙ্গদেশে অদ্যাবধি প্রাপ্ত স্মৃতিনিবন্ধসমূহের রচনাকাল মোটামুটিভাবে খ্রীষ্টীয় একাদশ হইতে ষোড়শ শতক পর্যন্ত। সুতরাং, এই দেশের তাৎকালিক সামাজিক চিত্রই নিবন্ধসমূহে পাওয়া যায় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

সামাজিক অবস্থা নিম্নলিখিত বিভাগে আলোচিত হইতে পারে:—

(১) নারীর স্থান, (২) খাদ্য ও পানীয়, (৩) নীতিবোধ, (৪) ব্যবহার, (৫) কুসংস্কার, (৬) ধর্মাচরণ, (৭) বর্ণাশ্রমধর্ম।

(১) নারীর স্থান

বৈদিক যুগে নারীকে সমাজে যে উচ্চস্থান দেওয়া হইত, তাহা সুবিদিত। ঐ যুগে বিদ্যার্জন বা ধর্মচর্যা কোন বিষয়েই নারীর অধিকার পুরুষের

তুলনায় কম ছিল না। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তেও পত্নীর স্থান পতির সমান বলিয়াই মনে হয়[১]। স্মৃতিশাস্ত্রের উৎপত্তির যুগে অথবা স্মৃতিসংহিতার যুগেও নারীকে অতিশয় সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিতা দেখা যায়। মনু বলিয়াছেন[২]—যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ; অর্থাৎ, যেখানে নারীর পূজা হয় সেখানে দেবতারা প্রসন্ন হন। স্থানান্তরে মনু বলিয়াছেন[৩]—সহস্রং তু পিতৃন্ মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে; অর্থাৎ, এক মাতার সম্মান সহস্র পিতা অপেক্ষাও অধিকতর।

'মনুসংহিতা'র যুগে নারীর এত সম্মান সত্ত্বেও ধর্মকর্মে তাঁহার অধিকার বৈদিক যুগের নারী অপেক্ষা অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে। যে মনু স্ত্রীলোককে এত উচ্চাসনে স্থাপন করিয়াছেন, তিনিই এক স্থলে বলিয়াছেন যে, যজ্ঞ, ব্রত ও উপবাস প্রভৃতিতে নারীর পৃথক্‌ভাবে কোন অধিকার নাই, পতিসেবাই তাহার একমাত্র ধর্ম, ইহা তাহার স্বর্গপ্রাপ্তির সহায়ক[৪]। ধর্মচর্যায় এই নারী-বিদ্বেষ বেদোত্তর যুগে ক্রমশঃ পুরুষ-শাসিত সমাজে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু, আমরা পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি,[৫] পৌরাণিক যুগে ব্রতাদি অনুষ্ঠানে নারীকে অবাধ অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। নিবন্ধকারগণের যুগে স্মৃতি ও পুরাণ উভয়েরই প্রভাব সমাজে বহুল পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। সেই জন্যই সম্ভবতঃ একটা আপোষমীমাংসার জন্য বঙ্গীয় নিবন্ধকার মনুর উক্ত নারী-বিদ্বেষসূচক বিধানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিলেন যে, সাধারণতঃ ব্রতাদিতে নারীর অধিকার না থাকিলেও পতির অনুমতিক্রমে এই অধিকার লাভ করা যায়। এই দেশের নিবন্ধসমূহে ব্রত ভিন্ন অন্যপ্রকার ধর্মানুষ্ঠানে স্ত্রীলোকের অধিকার দেখা যায় না।

১ 'পত্নী'পদের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে পাণিনির সূত্র 'পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে' (৪।১।৩৩)।

২ ৩।৫৬।

৩ ২।১৪৫।

৪ ৫।১৫৫।

৫ চতুর্থ পরিচ্ছেদে ব্রত-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধসমূহে নারীর প্রতি তদানীন্তন সমাজের শ্রদ্ধা ও অনুকম্পার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। একই অপরাধের জন্য বিচারালয়ে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের দণ্ড লঘুতর, ইহা ব্যবহার প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে।' পাপের প্রায়শ্চিত্ত-বিধানও নারীর পক্ষে লঘুতর। কন্যার রজোদর্শনের পরে পিত্রালয়ে বাস অতিশয় পাপজনক বলিয়া নিন্দিত হইলেও ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, অপাত্রে বিবাহ দেওয়া অপেক্ষা কন্যাকে আজীবন পিত্রালয়ে রাখাও শ্রেয়। স্ত্রীলোকের প্রতি সমাজের সহানুভূতির অপর একটি নিদর্শন জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের পৌর্বাপর্যের বিধিতে পাওয়া যায়। জ্যেষ্ঠা কন্যার পূর্বে কনিষ্ঠার বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে, ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এরূপ ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠা কন্যার অবমাননা করা হয় এবং ইহাতে সে মনঃক্ষুণ্ণও হইতে পারে। সমাজশাসকেরা কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারে শাস্ত্রের গতানুগতিক বিধিনিষেধ অনুসরণ করেন নাই। রঘুনন্দন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, কুরূপত্বাদির জন্য জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে বিলম্ব হইলে কনিষ্ঠার বিবাহে দোষ নাই, একজনের জীবনের সঙ্গে অপরের জীবনও যাহাতে দুঃখময় না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ রঘুনন্দন এই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

স্মৃতিনিবন্ধে বর্ণাশ্রমধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, বর্ণধর্মের কঠোরতা নারীর সামাজিক মর্যাদাকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছিল। পতির সবর্ণা স্ত্রীর স্থান উচ্চতম, যদিও সবর্ণা ও অসবর্ণা নারী একই ব্যক্তির স্ত্রী।

'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'—মনুর এই অনুশাসন[১] স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের আধিপত্যের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। শুধু ইহলোকে নহে, পরলোকেও পতি-পত্নীর আত্মার স্বতন্ত্রসত্তা স্মৃতিকারেরা মানিতে কুণ্ঠিত হইলেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রাদ্ধ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে যে, 'ছন্দোগপরিশিষ্টে'র একটি বচনবলে বঙ্গীয় নিবন্ধকারগণের মতে স্ত্রীলোকের মৃত্যুতিথি ভিন্ন

১ ৯।৩।

অন্য সময়ে তদীয় আত্মার উদ্দেশ্যে পৃথক্ পিণ্ড দেওয়া যাইবে না; মৃত্যুতিথি ভিন্ন অপর সময়ে নিজ নিজ পতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পিণ্ড হইতেই তাঁহারা স্বীয় অংশ গ্রহণ করিবেন।

পতির সহিত সম্বন্ধ ব্যতিরেকে স্থাবর সম্পত্তিতে স্ত্রীলোকের কোন অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। উত্তরাধিকারসূত্রে পতির সম্পত্তি যখন স্ত্রী পান, তখনও উহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ স্বত্ব জন্মে না, শুধু ভোগ-স্বত্ব জন্মে। মাত্র বিশিষ্ট কতক স্ত্রীধনে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ স্বত্ব থাকে।

(২) খাদ্য ও পানীয়

প্রায়শ্চিত্তবিষয়ক নিবন্ধগুলিতে খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে বহু বিধিনিষেধ আছে। প্রায়শ্চিত্তের আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ বিধিনিষেধসমূহের আলোচনা করা হইয়াছে। বর্তমানে শুধু প্রধান প্রধান বিষয়গুলির উল্লেখ করা হইতেছে।

শূলপাণির 'প্রায়শ্চিত্তবিবেকে'[১] নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্যগুলিকে নিম্নশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে:—

(ক) জাতিদুষ্ট—স্বভাবতঃ অপকারী। যথা—পলাণ্ডু (পেঁয়াজ) ও লশুন (রসুন)।

(খ) ক্রিয়াদুষ্ট—পতিত ব্যক্তির স্পর্শাদি কোন কারণে দূষিত।

(গ) কালদূষিত—বাসী।

(ঘ) আশ্রয়দূষিত—আধার বা পাত্রের দোষে দুষ্ট।

(ঙ) সংসর্গদূষিত—রসুন ও পেযূষ[২] প্রভৃতির সঙ্গে সংস্পর্শহেতু দূষিত।

(চ) শঙ্কল্লেখ—বিষ্ঠাতুল্য, অর্থাৎ যাহার দর্শনে মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়।

উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখা যায় যে, কতক দ্রব্যের নিষেধের মূলে আছে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রচেষ্টা এবং অপর দ্রব্যের নিষেধ কুসংস্কারাত্মক।

১ পৃঃ ২৪৮।

২ গাভীর প্রসব হইতে দশদিন অতীত হওয়ার পূর্বের দুগ্ধ,

—গোবিন্দানন্দের টীকা (প্রায়শ্চিত্তবিবেক, পৃঃ ২৪৯

বিবিধ প্রকার মদ্যের মধ্যে সুরা দ্বিজের পক্ষে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। নানা প্রকার মদ্যের উল্লেখ হইতে মনে হয়, তৎকালে সমাজে মদ্যপান ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।

(৩) নীতিবোধ

নিবন্ধগুলির পাঠে মনে হয়, নিবন্ধকারগণ কতক ব্যসনকে তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু, বর্তমান কালের দৃষ্টিভঙ্গীতে যাহা নীতিবিগর্হিত সেইরূপ অনেক ব্যাপারে যেন তাঁহাদের সমর্থন ছিল। অবৈধ যৌনসংযোগ এবং ইহা অপেক্ষাও হীনতর বহু পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান নিবন্ধগ্রন্থে আছে। ইহা হইতে মনে করা অযৌক্তিক নহে যে, তদানীন্তন সমাজে ঈদৃশ পাপকার্য বিদ্যমান ছিল।

পূর্বে দুর্গোৎসবের আলোচনা প্রসঙ্গে দশমীকৃত্যের মধ্যে শবরোৎসবের বিধান আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। পরস্পরের মধ্যে অশ্রাব্য কুবাক্যের প্রয়োগ ও নানারূপ বর্বরোচিত কার্য ঐ উৎসবের প্রধান অঙ্গ। শাস্ত্রীয় প্রমাণ অনুসারেই এই উৎসব অবশ্য-অনুষ্ঠেয়।

স্ত্রীসম্ভোগের ব্যাপারে কিয়ৎপরিমাণে ব্যভিচার নিবন্ধকারগণের অনুমোদিত ছিল বলিয়াই মনে হয়। দাসীর সহিত যৌনসংযোগ অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হইত না। জীমূতবাহন শূদ্রের ঔরসে ও দাসীর অথবা অপর অবিবাহিতা নারীর গর্ভে জাত পুত্রের জন্য পিতার অনুমতিক্রমে পৈতৃক সম্পত্তির একটি ভাগের ব্যবস্থা স্পষ্টভাবেই করিয়াছেন[১]। সুতরাং, দেখা যায়, এরূপ জারজ পুত্রও সমাজে স্বীকৃত হইত।

বিবাহ-বন্ধনের অচ্ছেদ্যতা নিবন্ধকারগণও প্রাচীন স্মৃতির আদর্শে স্বীকার করিয়াছেন। স্ত্রীর একমাত্র অসতীত্ব ভিন্ন অপর কোন কারণেই পতি কর্তৃক তাহার পরিত্যাগ তাঁহারা অনুমোদন করেন নাই।

(৪) ব্যবহার

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্যবহার বা আইনকানুনের ক্ষেত্রে বঙ্গীয় নিবন্ধকারেরা ভারতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া

১ শূদ্রস্য পুনরপরিণীতাদাস্যাদিশূদ্রাপুত্রঃ পিতুরনুমত্যা পুত্রান্তরতুল্যাংশহরঃ—দা. ভা., ৯।২৯।

রহিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহাদের চিন্তাধারার মৌলিকত্ব তাঁহাদিগকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। দায়াধিকারকে জন্মগত বলিয়া না মানিয়া এবং পিণ্ডদানের যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল বলিয়া ঘোষণা করিয়া জীমূতবাহন বঙ্গদেশে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

দায়বিভাগ ও উত্তরাধিকার ছাড়াও জীমূতবাহন 'ব্যবহারমাতৃকা'য় বিচারপদ্ধতির খুঁটিনাটি আলোচনা করিয়া কুশাগ্রবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন এবং অক্ষয় কীর্তি অর্জন করিয়াছেন। এখানে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, আধুনিক যুগে ভারতীয় বিচারালয়ে যে Code of Civil Procedure অনুসারে বিচার হইয়া থাকে, তাহাতে লিপিবদ্ধ অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রণালীর অনুরূপ ব্যবস্থা পাওয়া যায় মধ্যযুগীয় জীমূতবাহনের উক্ত গ্রন্থখানিতে।

জীমূতবাহন বিচারে ভুক্তি, লিখিত ও সাক্ষী এই ত্রিবিধ মানুষ প্রমাণের অভাবে দিব্য প্রমাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন[১]। রঘুনন্দন দিব্য সম্বন্ধে একটি পৃথক্ গ্রন্থই রচনা করিয়াছেন। এই সকল কারণে মনে হয়, তৎকালে দিব্য প্রমাণের প্রচলন ছিল।

(৫) কুসংস্কার

বঙ্গীয় নিবন্ধসমূহে এমন কতক বিশ্বাস ও প্রথার পরিচয় পাওয়া যায়, যেগুলি বর্তমানযুগে কুসংস্কার-প্রসূত বলিয়া মনে হয়। মধ্যযুগে এই দেশে এইরূপ বিশ্বাস এত প্রচলিত ছিল যে, বঙ্গেশ্বর বল্লালসেন 'অদ্ভুতসাগর'[২] নামক প্রকাণ্ড গ্রন্থে নানাবিধ অদ্ভুত[৩]-শান্তির ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রঘুনন্দন 'কৃত্যতত্ত্বে' অদ্ভুতশান্তি আলোচনা করিয়াছেন।

১ ব্য. মা., পৃঃ ৩০৬।

২ সং মুরলীধর ঝা, বারাণসী, ১৯০৫। ইহা জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে রচিত বলিয়া ইহাকে বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধের অন্তর্গত করা হয় নাই।

৩ বৃদ্ধগর্গের প্রমাণবলে বল্লাল 'অদ্ভুত' শব্দের নিম্নলিখিত অর্থ করিয়াছেন:— (১) যাহা প্রথম ঘটিল, (২) যাহা পূর্বে থাকিলেও রূপান্তর ধারণ করিয়াছে (অদ্ভুতসাগর, পৃঃ ৪)।

অদ্ভুত শুভ এবং অশুভ দুইই সূচনা করিতে পারে। অশুভসূচক অদ্ভুতের নাম উৎপাত[১]। উৎপাতের 'আশ্রয়' দ্যৌ বা স্বর্গ, অন্তরিক্ষ ও ভূ বা পৃথিবী। ইহার 'যোনি' বা কারণ পঞ্চমহাভূত[২]। প্রকৃতে-রন্যথোৎপাতঃ—অর্থাৎ, প্রকৃতির কোনরূপ বিকারই উৎপাত। আশ্রয়ভেদে ইহা হইতে পারে দিব্য, নাভস এবং ভূমিজ। ভূমিজ অপেক্ষা নাভস ও তদপেক্ষা দিব্য গুরুতর। উৎপাতের প্রতিকার মানুষের হিতকর। যাহারা 'বিমোহ' কিম্বা 'নাস্তিক্যা'দি হেতু যথাবিধি প্রতিকার করে না, তাহারা বিনষ্ট হয়।

রঘুনন্দনের মতে, নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি অশুভসূচক :—

কাক, কঙ্ক, গৃধ্র, শ্যেন, বনকুক্কুট, রক্তপাদ, বনকপোত প্রভৃতি পক্ষীর মস্তকোপরি পতন ব গৃহে প্রবেশ, গৃহোপরি বানর বা পেচকের পতন, অকালে পুষ্প বা ফলের জন্ম ইত্যাদি।

উৎপাতের প্রতিকারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কতক দেবতার অর্চনা, ব্রাহ্মণভোজন, ব্রাহ্মণকে গো ও স্বর্ণ প্রভৃতি দান। রঘুনন্দনের মতে, উক্ত প্রতিকার না করিলে গৃহপতির মৃত্যু ও সর্বনাশ ঘটিয়া থাকে।

(৬) ধর্মাচরণ[৩]

পূর্বে আলোচিত ব্রত এবং দুর্গাপূজা ছাড়াও এই দেশের স্মৃতিনিবন্ধে বহুবিধ ধর্মকার্যের আলোচনা আছে। রঘুনন্দনের মতে সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়া যে যে ধর্মানুষ্ঠান বিধেয়, সেগুলি নিম্নে লিখিত হইল :—

১ অদ্ভুতসাগর, পৃঃ ৪।

২ ঐ, পৃঃ ৫।

৩ এই বিষয়ের আলোচনা আছে জীমূতবাহনের কালবিবেকে', রঘুনন্দনের 'কৃত্যতত্ত্বে' ও গোবিন্দানন্দের 'বর্ষক্রিয়াকৌমুদী'তে। এই গ্রন্থগুলিতে আলোচ্য বিষয় ও আলোচনার ধারা প্রায় একরূপ। সুতরাং, বর্তমান প্রসঙ্গে রঘুনন্দনের গ্রন্থটিকেই উপজীব্য করা গেল।

বৈশাখ—প্রাতঃস্নান, ব্রাহ্মণকে 'অম্বুঘট'দান, মসুরসহনিম্বপত্রভক্ষণ, কেশব বা বিষ্ণুকে শীতলজলে স্নাপন।

জ্যৈষ্ঠ—(ক) আরণ্যষষ্ঠী—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে করণীয়। সুসন্তানলাভের কামনায় বিন্ধ্যবাসিনী বা ষষ্ঠী দেবীর অর্চনা।

(খ) সাবিত্রীব্রত—বৈশাখী পূর্ণিমার পরে শুক্লা চতুর্দশীতে 'অবৈধব্যকামা' নারীর করণীয়।

(গ) দশহরা—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমীতে যে কোন নদীতে, বিশেষতঃ গঙ্গায়, স্নান। ইহাতে কায়িক, মানসিক ও বাচিক—এই তিন শ্রেণীর দশবিধ পাপ ক্ষালিত হয়।

আষাঢ়—চাতুর্মাস্য ব্রত। ইহা এই মাসের শুক্লা দ্বাদশী বা পূর্ণিমাতে আরব্ধ হইয়া কাতিকের শুক্লা দ্বাদশীতে শেষ হয়। ইহাতে প্রধান করণীয় গুড়, তৈল ও পক্বদ্রব্যের বর্জন, নিত্য গঙ্গাস্নান, কেশ ও নখের ছেদন, বিষ্ণুপূজা।

শ্রাবণ—মনসাপূজা। সর্পভয় হইতে মুক্তির কামনায় কৃষ্ণা পঞ্চমীতে মনসাদেবীর পূজা। এই পূজা যে তাৎকালিক বঙ্গে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল এবং ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, বহু বাংলা মনসামঙ্গল কাব্য তাহার প্রমাণ। নিদর্শনরূপে কাণা হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণদেব প্রভৃতি প্রণীত মনসামঙ্গল বিষয়ক বাংলা কাব্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ভাদ্র—(ক) জন্মাষ্টমীব্রত—নানাবিধ পাপ হইতে মুক্তিকামনায় উপবাস ও শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা।

(খ) অনন্তব্রত।

আশ্বিন—(ক) দুর্গাপূজা।

(খ) কোজাগর। ইহাতে পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা, দিবাভাগে ব্রতান্তে নারিকেলোদক পান ও চিপিটক ভক্ষণ, নিরামিষ আহার এবং সমস্ত রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি করণীয়।

কার্ত্তিক— (ক) প্রাতঃস্নান,

(খ) দীপান্বিতা অমাবস্যায় দিনে উপবাস, পার্বণ শ্রাদ্ধ, সন্ধ্যাকালে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে উল্কাদান ইত্যাদি করণীয়।

(গ) দ্যূতপ্রতিপদ— প্রাতে অক্ষক্রীড়া। ইহাতে জয় ও পরাজয় বৎসরব্যাপী যথাক্রমে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য সূচনা করে।

(ঘ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া— স্ত্রীলোক কর্তৃক যমরাজের পূজা ও ভ্রাতৃভোজন বিধেয়।

অগ্রহায়ণ— নবান্নশ্রাদ্ধ। দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া নবান্ন ভক্ষণ।

পৌষ— কোন উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের বিধান নাই।

মাঘ— (ক) রটন্তীচতুর্দশী অর্থাৎ কৃষ্ণা চতুর্দশীতে প্রাতঃস্নান,

(খ) শ্রীপঞ্চমীতে— সরস্বতী পূজা,

(গ) মাঘীসপ্তমীতে— প্রাতঃস্নান ও সূর্যোপাসনা,

(ঘ) বিধানসপ্তমীব্রত— ইহাতে রোগমুক্তি ও ধনলাভ হয়।

(ঙ) আরোগ্যসপ্তমীব্রত—ইহার ফল ইহলোকে সৌভাগ্য ও পরলোকে সদ্‌গতি।

(চ) ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মপূজা কর্তব্য।

ফাল্গুন— শিবরাত্রিব্রত— ইহাতে উপবাস, প্রতি প্রহরে শিবপূজা ও পরের দিন পারণ বিধেয়।

চৈত্র— (ক) বসন্তরোগের আক্রমণ প্রতিরোধার্থে শীতলাপূজা,

(খ) বারুণীস্নান,

(গ) অশোকাষ্টমী— স্নান ও অশোক পুষ্পের কলিকা ভক্ষণ,

(ঘ) রামনবমীব্রত— দাশরথি রামের অর্চনা,

(ঙ) মদনত্রয়োদশী } —এই দুই তিথিতে, পুত্রপৌত্রাদির
(চ) মদনচতুর্দশী } সৌভাগ্য কামনায় এবং সমস্ত বিপদ হইতে ত্রাণলাভের আকাঙ্ক্ষায় মদনদেবের পূজা কর্তব্য। রঘুনন্দনের মতে, এই পূজায় মদনদেবের প্রীত্যর্থে অশ্লীল ভাষার প্রয়োগ বিধেয়।

স্মৃতিনিবন্ধে প্রতিফলিত বঙ্গসমাজ ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু, উল্লেখযোগ্য এই যে, স্মৃতিশাস্ত্র-শাসিত সমাজে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক প্রভাব বহুলপরিমাণে লক্ষিত হয়। শূলপাণির সময় হইতে রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দের কাল পযন্ত রচিত গ্রন্থগুলিতে তন্ত্র সাতিশয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভবদেব ও হলায়ুধ কর্তৃক বৈদিক ধর্মকে স্বীয় মযাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস হইতে মনে হয় যে, পৌরাণক ও তান্ত্রিক ধর্মের সঙ্ঘাতে সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্ম শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল।

(৭) বর্ণাশ্রমধর্ম

যে চতুর্বর্ণের ভিত্তিতে হিন্দুসমাজসৌধ বিরাজমান, সেই চারিবর্ণেরই জন্য অনুশাসন নিবন্ধসমূহে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণবর্ণের প্রাধান্য স্থাপনের প্রয়াস এই গ্রন্থগুলির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় রহিয়াছে। উচ্চতম বর্ণ ব্রাহ্মণ হইলেও অপর দ্বিজবর্ণদ্বয়ের, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের, শূদ্রের তুলনায়, সমাজে অধিকতর সুযোগ সুবিধা ভোগের ব্যবস্থা আছে।

সমাজের নিম্নতম স্তরে শূদ্রের স্থান। এই বর্ণের প্রতি নিবন্ধকারগণের যে অবজ্ঞা, তাহার নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটিমাত্র প্রসঙ্গের উল্লেখ করা যাইতেছে। উপনয়ন সংস্কার তথা বেদপাঠে শূদ্রের অধিকার নাই। বস্তুতঃ, জন্ম হইতে আমরণ যে সংস্কারগুলিদ্বারা দ্বিজগণের জীবন নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে, একমাত্র বিবাহ ভিন্ন, কোন সংস্কারেই শূদ্র অধিকারী নহে। আবার, উচ্চতর বর্ণসমূহে বিবাহকাল নির্দিষ্ট করা

হইয়াছে, কিন্তু এই ব্যাপারে শূদ্রের কোন বিশেষ কালাকালের ব্যবস্থা নাই[১]। অপর সকলেরই স্বকীয় গোত্র আছে, কিন্তু শূদ্রের কোন নিজস্ব গোত্র নাই[২]। অনেক স্থলেই বলা হইয়াছে যে, উচ্চবর্ণের লোক জঘন্য কতক পাপকার্য করিলে শূদ্রবৎ গণ্য হইবে—ইহা হইতে সমাজে শূদ্রগণের হেয় অবস্থা অনুমেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ঋতুমতী কন্যাকে বিবাহ করিলে তৎপতি শূদ্রতুল্য বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং তাহার সহিত কথোপকথনও নিন্দনীয় হইবে[৩]। শূদ্রের পক্ষে ধর্মানুষ্ঠানে বৈদিক মন্ত্রপাঠ নিষিদ্ধ। নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণের আলোচনা করিয়া রঘুনন্দন এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্নান, শ্রাদ্ধ, তর্পণ ও পঞ্চযজ্ঞ ভিন্ন অপর শূদ্রকৃত্যে শূদ্র পৌরাণিক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারে[৪]। কয়েকটি মাত্র দ্রব্য ভিন্ন শূদ্রকর্তৃক প্রস্তুত খাদ্য ব্রাহ্মণভোজনে নিষিদ্ধ। বিনা জলে শূদ্রপক্ক দ্রব্য[৫] এবং শূদ্রকর্তৃক প্রস্তুত ক্ষীর[৬] ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে পারে। 'কূর্মপুরাণে'র প্রমাণবলে রঘুনন্দন শূদ্র কর্তৃক প্রস্তুত দধি ও শক্তু ব্রাহ্মণের ভোজ্য বলিয়া বিধান করিয়াছেন[৭]।

হত্যাজনিত পাপের মধ্যে শুধু ব্রাহ্মণ-হত্যার পাপ গুরুতর; ইহা মহাপাতক। প্রায়শ্চিত্তের বিধি ব্যবস্থাতে ব্রাহ্মণগণের স্ববর্ণপ্রীতির এবং নিম্নতর বর্ণের, বিশেষতঃ শূদ্রের, প্রতি উপেক্ষার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ভক্ষ্যাভক্ষ্যপ্রকরণে এবং অভক্ষ্যভক্ষণজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধির প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ স্মৃতিকারগণের স্ববর্ণ-পক্ষপাত সবিশেষ পরিস্ফুট[৮]।

১ চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিবাহ প্রসঙ্গে পাত্রের যোগ্যতা প্রকরণ দ্রষ্টব্য।
২ ঐ পরিচ্ছেদের ঐ প্রসঙ্গে 'সগোত্রা কন্যা' প্রকরণ দ্রষ্টব্য।
ঐ পরিচ্ছেদের ঐ প্রসঙ্গে 'পাত্রীর যোগ্যতা' প্রকরণ দ্রষ্টব্য।
৪ স্মৃতিতত্ত্ব, ২, পৃঃ ৬৩৫।
৫ ঐ, পৃঃ ৬৩৪।
৬ ঐ।
৭ ঐ, ১, পৃঃ ৭৯।
৮ চতুর্থ পরিচ্ছেদে প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গে 'নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয়' প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

আচার অনুষ্ঠান এবং ধর্মচর্যার কথা ছাড়িয়া দিলেও ব্যবহার বা আইন কানুনের ক্ষেত্রেও শূদ্রের স্থান অতি হেয়। বিচারালয়ে কোন উচ্চপদে শূদ্রের অধিকার নাই। রাজা বিচারকার্য স্বয়ং পরিদর্শন করিতে অক্ষম হইলে প্রতিনিধিস্বরূপ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে তিনি নিযুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু 'শূদ্রং যত্নেন বর্জয়েৎ'[১], অর্থাৎ এই ব্যাপারে শূদ্র সর্বথা বর্জনীয়। এই বিষয়ে রঘুনন্দন-উদ্ধৃত নিম্নলিখিত প্রমাণে[২] তাঁহার মত সুস্পষ্ট :—

দুঃশীলোঽপি দ্বিজঃ পূজ্যো।
ন শূদ্রো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥

অর্থাৎ, ঈদৃশ কার্যে রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ দুশ্চরিত্র দ্বিজও নিযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু জিতেন্দ্রিয় হইলেও শূদ্র অযোগ্য।

ভ্রাতৃগণের মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তির বিভাগের সময়ে শূদ্রপুত্র পিতার উচ্চতরবর্ণের পুত্র অপেক্ষা অল্পতর অংশের অধিকারী। দ্বিজ পতি অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করিলে তাহার দ্বিজবর্ণের স্ত্রীই তদীয় সমগ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবেন, কিন্তু শূদ্রা স্ত্রী আদৌ কোন অংশ পাইবেন না[৩]।

বিচারে যখন দিব্য প্রমাণের প্রয়োজন হয়, তখন, দেখা যায়, সর্বাপেক্ষা কষ্টদায়ক দিব্যের ব্যবস্থা শূদ্রের জন্য, দ্বিজগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য দিব্য প্রযোজ্য।

তাৎকালিক সমাজে অনুলোম বিবাহ অনুমোদিত থাকিলেও জীমূতবাহনকর্তৃক দ্বিজের শূদ্রাবিবাহ নিন্দিত হইয়াছে[৪]। অপর এক স্থলে তিনি বিধান করিয়াছেন যে, পতির সবর্ণা স্ত্রীই একমাত্র 'পত্নী'[৫] শব্দবাচ্যা; অন্য কোন স্ত্রীর পতির সহিত যজ্ঞসংযোগ থাকিতে

১ ব্য. মা., পৃঃ ২৭৯।
২ স্মৃ. ত. ২, পৃঃ ১৯৮।
৩ দা. ভা. ১১।১।৪৭।
৪ ঐ, ৯।৯।
৫ পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে—অষ্টাধ্যায়ী (৪।১।৩৩)।

পারে না। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, শূদ্রা স্ত্রী কখনই দ্বিজের 'পত্নী' হইতে পারেন না।

যে চতুরাশ্রমের দ্বারা হিন্দুর জীবন সুপ্রাচীন কাল হইতে নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে, সেই চারিটি আশ্রম চিরপ্রচলিত ক্রমেই স্মৃতিনিবন্ধসমূহে স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই ক্রমের পরিবর্তন বঙ্গীয় স্মৃতিকারগণ অনুমোদন করেন নাই, আবার যথাকালে প্রতি আশ্রমে প্রবেশের কঠোর বিধানও তাঁহারা করিয়াছেন। আশ্রম-বহির্ভূত ব্যক্তির স্থান সমাজে, তাঁহাদের মতে, অত্যন্ত হেয় এবং অনাশ্রমী ব্যক্তি অনেক ধর্মকার্যাদির অধিকারে বঞ্চিত। এই সম্বন্ধে গার্হস্থ্যাশ্রমের একটি বিধি প্রণিধানযোগ্য। বিবাহের দ্বারা এই আশ্রমে প্রবেশলাভ হয়। গৃহিণীকে বলা হইয়াছে গৃহ[১]। সুতরাং, বিপত্নীক ব্যক্তিকে গৃহস্থ বলা চলে না। কিন্তু, সমস্যা এই যে, পরিণত বয়সে যদি কেহ বিপত্নীক হয়, তাহা হইলে উপায় কি? 'ভবিষ্যপুরাণে'র প্রমাণবলে রঘুনন্দন এই সমস্যার চমৎকার সমাধান করিয়াছেন। আটচল্লিশ বৎসর বয়সের পরে যদি কাহারও স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তাহা হইলে তাহাকে বলা হইবে 'রণ্ডাশ্রমী'[২]। এই রণ্ডাশ্রমই তাহার পক্ষে গার্হস্থ্যের বৈকল্পিক আশ্রম। সুতরাং, এইরূপ ব্যক্তি অনাশ্রমী বলিয়া গণ্য হইবে না এবং গৃহস্থের কর্তব্যে অধিকারী হইবে। ইহা হইতে মনে হয়, রঘুনন্দনের মতে, উক্ত বয়ঃক্রমের পরে দারপরিগ্রহ বিধেয় নহে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের আশ্রমসংখ্যা যথাক্রমে চার, তিন, দুই ও এক[৩]। এক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণবর্ণের প্রতি পক্ষপাত ও শূদ্রের প্রতি অবজ্ঞার ভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

বঙ্গদেশে স্মৃতিনিবন্ধের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, পালরাজগণের পরে সেনরাজবংশের অভ্যুদয়ের প্রায় সমকালে

১ স্মৃ. ত., ২, পৃঃ ১০৪।

২ চত্বারিংশদ্ বৎসরাণাং সাষ্টানাং চ পরে যদি।
স্ত্রিয়া বিযুজ্যতে কশ্চিৎ স তু রণ্ডাশ্রমী-মতঃ। —স্মৃ ত., ২, পৃঃ ১৪৮।

৩ শূদ্রের শুধু গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের অধিকার আছে। —ঐ।

এই জাতীয় গ্রন্থগুলি রচিত হইতে থাকে। এই সময়ে সেনরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসাহিত ব্রাহ্মণসমাজ স্বভাবতঃই ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংস্কারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। কিন্তু, ইহার পূর্বেই বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মমতের প্রভাব হেতু এবং সমাজে পৌরাণিক আচার অনুষ্ঠানের অনুপ্রবেশ হেতু বেদকেন্দ্রিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। এই ক্ষীয়মাণ ধর্মের অঙ্গে বল সঞ্চারের উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল ভবদেবের 'কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি', হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' ইত্যাদি গ্রন্থ। হলায়ুধ 'বেদাধ্যয়নশ্লাঘা'র কথা স্বীয় গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন এবং বেদের প্রশংসাদ্বারা গ্রন্থের সূচনা করিয়াছেন। বল্লালসেনের সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংস্কারের চেষ্টা বিশেষভাবে হইযাছে ; আচার ও দানবিষয়ে এই বিদ্যোৎসাহী রাজা কর্তৃক রচিত বিশাল গ্রন্থদ্বয়ই ইহার প্রমাণ।

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় এই যে, শূলপাণি প্রমুখ পরবর্তী লেখকগণ বেদাধ্যয়ন বা বেদকেন্দ্রিক ধর্মের স্বপদে প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ে কোন আলোচনা করেন নাই। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, শূলপাণির আবির্ভাব কালের (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক) পূর্বেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই জন্যই, বোধ হয়, পরবর্তী লেখকগণ এই বিষয়ের আলোচনা হইতে বিরত ছিলেন।

শ্রীনাথের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বঙ্গীয় স্মৃতির যে যুগের সহিত পরিচয় লাভ করি, সেই যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারের প্রয়াস নাই, আছে নব্যন্যায় ও পূর্বমীমাংসার সাহায্যে স্মৃতিশাস্ত্রের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার।

স্মৃতিশাস্ত্রে রঘুনন্দনের দান সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করিতে হইলে তাঁহার সময়ে বঙ্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। রাজনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তখন আফ্‌গান শাসন হইতে মুঘল শাসনাধীনে যাইতেছিল। সুতরাং, এই পরিবর্তন-যুগের যে গ্লানি তাহা হইতে সমাজ নিস্তার পায় নাই। স্ব স্ব প্রাধান্যকামী প্রতিদ্বন্দ্বী শাসকের পরস্পরের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ মুসলমান শাসনকর্তার স্বৈরাচারের ফলে হিন্দুসমাজ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে বৈদেশিক বিজাতীয়

শাসকের শত্রুভাব; অপরদিকে ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব তান্ত্রিকতায় দেশের প্লাবন—এইরূপ বিপদসঙ্কুল কালে হইয়াছিল রঘুনন্দনের আবির্ভাব। বিচক্ষণ স্মার্ত ভট্টাচার্য একদিকে ইস্‌লাম প্রভাব হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সুরক্ষিত করিলেন কঠোর বিধিনিষেধের দুর্গ সৃষ্টি করিয়া, অপর দিকে তন্ত্রের সহিত আপোষ করিলেন ব্যাপক তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে কিয়দংশকে বেদকেন্দ্রিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের অঙ্গস্বরূপে স্বীকার করিয়া। ঐ সময়ে তন্ত্রকে স্মৃতিশাস্ত্রের ততটুকু প্রশ্রয় না দিলে হয়ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইত।

পরিশিষ্ট (ক)

বঙ্গের কয়েকজন বিস্মৃত স্মৃতিনিবন্ধকার

বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়াছি যে, ভবদেবের পূর্বে বঙ্গীয় কোন স্মৃতিনিবন্ধকারের নিবন্ধ পাওয়া যায় না। অদ্যাবধি যে স্মৃতিনিবন্ধগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাদের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অগণিত স্মৃতিকার ও স্মৃতিগ্রন্থের উল্লেখ আছে। ঐ স্মৃতিকারগণের মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

বালক, জিকন (বা, জীকন), যোগ্লোক (বা, জোগ্লোক, অথবা যোগ্লোক), জিতেন্দ্রিয়। ইঁহাদের সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বঙ্গদেশ ভিন্ন অপর কোন স্থানের স্মৃতিনিবন্ধে ইঁহাদের কোন উল্লেখ নাই এবং ইঁহাদের নামাঙ্কিত কোন পুঁথি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্মৃতিনিবন্ধে ইঁহাদের নাম ও মতের যে যে উল্লেখ আছে[১], সেগুলি পর্যালোচনা করিলে আমরা ইঁহাদের জীবনী ও গ্রন্থ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি।

বালক

ইঁহার উল্লেখ আছে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে :—

ভবদেবের 'প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ' (পৃঃ ৪২, ৪৬, ৭৪, ৮১, ৮২, ৮৩, ১০৯),

জীমূতবাহনের 'ব্যবহার-মাতৃকা' (পৃঃ ৩৪৬) ও

'দায়ভাগ' (পৃঃ ১২০, ১৬৯, ১৮৩, ২২৭, ২২৮),

শূলপাণির 'দুর্গোৎসববিবেক' (পৃঃ ৯, ১৬),

রঘুনন্দনের 'ব্রততত্ত্ব' (পৃঃ ২২৩, 'স্মৃতিতত্ত্বে'র অংশ)।

১ ইঁহাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন নিবন্ধকারের উক্তি ও মন্তব্য বর্তমান গ্রন্থকার কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে—ই. হি. কো. তে (৩২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৬—৪৩)।

যাঁহারা ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ভবদেব প্রাচীনতম। ভবদেব ভট্টের কালের নিম্নতর সীমারেখা ১১০০ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং, বালক ইঁহার পরবর্তী লেখক হইতে পারেন না।

প্রায়শ্চিত্ত, ব্যবহার, দায়ভাগ ও দুর্গোৎসব সংক্রান্ত ব্যাপারে বালকের উল্লেখ আছে। সুতরাং, মনে করা যাইতে পারে যে, ইনিও এই সমস্ত বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

ভবদেব সর্বত্রই বালকের মত 'হেয়' বলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। জীমূতবাহন একবার স্বীয় মতের সমর্থনে বালকের উল্লেখ করিয়াছেন, অপর সকল স্থলে বালকের মত 'বালকবচন' বলিয়া অগ্রাহ্য ঘোষণা করিয়াছেন। শূলপাণি এক স্থলে সসম্মানে বালকের উল্লেখ করিয়াছেন, অন্যান্য স্থলে তাঁহার মত বর্জন করিয়াছেন। রঘুনন্দন স্বীকৃত প্রমাণ-সমূহের মধ্যে বালকের মতের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত কারণে, মনে হয়, পূর্ববর্তী লেখকগণের কালে বালকের মত সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই ; কিন্তু, রঘুনন্দনের যুগে বালকের মত প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। তবে, বালকের মত খণ্ডনের জন্য পূর্ববর্তী লেখকগণের ব্যগ্র প্রয়াস হইতে মনে হয় যে, সেই সময়েও বালক উপেক্ষণীয় লেখক ছিলেন না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বঙ্গদেশ ভিন্ন অপর কোন অঞ্চলের স্মৃতিনিবন্ধে বালকের উল্লেখ নাই। এই কারণে এবং তাঁহার মতের খণ্ডন বা গ্রহণ করিবার জন্য খ্যাতনামা বঙ্গীয় নিবন্ধকারগণের অত্যন্ত ব্যগ্রতা আছে বলিয়া বালক বঙ্গদেশেরই লেখক ছিলেন, ইহা অনুমান করা অসমীচীন মনে হয় না।

জীকন

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে ইঁহার উল্লেখ আছে :—

ভবদেবের—'প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ' (পৃঃ ১০২),

শূলপাণির—(১) দুর্গোৎসববিবেক (পৃঃ ২),

(২) প্রায়শ্চিত্তবিবেক (পৃঃ ১৯, ২১, ২২, ৫০, ৮৬, ৯৪, ৯৭, ১০২, ১০৫, ১০৬, ১১২, ১১৮, ১২৬, ১৩৩, ১৪৪, ১৫১, ১৫৬, ১৬৪, ১৭৫, ১৭৬, ৫৩৩),

(৩) শ্রাদ্ধবিবেক (পৃঃ ১৩০, ২৬১, ২৮৬, ৩৭২, ৩৭৫, ৪৫৮),
(৪) তিথিবিবেক (পৃঃ ২৩৫),

রঘুনন্দনের—(১) মলমাসতত্ত্ব (পৃঃ ৭৭৪),
(২) শুদ্ধিতত্ত্ব (পৃঃ ২৩৭, ২৩৮),
(৩) তিথিতত্ত্ব (পৃঃ ৬৬),

গোবিন্দানন্দের—শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী (পৃঃ ২৩৭, ২৩৮)।

যে যে নিবন্ধকার ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভবদেব প্রাচীনতম। সুতরাং, ভবদেবের জীবনকালের নিম্নতর যে সীমারেখা (১১০০ খ্রীষ্টাব্দ) জিকনের কালেরও তাহাই। অপর প্রাচীন নিবন্ধকারেরাও সসম্মানে ইঁহার মতের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয় যে, ইঁহার প্রামাণিকত্ব ঐ যুগেই স্বীকৃত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ ইনি বালকেরও পূর্ববর্তী ছিলেন, সাধারণতঃ এই সমস্ত বিষয়ে প্রামাণিকত্ব অর্জন করা দীর্ঘসময়সাপেক্ষ। শূলপাণি কোন কোন স্থলে ইঁহার মতের সহিত স্বীয় মতের অনৈক্য প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু, মতানৈক্য অপেক্ষা মতৈক্যই অধিকতর।

প্রায়শ্চিত্ত, দুর্গোৎসব, শ্রাদ্ধ, শুদ্ধি, তিথি ও মলমাস প্রভৃতি বিষয়ে জিকনের উল্লেখ হইতে মনে হয়, ইনিও এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন 'শুদ্ধিতত্ত্বে' (পৃঃ ২৩৭) জিকনের নামের সহিত 'অন্ত্যেষ্টিবিধি' যুক্ত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই নামে জিকনের একটি গ্রন্থ ছিল। ঐ স্থান হইতেই মনে হয়, রঘুনন্দনের মতে, জিকন 'অনুমরণবিবেক'[১] নামক একটি গ্রন্থেরও প্রণেতা। 'তিথিতত্ত্বে' রঘুনন্দন কর্তৃক জিকনের উল্লেখ হইতে মনে হয়, জিকন স্মৃতিশাস্ত্রের একটি সংগ্রহও প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

বালকের স্থায় একই কারণে জিকনও বঙ্গদেশীয় লেখক ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়।

১ ঠিক এই নামের একটি গ্রন্থ শূলপাণির নামাঙ্কিতও আছে। (দ্রষ্টব্য:— বি. ই এ্যা., ৫ম বর্ষ, বর্তমান গ্রন্থকারের 'Sulapani, the Sahudiyan' শীর্ষক প্রবন্ধ)।

যোগ্লোক

ইহার উল্লেখ আছে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহে :—

জীমূতবাহনের—(১) কালবিবেক (পৃঃ ২২১, ২৭৩, ৩৬৫, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৯৪, ৩৯৫, ৪৫৪, ৪৫৭, ৪৬৫, ৪৮৩, ৪৯০, ৫০৩, ৫০৫, ৫০৬),

(২) ব্যবহারমাতৃকা (পৃঃ ২৯১, ২৯৩, ২৯৫, ৩০২, ৩১০, ৩১২, ৩১৩, ৩৪৭, ৩৪৮),

রঘুনন্দনের— ব্যবহারতত্ত্ব (পৃঃ ২১৭, ২২৩)।

জীমূতবাহনের পূর্বে কেহ ইহার উল্লেখ করেন নাই। জীমূতবাহন এক স্থলে যোগ্লোকের গ্রন্থের 'পুরাতনপুস্তী'র উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং, ইহার বহুকাল পূর্বেই যোগ্লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। জীমূতবাহনের কালসীমা আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১১শ হইতে ১২শ শতক। অতএব যোগ্লোক সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ১১শ শতকের পূর্ববর্তী লেখক।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কাল ও ব্যবহার—এই দুইটি বিষয়ের আলোচনায় যোগ্লোকের উল্লেখ আছে বলিয়া ইনিও এই উভয়বিধ বিষয়ে গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করা যায়। 'ব্যবহারমাতৃকা'র এক স্থলে (পৃঃ ৩৪৭) যোগ্লোকের কোন গ্রন্থের একটি প্রকরণের নাম দেওয়া আছে 'কারণোত্তর-প্রকরণ' ; এইরূপ প্রকরণ ব্যবহার বিষয়ক গ্রন্থেই সম্ভবপর।

কালবিষয়ে যোগ্লোকের উল্লেখ যে যে স্থানে আছে, উহাদের অনেক স্থলে বৃহদ্‌যোগ্লোক ও স্বল্পযোগ্লোকের উল্লেখ আছে, ইহা হইতে মনে হয় যে, যোগ্লোক-রচিত কালবিষয়ক গ্রন্থের একটি দীর্ঘ ও একটি হ্রস্ব রূপ ছিল।

জীমূতবাহন কোন কোন স্থলে 'তার্কিকম্মন্য' 'নবতার্কিকম্মন্য' ইত্যাদি দ্বারা যোগ্লোকের উপহাস করিয়াছেন এবং 'অসঙ্গত' ও 'হেয়' বলিয়া তাঁহার কতক মত বর্জন করিয়াছেন। জীমূতবাহনের মত লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখককেও যোগ্লোকের মতের বিচার করিতে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, সেই যুগেই যোগ্লোকের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। রঘুনন্দন যোগ্লোকের মতের উল্লেখ সসম্মানেই

করিয়াছেন এবং তাঁহার 'ব্যবহারতত্ত্ব' হইতে (পৃঃ ২১৭) জানা যায় যে, মৈথিল লেখকগণের নিকটও যোগ্লোকের মতের আদর ছিল।

বালক ও জিকনের ন্যায়, অনুরূপ কারণে, ইঁহাকেও বাঙ্গালী লেখক বলিয়া মনে করা যায়।

জিতেন্দ্রিয়[১]

শুধু জীমূতবাহনের নিম্নলিখিত গ্রন্থ তিনটিতে ইঁহার উল্লেখ আছে :—

কালবিবেক (পৃঃ ৭৮, ২৫৫, ৩৬৭, ৩৭০, ৩৮০, ৪৮৯),
দায়ভাগ (পৃঃ ১৬৬, ১৮৩, ১৯৩, ২২৪),
ব্যবহারমাতৃকা (পৃঃ ৩০২, ৩৩৪)।

জীমূতবাহন পদে পদে ইঁহার প্রামাণিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। জীমূতবাহনের ন্যায় খ্যাতিমান্ লেখক কর্তৃক ইঁহার সশ্রদ্ধ উল্লেখ হইতে মনে হয় যে, ঐ সময়ে জিতেন্দ্রিয় বঙ্গদেশে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক বলিয়া গণ্য হইতেন। জীমূতবাহনের কাল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১১শ-১২শ শতক, সুতরাং, জিতেন্দ্রিয়কে আনুমানিক ৯ম-১০ম শতকের লেখক বলিয়া অনুমান করা অসমীচীন মনে হয় না। বাংলাদেশে জিতেন্দ্রিয়ের যশ প্রতিষ্ঠিত হইতে প্রায় শতাব্দী কালের প্রয়োজন হইয়া থাকা অসম্ভব নহে।

কাল, দায়ভাগ ও ব্যবহার প্রসঙ্গে জিতেন্দ্রিয়েব উল্লেখ হইতে মনে হয়, ইনিও এই সমস্ত বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অতএব প্রায়শ্চিত্তকাণ্ডে জিতেন্দ্রিয়েণ ভণিতম্—'দায়ভাগে' (পৃঃ ২২৪) জীমূতবাহনের এই উক্তি হইতে মনে হয়, জিতেন্দ্রিয় প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে পৃথক্ গ্রন্থ রচনা না করিয়া

১ কাণে মহাশয়ের মতে, রঘুনন্দনের 'দায়তত্ত্বে' (স্মৃতিতত্ত্ব, ২, পৃঃ ১৮২) ইঁহার উল্লেখ আছে। কিন্তু, রঘুনন্দনের যে উক্তির উপর নির্ভর করিয়া কাণে মহাশয় এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে 'জিনেন্দ্র' পদটি আছে। ইহাকে জিতেন্দ্র বা জিতেন্দ্রিয় মনে করা সঙ্গত বোধ হয় না। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, জীমূতবাহন ও রঘুনন্দনের মধ্যবর্তী কালের কোন নিবন্ধকার জিতেন্দ্রিয়ের উল্লেখ করেন নাই ; সুতরাং, রঘুনন্দনের পক্ষেও ইঁহার উল্লেখ না করাই স্বাভাবিক।

থাকিলেও অপর কোন গ্রন্থের অংশবিশেষে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন।

রঘুনন্দনের 'দায়তত্ত্বে' জিনেন্দ্র নামে একজন লেখকের উল্লেখ আছে। যদি ইহা জিতেন্দ্রিয়ের উল্লেখ না হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, জীমূতবাহনের পরবর্তী কোন লেখকই ইঁহার উল্লেখ করেন নাই। ইহা হইতে মনে হয় যে, জিতেন্দ্রিয় অতি প্রাচীন লেখক ছিলেন। জীমূতবাহনের কাল পর্যন্ত ইঁহার খ্যাতি বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু, তৎপর এই দেশের স্মৃতিগগনে জীমূতবাহন-ভাস্করের প্রভায় জিতেন্দ্রিয়ের যশ ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল।

বালকাদির ন্যায় জিতেন্দ্রিয়ও বাঙ্গালী লেখক ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

পরিশিষ্ট (খ)

বঙ্গীয়স্মৃতি ও মৈথিলস্মৃতি

বঙ্গদেশের স্মৃতিনিবন্ধগুলিতে যে নিবন্ধকারগণের উল্লেখ আছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন মিথিলাবাসী। মৈথিল স্মার্তগণের রচিত বহু নিবন্ধেরও উল্লেখ বঙ্গীয় নিবন্ধসমূহে রহিয়াছে। মিথিলাতে কোন্ যুগে নব্যস্মৃতিচর্চার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা অনির্ণেয়। কথিত আছে, প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্মৃতিকার যাজ্ঞবল্ক্য মিথিলার রাজা জনকের আশ্রিত ছিলেন। সে যাহা হউক, বাংলাদেশে এই শাস্ত্রের চর্চার সমকালে যে মিথিলাতেও ইহার প্রাধান্য ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। অদ্যাবধি আবিষ্কৃত বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধসমূহের মধ্যে ভবদেবের গ্রন্থই প্রাচীনতম। ভবদেব মৈথিল স্মৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। ভবদেবের কাল খ্রীঃ ৮০০ হইতে ১১০০ অব্দের মধ্যবর্তী বলিয়া মনে করা হয়। সুতরাং, এই কালের পূর্বেই স্মৃতিশাস্ত্রে মিথিলার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই যুক্তিবলে বলা যায় যে, মধ্যযুগীয় মৈথিল স্মৃতি খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের অর্বাচীন বলিয়া কাহারও কাহারও যে ধারণা আছে, তাহা ভ্রমাত্মক[১]।

ভবদেব হইতে আরম্ভ করিয়া রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দ পর্যন্ত অনেক বঙ্গীয় স্মার্তই মৈথিল স্মৃতিকারের বা স্মৃতিনিবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। সকল ক্ষেত্রেই যে বাঙ্গালীরা মৈথিলগণের যুক্তি সমর্থন করিয়াছেন, তাহা নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে, মৈথিল মতবাদ বাঙ্গালী স্মার্তগণ খণ্ডনও করিয়াছেন। স্থানে স্থানে বঙ্গীয় স্মার্তগণ কর্তৃক স্বীয় মতের সমর্থনে মৈথিল-মতের উল্লেখ এবং স্থলবিশেষে মৈথিলমতের নিরসনে তাঁহাদের ব্যগ্রতা

১ মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় বলিয়াছেন যে, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে মিথিলার মধ্যযুগীয় কোন স্মৃতিগ্রন্থ পাওয়া যায় না। [দ্রঃ Journal of Asiatic Society of Bengal, 1915, পৃঃ ৩৭৭।]
মিথিলায় স্মৃতিচর্চার কাল সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য History of Mithila (Thakur), ৭ম অধ্যায়

—এই উভয় কারণেই মনে হয় যে, মৈথিলস্মৃতির প্রভাব তৎকালে বঙ্গসমাজে উপেক্ষণীয় ছিল না। বস্তুতঃ, মিথিলায়, বাংলাদেশের ন্যায়, নব্যস্মৃতির একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়েরই অভ্যুত্থান হইয়াছিল। কেহ কেহ অবশ্য মনে করেন যে, মৈথিলস্মৃতি প্রাচীনতর উত্তরভারতীয় নব্যস্মৃতিরই একটি উপবিভাগমাত্র ; কারণ, শেষোক্ত স্মৃতির সহিত পূর্বোক্ত স্মৃতির সাদৃশ্য এত অধিক যে, মৈথিলস্মৃতিকে স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের বলা চলে না[১]।

আচার, প্রায়শ্চিত্ত ও ব্যবহার—স্মৃতিশাস্ত্রের এই প্রধান তিনটি বিষয়েই বঙ্গীয় নিবন্ধকারগণের উপরে মৈথিল স্মৃতিকারগণের প্রভাব লক্ষণীয়। বঙ্গীয় নিবন্ধকারগণ গ্রন্থ রচনা করিতে যাইয়া প্রাচীন ও নব্যস্মৃতি উভয়েরই বিশদ আলোচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মৈথিল স্মৃতির সহিত তাঁহাদের অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কারণ ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক উভয়ই। মিথিলা বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী। মধ্যযুগের ইতিহাসে বাংলায় ও মিথিলায় দীর্ঘকাল একই শাসনব্যবস্থা দেখা যায়। ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধী মুসলমানগণের ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টার ফলভাগী বাংলা ও বিহার সমভাবেই হইয়াছিল। এই সকল কারণে, এই দুই স্থানের সমাজনেতৃগণের ভাবের পারস্পরিক আদান প্রদান সম্ভবপর হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

মিথিলার সকল স্মৃতিনিবন্ধ ও সকল নিবন্ধকারের পরিচয় সম্যক্‌ভাবে পাওয়া যায় না। বঙ্গীয় নিবন্ধগুলিতে যে সমস্ত গ্রন্থকারের ও গ্রন্থের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে যাঁহাদিগকে নিশ্চিতভাবে মৈথিল বলিয়া জানা যায়[২] তাঁহাদের নাম নিম্নে সংগৃহীত হইল এবং বঙ্গের কোন্ গ্রন্থে কাহার উল্লেখ আছে তাহাও যথাসম্ভব লিখিত হইল।

১ মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় এই মতের সমর্থন করেন। [দ্রঃ Journal of Asiatic Society of Bengal, 1915, পৃঃ ৩৭৭।]

২ এই সম্বন্ধে কাণের হি. ধ. (১ম খণ্ড) ও মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের Contribution to the history of Bengal and Mithila শীর্ষক প্রবন্ধকেই (Journal of Asiatic Soc. of Bengal, 1915, পৃঃ ৩৭৭) প্রধান প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে।

মৈথিল গ্রন্থকার

অপিপাল

রঘুনন্দনের 'যজুর্বেদিশ্রাদ্ধতত্ত্ব' (পৃঃ ৪৯৮)।
গোবিন্দানন্দের 'শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী' (পৃঃ ৫৬, ৩৮৮)।

গঙ্গাবাক্যাবলীকার (বিদ্যাপতি)

গোবিন্দানন্দের 'বর্ষক্রিয়াকৌমুদী' (পৃঃ ৯৭, ১০৭) ও
'শুদ্ধিকৌমুদী' (পৃঃ ২১৭)।

চণ্ডেশ্বর (বা, চণ্ডেশ্বরমন্ত্রী)

রঘুনন্দনের 'মলমাসতত্ত্ব' (পৃঃ ৭৯৬),
'ব্যবহারতত্ত্ব' (পৃঃ ২২৩)।

বর্ধমান (বা, নবীনবর্ধমান, নব্যবর্ধমানোপাধ্যায়)

রঘুনন্দনের 'মলমাসতত্ত্ব' (পৃঃ ৭৫৬, ৮০১, ৮০৩, ৮১২, ৮১৪, ৮১৫, ৮৪২),
'শুদ্ধিতত্ত্ব' (পৃঃ ৩৪১),
'তিথিতত্ত্ব' (পৃঃ ১৯, ৫৬, ১২২, ১৮৪, ১৮৫),
'ব্যবহারতত্ত্ব' (পৃঃ ২২৩),
'জ্যোতিস্তত্ত্ব' (পৃঃ ৫১৪),
'বাস্তুযাগতত্ত্ব' (পৃঃ ৪১৫),
'আহ্নিকতত্ত্ব' (পৃঃ ৩৪২, ৩৫২, ৩৮০, ৪২৪, ৪৩২),
'শ্রাদ্ধতত্ত্ব' (পৃঃ ২১৭, ২২৪, ২৪৮, ২৪৯, ২৬৪, ২৮৬, ৩১৪)
একাদশীতত্ত্ব' (পৃঃ ৭, ৪৫),
'যজুর্বেদিশ্রাদ্ধতত্ত্ব' (পৃঃ ৫০২),
গোবিন্দানন্দের 'দানক্রিয়াকৌমুদী' (পৃঃ ২৯)।

মৈথিল

রঘুনন্দনের 'মলমাসতত্ত্ব' (পৃঃ ৭৪৯, ৭৫৮, ৭৬৫, ৭৯৭, ৭৯৯),
'সংস্কারতত্ত্ব' (পৃঃ ৮৭২, ৮৯৪),
'শুদ্ধিতত্ত্ব' (পৃঃ ২৬৭, ২৭৫, ৩১৪, ৩১৬, ৩২২, ৩৩২, ৩৩৯, ৩৮২, ৩৮৭, ৩৯০),
'তিথিতত্ত্ব' (পৃঃ ১৯, ১৮০),
'ব্যবহারতত্ত্ব' (পৃঃ ১৯৭, ২১৭, ২২৫),
'ছন্দোগবৃষোৎসর্গতত্ত্ব' (পৃঃ ৫৫৪),
'দিব্যতত্ত্ব' (পৃঃ ৬০৮),
'আহ্নিকতত্ত্ব' (পৃঃ ৩৪১),
'শ্রাদ্ধতত্ত্ব' (পৃঃ ২১৪, ২২১, ২২৯, ২৪২, ২৪৫, ২৪৬, ২৭৬, ২৮৩, ২৯২, ২৯৩, ৩০৮, ৩০৯),
'যজুর্বেদিশ্রাদ্ধতত্ত্ব' (পৃঃ ৪৯৭, ৪৯৮),
'শূদ্রকৃত্যবিচারণতত্ত্ব' (পৃঃ ৬৩৪)।

রুদ্রধরোপাধ্যায়

রঘুনন্দনের 'শুদ্ধিতত্ত্ব' (পৃঃ ২৬৫, ২৭২, ২৮৭),
'তিথিতত্ত্ব' (পৃঃ ১৩৬, ১৩৭),
'কৃত্যতত্ত্ব' (পৃঃ ৪৭১, ৪৭৯),
'শ্রাদ্ধতত্ত্ব' (পৃঃ ২২৬)।

বাচস্পতিমিশ্র

রঘুনন্দনের 'মলমাসতত্ত্ব' (পৃঃ ৭৫৯, ৭৯০, ৭৯৯, ৮১৬, ৮২৬, ৮২৯, ৮৩১, ৮৪৫).
'শুদ্ধিতত্ত্ব' (পৃ. ২৭১, ২৭২, ২৯২, ৩০২, ৩১৫, ৩৩২, ৩৪৭ ৩৭৩, ৩৭৮, ৩৯০),
'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব' (পৃঃ ৪৭১),
'উদ্বাহতত্ত্ব' (পৃঃ ১৩৬),

তিথিতত্ত্ব' (পৃঃ ১৩,২০, ৮৪, ৮৯, ৯৯, ১০৩, ১২৯, ১৫৮,
১৮৩, ১৮৪),
'একাদশীতত্ত্ব' (পৃঃ ৫,৩৫, ৪৪, ৪৫, ৯৮, ১০৩),
'যজুর্বৃষোৎসর্গতত্ত্ব' (পৃঃ ৬৩৬, ৬৪০),
'দিব্যতত্ত্ব' (পৃঃ ৫৮৬),
'আহ্নিকতত্ত্ব' (পৃঃ ৩৫৭,৩৬৫),
'কৃত্যতত্ত্ব' (পৃঃ ৪৪২),
'শ্রাদ্ধতত্ত্ব' (পৃঃ ২২৪,২৭৫,২৯৪),
'যজুর্বেদিশ্রাদ্ধতত্ত্ব' (পৃঃ ৪৯৬)।

শ্রীদত্ত (বা, শ্রীদত্তোপাধ্যায়)

শূলপাণির 'দুর্গোৎসববিবেক' (পৃঃ ১৮,২১)।
রঘুনন্দনের 'মলমাসতত্ত্ব' (পৃঃ ৭৯০,৮৩৯),
'শুদ্ধিতত্ত্ব' (পৃঃ ৩১৭),
'তিথিতত্ত্ব' (পৃঃ ২১, ৪০, ৫৮, ৮২, ৮৫, ১৩২, ১৭৮, ১৮০),
'একাদশীতত্ত্ব' (পৃঃ ৭, ১৫, ৪৫, ১০৫),
'আহ্নিকতত্ত্ব' (পৃঃ ৩৩৮, ৩৫৬, ৪১৯, ৪২২),
'শ্রাদ্ধতত্ত্ব' (পৃঃ ১৯৮, ২০৪, ২৭৫, ২৭৭, ২৯৬),
'যজুর্বেদিশ্রাদ্ধতত্ত্ব' (পৃঃ ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৬, ৫০০)।
গোবিন্দানন্দের 'শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী' (পৃঃ ৫৭, ৬৭, ৮৫, ৯২, ১১৬,
১১৯, ১২৩, ১৩০, ১৩৭, ১৩৮, ১৪৯,
১৫৪, ১৫৭, ১৬২, ১৬৪, ১৬৮, ১৬৯,
১৮৫, ১৯৮, ২৯৫, ৩০৫, ৩১০, ৩৯০,
৪২২, ৪২৭, ৫০৪, ৫১৪, ৫৫৮),
'বর্ষক্রিয়াকৌমুদী' (পৃঃ ৩৪৭)।

হরিনাথ (বা, হরিনাথোপাধ্যায়)

ভবদেবের 'প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ' (পৃঃ ৫৩৬)।

রঘুনন্দনের 'উদ্বাহতত্ত্ব' (পৃঃ ১০৮, ১১১, ১১৯),
'তিথিতত্ত্ব' (পৃঃ ৮৫),
'একাদশীতত্ত্ব' (পৃঃ ৭, ১০৫)।

মৈথিল গ্রন্থ

আচারচিন্তামণি
(বাচস্পতিমিশ্রকৃত)

রঘুনন্দনের 'আহ্নিকতত্ত্ব' (পৃঃ ৩৩৮, ৪০৭)।

আচারচন্দ্রিকা
(পদ্মনাভদত্তকৃত ?)

রঘুনন্দনের 'আহ্নিকতত্ত্ব' (পৃঃ ৩৪৩)।

আহ্নিকচিন্তামণি,
বাচস্পতিমিশ্রকৃত)

রঘুনন্দনের 'একাদশীতত্ত্ব' (পৃঃ ৫৮)।

কৃত্যচিন্তামণি
(চণ্ডেশ্বর ও বাচস্পতি উভয়েরই এই নামের গ্রন্থ আছে)

রঘুনন্দনের 'উদ্বাহতত্ত্ব' (পৃঃ ১২৫),
'তিথিতত্ত্ব' (পৃঃ ২১, ৩৬, ৪৪, ৬৯, ১১৮, ১২১, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৯, ১৫১, ১৫৮, ১৬০),
'একাদশীতত্ত্ব' (পৃঃ ৫),
'মঠপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব' (পৃঃ ৬১৬),

'জ্যোতিস্তত্ত্ব' (পৃঃ ৫৮৩, ৫৯৪, ৬০৫, ৬০৭, ৬১২, ৬১৪
৬১৬, ৬৪৮, ৬৪৯, ৬৫২, ৬৫৯, ৬৬৬,
৬৮৬, ৬৯০, ৭০৬),
'কৃত্যতত্ত্ব' (পৃঃ ৪২৬, ৪৭১, ৪৭৩),
'শ্রাদ্ধতত্ত্ব' (পৃঃ ২৮২, ৩২৩),
'দুর্গাপূজাতত্ত্ব' (পৃঃ ১৪),
'শুদ্ধিতত্ত্ব' (পৃঃ ২৫০, ৩৩০)।

কৃত্যমহার্ণব

(বাচস্পতিমিশ্রকৃত)

রঘুনন্দনের 'তিথিতত্ত্ব' (পৃঃ ৮২, ১০৩, ১০৬, ১০৭),
'একাদশীতত্ত্ব' (পৃঃ ৩৯, ৪৬)।
গোবিন্দানন্দের 'বর্ষক্রিয়াকৌমুদী' (পৃঃ ৫১)।

কৃত্যরত্নাকর

(চণ্ডেশ্বরকৃত)

রঘুনন্দনের 'মলমাসতত্ত্ব' (পৃঃ ৭৬৮),
'তিথিতত্ত্ব' (পৃঃ ৮৫),
'জ্যোতিস্তত্ত্ব' (পৃঃ ৬৮৮)।

গঙ্গাবাক্যাবলী

(বিদ্যাপতিকৃত)

রঘুনন্দনের 'মলমাসতত্ত্ব' (পৃঃ ৭৪৯, ৭৫৩, ৭৬৪),
'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব' (পৃঃ ৪৮৭, ৪৮৯, ৪৯২, ৫১৬, ৪৯৯, ৫০২),
'তিথিতত্ত্ব' (পৃঃ ৩৯, ৭৯, ১৪২, ১৫৭),
'শুদ্ধিতত্ত্ব' (পৃঃ ৩৪৮, ৩৬১),
'শ্রাদ্ধতত্ত্ব' (পৃঃ ২৫৯, ৩২৪, ৩২৫)।

গৃহস্থরত্নাকর

(চণ্ডেশ্বরকৃত)

রঘুনন্দনের 'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব' (পৃঃ ৫০৯, ৫২০),
'উদ্বাহতত্ত্ব' (পৃঃ ১১৫, ১৪৬),
'তিথিতত্ত্ব' (পৃঃ ১২০)।

ছন্দোগাহ্নিক

(শ্রীদত্তকৃত)

রঘুনন্দনের 'দিব্যতত্ত্ব' (পৃঃ ৫৮৯)।

তীর্থচিন্তামণি

(বাচস্পতিমিশ্রকৃত)

শূলপাণির 'দোলযাত্রাবিবেক' (পৃঃ ৫৯)।
রঘুনন্দনের 'মলমাসতত্ত্ব' (পৃঃ ৮১০),
'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব' (পৃঃ ৪৯৯, ৫০০, ৫০৩),
'তিথিতত্ত্ব' (পৃঃ ৩৯),
'উদ্বাহতত্ত্ব' (পৃঃ ১৩৫),
'শুদ্ধিতত্ত্ব' (পৃঃ ৩০০),
'শ্রাদ্ধতত্ত্ব' (পৃঃ ৩১৩)।

দানরত্নাকর

(চণ্ডেশ্বরকৃত)

রঘুনন্দনের 'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব' (পৃঃ ৪৭৮),
'শুদ্ধিতত্ত্ব' (পৃঃ ২৮৪),
'ব্যবহারতত্ত্ব' (পৃঃ ২১৪),
'মঠপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব' (পৃঃ ৬৩০),
'জ্যোতিস্তত্ত্ব' (পৃঃ ৬৮৯)।

দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী

(বিদ্যাপতিকৃত)

রঘুনন্দনের 'তিথিতত্ত্ব' (পৃঃ ৬৬, ৮১, ৮৬, ৯৩, ১০১, ১০৩)।

দ্বৈতনির্ণয়

(বাচস্পতিমিশ্রকৃত)

রঘুনন্দনের 'মলমাসতত্ত্ব' (পৃঃ ৭৯৪, ৮০২, ৮২৬, ৮২৯, ৮৪৫, ৮৫০),
'উদ্বাহতত্ত্ব' (পৃঃ ১১৬),
'তিথিতত্ত্ব' (পৃঃ ৪২, ৬৬, ১৬৬),
'একাদশীতত্ত্ব' (পৃঃ ৪২, ৪৩),
'জ্যোতিস্তত্ত্ব' (পৃঃ ৬০৭),
'শুদ্ধিতত্ত্ব' (পৃঃ ৩১৬, ৩৭২),
'ছন্দোগবৃষোৎসর্গতত্ত্ব' (পৃঃ ৫২৯),
'শ্রাদ্ধতত্ত্ব' (পৃঃ ২৫৬, ৩১৪)।

মহাদাননির্ণয়

(বাচস্পতিমিশ্রকৃত)

রঘুনন্দনের 'তিথিতত্ত্ব' (পৃঃ ৯৬, ৯৮, ৯৯),
'আহ্নিকতত্ত্ব' (পৃঃ ৪২০)।

রত্নাকর

(চণ্ডেশ্বরকৃত)

রঘুনন্দনের 'মলমাসতত্ত্ব' (পৃঃ ৭৪৩, ৭৯৩, ৮১৮),
'সংস্কারতত্ত্ব' (পৃঃ ৮৬৩, ৮৯০, ৮৯৩, ৮৯৬),
'শুদ্ধিতত্ত্ব' (পৃঃ ২৩৬, ২৬৫, ২৬৬, ২৭২, ২৭৩, ২৮০, ২৮৮
৩০৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩৪১, ৩৪৫, ৩৫০, ৩৫১,
৩৫২, ৩৫৪, ৩৯০, ৩৯৫, ৩৯৭),

'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব' (পৃঃ ৪৯২, ৫০৫, ৫০৮),
'উদ্বাহতত্ত্ব' (পৃঃ ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১৯, ১২১, ১২২, ১২৭, ১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৫০),
'তিথিতত্ত্ব' (পৃঃ ৩৪, ৩৮, ৬৬, ৬৮, ৭৯, ১০৩, ১২৩, ১৮০),
'ব্যবহারতত্ত্ব' (পৃঃ ২৩৩),
'একাদশীতত্ত্ব' (পৃঃ ৬৩, ৬৯),
'জলাশয়োৎসর্গতত্ত্ব' (পৃঃ ৫১৪, ৫১৯, ৫২২, ৫২৫),
'ছন্দোগবৃষোৎসর্গতত্ত্ব' (পৃঃ ৫৩৮),
'দায়তত্ত্ব' (পৃঃ ১৬৭, ১৭২, ১৭৫, ১৭৭, ১৭৮, ১৮২, ১৮৪, ১৯০, ১৯৫),
'মঠপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব' (পৃ. ৬৩১, ৬৩২),
'দিব্যতত্ত্ব' (পৃঃ ৬০৬),
'আহ্নিকতত্ত্ব' (পৃঃ ৩৩০, ৩৩৯, ৩৮০, ৩৯৬, ৩৯৭ ৪০১, ৪০৪, ৪৬০),
'কৃত্যতত্ত্ব' (পৃঃ ৪৩৭),
'শ্রাদ্ধতত্ত্ব' (পৃঃ ১৯৪, ১৯৫, ২২৭, ৩০৬),
'দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব' (পৃঃ ৫১২)।

গোবিন্দানন্দের 'শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী' (পৃঃ ৪৭৪)।

বর্ষকৃত্য

(রুদ্রধর ও বিদ্যাপতি উভয়েরই এই নামের গ্রন্থ আছে)।

শূলপাণির 'দুর্গোৎসববিবেক' (পৃঃ ২৬)।

রঘুনন্দনের 'মলমাসতত্ত্ব' (পৃঃ ৭৭৬, ৮২৩। শেষোক্ত স্থলে গ্রন্থটিকে 'বিদ্যাপতিকৃত' বলা হইয়াছে),
'তিথিতত্ত্ব' (পৃঃ ১০৩, ১৪১),
'একাদশীতত্ত্ব' (পৃঃ ১০০),
'দুর্গাপূজাতত্ত্ব' (পৃঃ ৪৬)।

বিবাদচিন্তামণি

(বাচস্পতিমিশ্রকৃত)

রঘুনন্দনের 'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব' (পৃঃ ৫১৪),
'দায়তত্ত্ব' (পৃঃ ১৭৬, ১৯৬),
'শুদ্ধিতত্ত্ব' (পৃঃ ৩২৮, ৩৫০, ৩৫৭)

বিবাদরত্নাকর

(চণ্ডেশ্বরকৃত)

রঘুনন্দনের 'উদ্বাহতত্ত্ব' (পৃঃ ১২৮, ১৩৯),
'শুদ্ধিতত্ত্ব' (পৃঃ ৩২৮),
'মঠপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব' (পৃঃ ৬২৭)।

ব্যবহারচিন্তামণি

(বাচস্পতিমিশ্রকৃত)

রঘুনন্দনের 'দায়তত্ত্ব' (পৃঃ ১৮০),
'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব' (পৃঃ ৫১২)।

শুদ্ধিচিন্তামণি

(বাচস্পতিমিশ্রকৃত)

রঘুনন্দনের 'উদ্বাহতত্ত্ব' (পৃঃ ১২০),
'শুদ্ধিতত্ত্ব' (পৃঃ ২৩৬, ৩২৭)।

শুদ্ধিরত্নাকর

(চণ্ডেশ্বররচিত)

রঘুনন্দনের 'মলমাসতত্ত্ব' (পৃঃ ৭৯৫),
'শুদ্ধিতত্ত্ব' (পৃঃ ৩০১, ৩১০)।

শ্রাদ্ধচিন্তামণি

(বাচস্পতিমিশ্রকৃত)

রঘুনন্দনের 'মলমাসতত্ত্ব' (পৃঃ ৮১৩, ৮১৪, ৮৪৪),
'শুদ্ধিতত্ত্ব' (পৃঃ ৩০৬, ৩২৭, ৩৯৪),
'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব' (পৃঃ ৪৭৫),
'উদ্বাহতত্ত্ব' (পৃঃ ১৩২),
'তিথিতত্ত্ব' (পৃঃ ২০, ১১৮, ১৬১, ১৭৮, ১৭৯),
'শ্রাদ্ধতত্ত্ব' (পৃঃ ১৯২, ২৪০, ২৫৮, ২৬৩, ২৬৪, ২৭৮, ২৮৮, ৩০৫),
'শূদ্রকৃত্যবিচারণতত্ত্ব' (পৃঃ ৬৩৪),
'দুর্গাপূজাতত্ত্ব' (পৃঃ ২)।

গোবিন্দানন্দের 'শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী' (পৃঃ ১৬৩, ১৮৫, ২৬৩, ২৬৫, ২৭৯, ২৯৬, ৩১৯, ৩৭৩, ৩৫৪, ৩৮৩, ৪৩১, ৪৫০, ৪৫৩, ৪৫৭, ৪৭৫, ৪৭৯),
'বর্ষক্রিয়াকৌমুদী' (পৃঃ ৩৪৮, ৪৮৫, ৪৮৭),
'শুদ্ধিকৌমুদী' (পৃঃ ৮৯, ৯৩)।

শ্রাদ্ধপ্রদীপ

(শঙ্করমিশ্র ও বর্ধমান উভয়েরই এই নামের গ্রন্থ আছে)

রঘুনন্দনের 'শ্রাদ্ধতত্ত্ব' (পৃঃ ৩১৪),
'শুদ্ধিতত্ত্ব' (পৃঃ ৩৩৯)।

সময়প্রদীপ

(শ্রীদত্তকৃত)

শূলপাণির 'দুর্গোৎসববিবেক' (পৃঃ ২১)।

রঘুনন্দনের 'একাদশীতত্ত্ব' (পৃঃ ৪৪, ৪৫),
'মলমাসতত্ত্ব' (পৃঃ ৮৩৯)।

স্বগতিসোপান

(গণেশ্বরঠক্কুরকৃত)

রঘুনন্দনের 'সংস্কারতত্ত্ব' (পৃঃ ৮৬১),
'শুদ্ধিতত্ত্ব' (পৃঃ ৩১২),
'ছন্দোগবৃষোৎসর্গতত্ত্ব' (পৃঃ ৫৩৩, ৫৫৬)।

স্মৃতিসার

(হরিনাথকৃত)

রঘুনন্দনের 'মলমাসতত্ত্ব' (পৃঃ ৭৫৩),
'আহ্নিকতত্ত্ব' (পৃঃ ৩৭৬),
'উদ্বাহতত্ত্ব' (পৃঃ ১১৯),
'শুদ্ধিতত্ত্ব' (পৃঃ ২৯২, ৩৪১),
'জ্যোতিস্তত্ত্ব' (পৃঃ ৫৯৪)।

স্মৃতিরত্নাকর

(চণ্ডেশ্বরকৃত)

রঘুনন্দনের 'মলমাসতত্ত্ব' (পৃঃ ৮৪৮)।

স্মৃতিপরিভাষা

(বর্ধমানরচিত)

রঘুনন্দনের 'একাদশীতত্ত্ব' (পৃঃ ৮৭),
'শুদ্ধিতত্ত্ব' (পৃঃ ২৯১)।

পরিশিষ্ট (গ)

বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধসমূহে[1] ধৃত গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম

বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধগুলিতে বহু স্মৃতিগ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামের উল্লেখ আছে। নিবন্ধগুলির অনেক স্থলে নানা স্মৃতির বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণা ও বঙ্গীয় স্মৃতিতে অপর প্রদেশের স্মৃতিকারগণের প্রভাব প্রভৃতি আলোচনার জন্য ঐ সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামসূচী অপরিহার্য। পণ্ডিতপ্রবর কানে তদীয় History of Dharmasāstra (Vol. I) নামক গ্রন্থের শেষে বিভিন্ন স্মৃতিকার ও স্মৃতিগ্রন্থের একটি বিস্তৃত তালিকা দিয়াছেন। কিন্তু, বিস্তীর্ণ স্মৃতিশাস্ত্রের সকল গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করা তাঁহার পক্ষে স্বভাবতঃই সম্ভবপর হয় নাই, বিশেষতঃ, ভারতীয় স্মৃতিশাস্ত্রের সামগ্রিক আলোচনায় আঞ্চলিক নিবন্ধগুলি সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য আহরণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

বাংলাদেশের স্মৃতিনিবন্ধসমূহে যে সকল স্মৃতিকার ও স্মৃতিগ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়[2], উহাদের বর্ণানুক্রমিক সূচী এই পরিশিষ্টে লিপিবদ্ধ হইল। এইরূপ গ্রন্থকার ও গ্রন্থের মধ্যে যাহাদের নাম কানে মহাশয়ের উক্ত তালিকায় পাওয়া যায় না, তাহাদের নাম তারকা-চিহ্নিত করিয়া দেওয়া গেল।

বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধসমূহে ধৃত যে সকল গ্রন্থের নাম নিম্নে লিখিত হইল, উহাদের সবই যে ধর্মশাস্ত্রবিষয়ক তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না, কারণ, সকল গ্রন্থেরই বিষয়বস্তু জানা নাই। স্মৃতির সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্রের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ বলিয়া বঙ্গীয় নিবন্ধকারগণ কর্তৃক ধৃত জ্যোতিষগ্রন্থগুলিও এই তালিকার বিষয়ীভূত হইল। নিম্নের তালিকায় সংখ্যাগুলি সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের পৃষ্ঠা-সংখ্যার নির্দেশক।

১ শুধু প্রধান প্রধান প্রকাশিত নিবন্ধগুলির উল্লেখই এখানে করা হইল।

২ অধিকাংশ বঙ্গীয় নিবন্ধে নামসূচী নাই; সুতরাং, যে সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের উল্লেখ উহাদের মধ্যে আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি দৃষ্টি এড়াইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি যে সকল স্মৃতিকারের উল্লেখ বঙ্গীয় নিবন্ধগুলির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় রহিয়াছে, তাঁহাদের নাম এই তালিকায় দেওয়া হইল না।

এই তালিকায় নিম্নলিখিত সংকেতগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে।

আ. ত.—রঘুনন্দনের 'আহ্নিকতত্ত্ব' (জীবানন্দ-সম্পাদিত 'স্মৃতিতত্ত্বে'র অন্তর্গত)।

উ. ত.—উদ্বাহতত্ত্ব (ঐ)।

এ. ত.—একাদশীতত্ত্ব (ঐ)।

কা. বি.—জীমূতবাহনের 'কালবিবেক', বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা সংস্করণ, কলিকাতা।

ছ. ত.—রঘুনন্দনের 'ছন্দোগবৃষোৎসর্গতত্ত্ব' (জীবানন্দ-সম্পাদিত 'স্মৃতিতত্ত্বে'র অন্তর্গত)।

জ্যো. ত.—জ্যোতিস্তত্ত্ব (ঐ)।

তি. ত.—তিথিতত্ত্ব (ঐ)।

তি. বি.—শূলপাণির 'তিথিবিবেক', বর্তমান গ্রন্থকার-সম্পাদিত ('পুনা ওরিয়েণ্ট্যালিষ্ট পত্রিকা, ৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ড)।

দা. ভা.—জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ', সং জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কলিকাতা, ১৮৯৩ খ্রীঃ।

দ. ত.—রঘুনন্দনের 'দায়তত্ত্ব' (জীবানন্দ-সম্পাদিত 'স্মৃতিতত্ত্বে'র অন্তর্গত)।

দা. কৌ.—গোবিন্দানন্দের 'দানক্রিয়াকৌমুদী', বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯০৩ খ্রীঃ।

দা. সা.—বল্লালসেনের 'দানসাগর', বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা সংস্করণ, কলিকাতা।

দী. ত.—রঘুনন্দনের 'দীক্ষাতত্ত্ব' (জীবানন্দ সম্পাদিত 'স্মৃতিতত্ত্বে'র অন্তর্গত)

দু. ত.—দুর্গাপূজাতত্ত্ব (ঐ)।

দু. বি.—শূলপাণির 'দুর্গোৎসববিবেক', সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্ সিরিজ, কলিকাতা।

দে. ত.—রঘুনন্দনের 'দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব' (জীবানন্দ-সম্পাদিত 'স্মৃতিতত্ত্বে'র অন্তর্গত)।

পু. ত.—রঘুনন্দনের 'পুরুষোত্তমতত্ত্ব' (স্মৃতিতত্ত্ব, সং জীবানন্দ)।

প্রা. ত.—প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব (ঐ)।

প্রা. প্র.—ভবদেবভট্টের 'প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ', রাজসাহী, ১৯২৭ খ্রীঃ।

ব. কৌ.—গোবিন্দানন্দের 'বর্ষক্রিয়াকৌমুদী', বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা সংস্করণ, কলিকাতা।

বা. ত.—রঘুনন্দনের 'বাস্তুযাগতত্ত্ব' (স্মৃতিতত্ত্ব, সং জীবানন্দ)।

বা. বি.—শূলপাণির 'বাসন্তীবিবেক', সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা।

ব্য. ত.—রঘুনন্দনের 'ব্যবহারতত্ত্ব' (জীবানন্দ-সম্পাদিত 'স্মৃতিতত্ত্বে'র অন্তর্গত)।

ব্য. মা.—জীমূতবাহনের 'ব্যবহারমাতৃকা' সং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

ব্র. বি.—শূলপাণির 'ব্রতকালবিবেক' (ই. হি. কো. ১৯৪১)।

ব্র. ত.—রঘুনন্দনের 'ব্রততত্ত্ব' (স্মৃতিতত্ত্ব, সং জীবানন্দ)।

ব্রা. স.—হলাযুধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব', সং তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ, কলিকাতা, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ।

ম. ত.—রঘুনন্দনের 'মলমাসতত্ত্ব' (জীবানন্দ-সম্পাদিত 'স্মৃতিতত্ত্বের' অন্তর্গত।)

ম. ত.[১]—মঠপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব (ঐ)।

য. ত.—যজুর্বেদি-শ্রাদ্ধতত্ত্ব (ঐ)।

শু. ত.—শুদ্ধিতত্ত্ব (ঐ)।

শু. কৌ.—গোবিন্দানন্দের 'শুদ্ধিকৌমুদী', বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা সংস্করণ, কলিকাতা।

শ্রা. ত—শ্রাদ্ধতত্ত্ব (ঐ)।

শ্রা. বি.—শূলপাণির 'শ্রাদ্ধবিবেক', সং চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, কলিকাতা, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ।

শ্রা. কৌ.—গোবিন্দানন্দের 'শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী', বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা সংস্করণ, কলিকাতা।

স. ত.—রঘুনন্দনের 'সংস্কারতত্ত্ব' (জীবানন্দ-সম্পাদিত 'স্মৃতিতত্ত্বের' অন্তর্গত)।

স. বি.—শূলপাণির 'সম্বন্ধবিবেক', সং জে. বি. চৌধুরী, কলিকাতা, ১৯৪২।

হা. ল.—অনিরুদ্ধের 'হারলতা', বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা সংস্করণ, কলিকাতা।

পরিশিষ্ট (গ)

[নিম্নতালিকাভুক্ত নামগুলি দেবনাগর বর্ণানুক্রমিক]

গ্রন্থকার

গ্রন্থ

সংযোজন

বাঙালী-রচিত দত্তক-বিষয়ক নিবন্ধ ও কুবেরের 'দত্তকচন্দ্রিকা'

বাংলাদেশের কয়েকজন বিখ্যাত নিবন্ধকারের নামাঙ্কিত দত্তক-বিষয়ক কতক গ্রন্থের পরিচয় গ্রন্থান্তরে পাওয়া যায়। 'দত্তকতিলক' নামে একটি গ্রন্থ ভবদেবের নামের সহিত যুক্ত আছে। সম্ভবতঃ, ইহা তৎপ্রণীত 'ব্যবহার-তিলকে'র অংশবিশেষ। কিন্তু, ভবদেব ভট্টের 'দত্তকতিলক' গ্রন্থের কোন পুথি অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। রাজসাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটিতে রক্ষিত 'দত্তকতিলক' নামক গ্রন্থটি বঙ্গের প্রসিদ্ধ স্মার্ত 'বালবলভীভুজঙ্গ' ভবদেব ভট্টের রচিত বলিয়া মনে হয় না।[১] ভরত শিরোমণি কর্তৃক সংকলিত 'দত্তকশিরোমণি'তে[২] যে 'দত্তকতিলক' গ্রন্থ হইতে অংশসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা বাঙালী ভবদেবের প্রণীত কি না জানা যায় না। শূলপাণি-রচিত দত্তকপুত্রবিষয়ক গ্রন্থের উল্লেখ 'দত্তকনির্ণয়', 'দত্তকপুত্রবিধি' ও 'দত্তকবিবেক' প্রভৃতি নানা নামে দেখা যায়, কিন্তু, উহার কোন পুথি পাওয়া যায় না। উক্ত 'দত্তকশিরোমণি'তে ব্যবহৃত 'দত্তকনির্ণয়ে'র গ্রন্থকার অজ্ঞাত। বাংলাদেশের সমাজে ও বিচারালয়ে দত্তকপুত্র বিষয়ে 'দত্তকচন্দ্রিকা'কেই দীর্ঘকাল যাবৎ প্রামাণ্য গ্রন্থ স্বরূপ স্বীকার করা হইতেছে। সুতরাং, বর্তমান প্রসঙ্গে এই গ্রন্থই আলোচ্য।

১ দ্রঃ—প্রা. প্র., Introduction, পৃঃ ২-৩।

২ স্বর্গত প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহোদয়ের অভিপ্রায় অনুসারে সংকলিত, কলিকাতা, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ।

'দত্তকচন্দ্রিকা' ভারতের নানা স্থানেই মুদ্রিত হইয়াছে[১] এবং Sutherland কর্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে[২]। বর্তমান প্রসঙ্গে আনন্দাশ্রম সংস্করণটিকে অবলম্বন করা হইল।

গ্রন্থটির রচনাপদ্ধতি অন্যান্য স্মৃতিনিবন্ধেরই ন্যায়। ইহা ছয়টি প্রকরণে লিখিত। ইহাতে নিম্নলিখিত গ্রন্থকারগণের নামোল্লেখ আছে:—

অত্রি, কাত্যায়ন, কার্ষ্ণাজিনি, জাতূকর্ণি দেবল, নারদ, পৈঠীনসি, পরাশর, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু, বৃদ্ধযাজ্ঞবল্ক্য, বৃদ্ধগৌতম, বৃহস্পতি, বৃহৎপরাশর, বৌধায়ন, মনু, মরীচি, যাজ্ঞবল্ক্য, যম, শাকল, শৌনক, হারীত। 'ব্রহ্মপুরাণ' ও 'সাংখ্যায়নসূত্র' এই দুইটি মাত্র গ্রন্থের উল্লেখ দত্তকচন্দ্রিকা'য় আছে।

রামেশ্বর শুক্ল ও শঙ্কর শাস্ত্রী ইহার দুইটি টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

'দত্তকচন্দ্রিকা'র সমাপ্তিসূচক বাক্যে গ্রন্থকারের নাম দেওয়া হইয়াছে মহামহোপাধ্যায় কুবের। কিন্তু, কেহ কেহ কুবেরের গ্রন্থকর্তৃত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা গ্রন্থটিকে অর্বাচীন কোন লেখকের রচনা বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বলেন যে, নদীয়ার রাজগুরু রঘুমণি বিদ্যাভূষণ প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থের প্রণেতা। Colebrooke-এর 'দায়ভাগ' ও 'মিতাক্ষরা'র ইংরাজী অনুবাদকার্যে যে কয়জন পণ্ডিত সহায়তা করিয়াছিলেন, এই রঘুমণি নাকি তাঁহাদের অন্যতম। বাংলাদেশে প্রচলিত কিম্বদন্তী এই যে, কোন এক রাজ্যে কোন দত্তকপুত্রের দাবী সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে রঘুমণি 'দত্তকচন্দ্রিকা' প্রণয়ন করিয়া ইহা

১ যথা— (১) কলিকাতা, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ,
(২) বরোদা, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ (মারাঠী অনুবাদ সহ),
(৩) আনন্দাশ্রম সংস্করণ, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ।

২ কলিকাতা, ১৮৩৪।

কুবের পণ্ডিতের নামাঙ্কিত করিয়াছিলেন[১]। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় এই যে, 'দত্তকচন্দ্রিকা'র অন্তিম শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তির আদ্য ও অন্ত্য বর্ণগুলি একত্র করিলে 'রঘুমণি' নামটি পাওয়া যায়।

উল্লিখিত কিম্বদন্তীটি নির্বিচারে বিশ্বাস্য নহে। গোলাপ সরকার মহাশয় ইহা বিশ্বাস করিয়াছেন বটে; কিন্তু একস্থানে তিনিই বলিয়াছিলেন যে, নন্দপণ্ডিতের বিস্তৃততর গ্রন্থ 'দত্তকমীমাংসা' 'দত্তকচন্দ্রিকা' অবলম্বনে রচিত। কিন্তু, রঘুমণি নন্দপণ্ডিতের বহুকাল পরবর্তী[২]। 'দত্তকচন্দ্রিকা'র অন্তিম শ্লোকে যে রঘুমণির নাম পাওয়া যায়, তাহা একটি আকস্মিক ব্যাপার হইতে পারে; অথবা, পরবর্তী কালে কোন বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিত কর্তৃক শ্লোকটি সন্নিবিষ্টও হইতে পারে। খ্যাতনামা বিচারপতি স্বর্গত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কিম্বদন্তী বিশ্বাস করেন নাই[৩]।

'দত্তকচন্দ্রিকা'র ইংরাজী অনুবাদে Sutherland ইহাকে দক্ষিণ ভারতের নিবন্ধকার দেবণভট্টের রচনা বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রারম্ভিক দ্বিতীয় শ্লোকে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, তিনি 'স্মৃতিচন্দ্রিকা' নামক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। দেবণভট্টের 'স্মৃতিচন্দ্রিকা' নামক একটি প্রামাণ্য নিবন্ধ আছে বটে, কিন্তু, 'দত্তক-চন্দ্রিকা'র রচয়িতাও যে এই নামে স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ রচনা করেন নাই তাহা দৃঢ়ভাবে বলা যায় না। সুতরাং, Sutherland-এর মত নিঃসংশয়ে গ্রাহ্য নহে।

১ দ্রষ্টব্য—(ক) শ্যামাচরণ সরকার—ব্যবস্থাচন্দ্রিকা, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ২১,
(খ) গোলাপ সরকার—Tagore Law Lectures on Adoption, 1916, পৃঃ ১২২-১২৬,
(গ) ঐ —Hindu Law, পৃঃ ৩১।
রঘুমণির ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য দীনেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ২৪ হইতে।

২ দ্রষ্টব্য—Mayne : Hindu Law and Usage, 1938, পৃঃ ৫৬, পাদটীকা (d)।

৩ দ্রষ্টব্য— Bhagwan Vs. Bhagwan—I L R, 17A, 313।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণীয়। উক্ত গোলাপ শাস্ত্রী মহাশয় 'দত্তকচন্দ্রিকা'র অর্বাচীনত্ব বিচার করিতে গিয়া বলিয়াছেন[১] যে, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বিশাল স্মৃতিসংকলনে কোথাও এই গ্রন্থের উল্লেখ নাই; ইহা হইতে মনে হয়, 'দত্তকচন্দ্রিকা' কুবেরের রচনা নহে, ইহা সম্ভবতঃ অর্বাচীন কোন লেখকের রচিত।

যদি কুবেরই 'দত্তকচন্দ্রিকা'র রচয়িতা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থের উৎপত্তি কোথায় হইয়াছিল? এই প্রশ্নের উত্তর সহজ নহে। গ্রন্থের উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে আভ্যন্তরীণ কোন প্রমাণ নাই। এই সম্বন্ধে অনুরূপ প্রমাণ বিবেচ্য। কুবেরের নামের উল্লেখ বাংলাদেশ ব্যতীত অপর কোনও স্থানের স্মৃতিনিবন্ধে পাওয়া যায় না[২]। ইহা হইতে মনে করা স্বাভাবিক যে, কুবের বাংলাদেশেরই লেখক ছিলেন; অবশ্য, এই যুক্তি অখণ্ডনীয় নহে।

উক্ত কুবেরের জীবনকাল নিশ্চিতভাবে নিরূপণ করা যায় না। 'দত্তকচন্দ্রিকা'য় শুধু প্রাচীন স্মৃতিকারগণের উল্লেখ আছে; যাঁহাদের কাল নির্ণীত হইয়াছে, এমন কোন পরবর্তী নিবন্ধকারের নামোল্লেখ ইহাতে নাই। যেহেতু রঘুনন্দনের গ্রন্থে কুবেরের উল্লেখ আছে, সেই জন্য কুবেরের জীবনকালের নিম্নতর সীমারেখা খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের পরে হইতে পারেনা, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

'দত্তকচন্দ্রিকা'র প্রামাণিকত্ব সম্বন্ধে Macnaghten-এর নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি[৩] প্রণিধানযোগ্য :—

"In questions relating to the law of Adoption, the Dattaka-mimāmsā and the Dattaka-chandrikā are equally respected all over India; and where they differ, the

১ Hindu Law, পৃঃ ১২৮।

২ কুবেরের উল্লেখ আছে রঘুনন্দনের 'স্মৃতিতত্ত্বে' (১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৮; ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৮) এবং গোবিন্দানন্দের 'শুদ্ধিকৌমুদী'তে (পৃঃ ৩৩)।

৩ দ্রষ্টব্য—গোলাপ সরকারের Hindu Law, Preface, xvii এবং পৃঃ ৭৪।

doctrine of the latter is adhered to in Bengal and by the Southern jurists while the former is held to be the infallible guide in the provinces of Mithila and Benares"

'দত্তকচন্দ্রিকা'র বিষয়বস্তুর সম্যক্ আলোচনা এখানে সম্ভবপর নহে। সুতরাং, ইহাতে আলোচিত প্রধান দুই একটি কথা বলিয়া বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। ইহাতে 'দত্তক' ও 'দ্ব্যামুষ্যায়ণ' এই দ্বিবিধ দত্তকপুত্র স্বীকৃত হইয়াছে। সেই পুত্রের নাম দত্তক যে মাতা বা পিতা কর্তৃক অপুত্রক ব্যক্তির নিকট অর্পিত হয়। শেষোক্ত প্রকার দত্তকপুত্রের দানের সময়ে সর্ত করা হয় যে, সে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের পুত্ররূপে গণ্য হইবে।

দত্তকগ্রহণের দুইটি উদ্দেশ্য এই গ্রন্থে স্বীকৃত হইয়াছে, যথা:—

(১) পিণ্ডোদকক্রিয়া— জলপিণ্ডদান,

(২) নামসংকীর্তন— গ্রহীতার নাম রক্ষা করা।

এই গ্রন্থকারের মতে, অপুত্রক ব্যক্তি মাত্রেই দত্তকগ্রহণে সমর্থ। 'অপুত্রক' শব্দের অর্থ যাহার পুত্র জন্মে নাই বা জন্মিয়া পরলোকগত হইয়াছে। এখানে 'পুত্র' শব্দে পৌত্র এবং প্রপৌত্রকেও বুঝায়[১]।

কোন ব্যক্তি সগোত্র কিম্বা অসগোত্র সপিণ্ডকে দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন। সপিণ্ড না থাকিলে সগোত্র অসপিণ্ডকে দত্তকরূপে গ্রহণ করা যায়। শূদ্র ভিন্ন অন্য বর্ণের পক্ষে দৌহিত্র ও ভাগিনেয় দত্তকগ্রহণে নিষিদ্ধ।

একমাত্র পুত্রকে দত্তক দেওয়া যায় না। বহু পুত্র থাকিলে এক পুত্রকে দত্তক দেওয়া যায়। 'বহু' শব্দের অর্থ, এই গ্রন্থের মতে, দুইয়ের অধিক, কারণ, দুইটির মধ্যে একটিকে দান করিলে অপরটির জীবননাশে দাতার 'বংশোচ্ছেদ' হইবে। স্বামী বর্তমান থাকিলে স্ত্রী তাঁহার বিনা অনুমতিতে পুত্রকে দত্তক দিতে পারেন না। স্বামী মৃত হইলে এইরূপ অনুমতি অনাবশ্যক। নিষেধের অভাবই একস্থলে অনুমতি বলিয়া গণ্য হইবে।

১ পুত্রপদং পৌত্রপ্রপৌত্রয়োরপ্যুপলক্ষণম্'—দত্তকচন্দ্রিকা পৃঃ ৩।

দত্তকপুত্র যে পরিবারে জন্মিয়াছে, সেই পরিবারের সহিত তাহার কোন অশৌচ-সম্বন্ধ নাই, কারণ, ঐ পরিবারের সহিত তাহার গোত্র-ও পিণ্ড-সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে। যে পরিবারে দত্তকপুত্র গৃহীত হইয়াছে, সেখানে তাহাব মাত্র তিনদিন ব্যাপী অশৌচ হইবে।

দত্তকগ্রহণের সময়ে গ্রহীতার আচার্য, জ্ঞাতি, বান্ধব, দ্বিজ ও রাজাব উপস্থিতি আবশ্যক। রাজা উপস্থিত থাকিতে না পাবিলে গ্রামের প্রধান ব্যক্তি থাকিবেন। জ্ঞাতি ও বান্ধব প্রভৃতি উপস্থিত না থাকিলে দত্তকগ্রহণ আইনতঃ সিদ্ধ হয় না।[১] দত্তকগ্রহণকালে শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন না করিলে দত্তকগ্রহণ সিদ্ধ হয় না, চন্দ্রিকাকার ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন।

দত্তকগ্রহণের পূর্বে বালকের যে সমস্ত সংস্কার নিষ্পন্ন হইয়াছিল, দত্তকগ্রহীতা উহাদের পুনরাবৃত্তি করিবেন না। বালকের যে সংস্কারসমূহ নিষ্পন্ন হয় নাই, গ্রহীতা শুধু সেগুলিই করিবেন—'দত্তকচন্দ্রিকা'র এই মত।

১ এই সম্বন্ধে 'দত্তকচন্দ্রিকা'ব টীকাকাব শঙ্কব বলিযাছেন—দৃষ্টপ্রযোজনার্থং তেভ্যো বিনা ব্যবহার-সৌকর্যং ন স্যাৎ।

গুণবিষ্ণু[১]

গুণবিষ্ণু বাঙ্গালী বা মৈথিলী যাহাই হইয়া থাকুন না কেন, বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যাতা স্বরূপে তাঁহার যশ বাংলাদেশের পণ্ডিতসমাজে বিস্তৃত। এককালে যে তাঁহার জনপ্রিয়তা অতিশয় ব্যাপক ছিল, তাহার সাক্ষী বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য স্বয়ং। গুণবিষ্ণুর 'ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যে'র[২] সহিত সায়ণের পরিচয়, শুধু পরিচয় নয়, গুণবিষ্ণুর নিকট তাঁহার ঋণও অবিসংবাদিত। উক্ত গ্রন্থটিতে গুণবিষ্ণু সামবেদীয় ব্রাহ্মণগণের গৃহ্যোক্ত ক্রিয়াকাণ্ডে প্রযুক্ত বৈদিকমন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ ছাড়াও তিনি 'মন্ত্রব্রাহ্মণভাষ্য' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ইহা সামবেদের 'মন্ত্রব্রাহ্মণে'র একখানি ব্যাখ্যাগ্রন্থ। 'পারস্করগৃহ্যভাষ্য' নামে একটি গ্রন্থও গুণবিষ্ণু-রচিত বলিয়া মনে হয়।

পরবর্তীকালে যে সকল গ্রন্থকার গুণবিষ্ণুর উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে হলায়ুধ প্রাচীনতম। হলায়ুধ বঙ্গের রাজা লক্ষ্মণসেনের সমকালীন, অতএব তাঁহার কাল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষার্ধ। সুতরাং, গুণবিষ্ণু উক্ত কালসীমার পরবর্তী লেখক হইতে পারেন না।

১ ইঁহার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য —(১) 'ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যে'র দুর্গামোহন ভট্টাচার্য-কৃত সংস্করণ, (২) উক্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রবন্ধ Little known Vedic Commentators of Bengal, Our Heritage II, (৩) হি বে, ১, পৃঃ ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৭, (৪) হরপ্রসাদ-সংবর্ধন লেখমালা, পৃঃ ২২৩।

২ উক্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের সংস্করণ ছাড়াও নিম্নলিখিত সংস্করণ আছে :—সং পরমেশ্বর শর্মা, দারভাঙ্গা, ১৮২৮ শকাব্দ।

কুল্লূকভট্ট[১]

ইঁহার জন্মকাল নিশ্চিতরূপে নিরূপিত না হইলেও, ইনি যে বাঙালী ছিলেন তাহা ইনি 'মনুস্মৃতির' 'মন্বর্থমুক্তাবলী' নামক টীকার প্রারম্ভে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

গৌড়ে নন্দনবাসিনাম্নি সুজনৈর্বন্দ্যে বরেন্দ্র্যাং কুলে
শ্রীমদ্ভট্টদিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লূকভট্টোঽভবৎ।
কাশ্যামুত্তরবাহিজহ্নুতনয়াতীরে সমং পণ্ডিতৈ
স্তেনেয়ং ক্রিয়তে হিতায় বিদুষাং মন্বর্থমুক্তাবলী॥

গৌড়ে নন্দনবাসী বারেন্দ্রকুলে তাঁহার জন্ম হয়; তাঁহার পিতা ছিলেন দিবাকরভট্ট এবং তিনি কাশীতে অন্যান্য পণ্ডিতগণের সহযোগিতায় 'মন্বর্থমুক্তাবলী' নামক টীকাখানি রচনা করিয়াছিলেন।

কুল্লূকের টীকার প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রাঞ্জলতা। 'মনুস্মৃতি'র প্রচলিত টীকা-সমূহের মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত। কুল্লূক স্থানে স্থানে মেধাতিথি, গোবিন্দরাজ প্রভৃতি প্রাচীনতর টীকাকারগণের নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের মত সমালোচনা করিয়াছেন। কোন কোন স্থানে আবাব উঁহাদের টীকা হইতে কতক অংশ বিনা স্বীকৃতিতে গ্রহণও করিয়াছেন।

কুল্লূকভট্টের জীবনকাল পণ্ডিতগণের বিতর্কের বিষয়। তবে, তিনি যে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের পরবর্তী নহেন, এ বিষয়ে মতভেদ নাই। মহা-মহোপাধ্যায় কানের মতে, কুল্লূকের কালের নিম্নতর সীমারেখা ১১০০ খ্রীষ্টাব্দ।

১ বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য হি ধ, ১, পৃঃ ৩৫৯-৩৬৩। কানে মহাশয় মনে করেন যে, কুল্লূক 'স্মৃতিসাগর' নামক নিবন্ধের রচয়িতা। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধমতের জন্য দ্রষ্টব্য ই. হি. কো., জুন-সেপ্টেম্বর, ১৯৬০, পৃঃ ১৫০।

বিবাদার্ণবসেতু

যে কারণে 'বিবাদভঙ্গার্ণব' নামক গ্রন্থখানি জগন্নাথ-কর্তৃক রচিত হইয়াছিল, সেই কারণে 'বিবাদার্ণবসেতু'ও সঙ্কলিত হইয়াছিল। শেষোক্ত গ্রন্থ কোন একজনের রচনা নহে। ব্রিটিশ বিচারকগণকর্তৃক হিন্দু আইন সংক্রান্ত বিবাদে মীমাংসার সুবিধার জন্য বঙ্গদেশের তদানীন্তন গভর্ণর ওয়ারেন হেস্টিংস এই দেশের অন্যতম বিখ্যাত পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার[১]কে একটি গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে বলেন। বাণেশ্বর অপর দশজন পণ্ডিতের সহযোগিতায় 'বিবাদার্ণবসেতু' নামক গ্রন্থখানি প্রস্তুত করেন। 'ঊর্মি' নামক একুশটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থটি বিভক্ত, মোট শ্লোকসংখ্যা ১৬৩২। ঋণদানাদি বিবাদপদ ও উহাদের বিচারপদ্ধতি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

'বিবাদার্ণবসেতু' প্রথমে ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়, ফার্সী হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন হ্যাল্‌হেড্‌ সাহেব। ইংরাজী অনুবাদটির নাম A Code of Gentoo Laws, ইহা ইংলণ্ডে প্রথম মুদ্রিত হয় ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে।

এই গ্রন্থের একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেস্‌ হইতে। এই সংস্করণে দেখা যায় যে, গ্রন্থটি লাহোরের রঞ্জিত সিংহের সভায় প্রস্তুত হইয়াছিল।

বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যে সকল নিবন্ধকার ও নিবন্ধের উল্লেখ করা হইয়াছে, তদতিরিক্ত বাঙ্গালী নিবন্ধকার ও তদ্রচিত গ্রন্থ-সমূহের পরিচয় নিম্নে লিখিত হইল।

১ হুগ্‌লী জিলার গুপ্তপল্লী বা গুপ্তিপাড়ার বিখ্যাত শোভাকরের বংশধর। বাণেশ্বরের জন্ম হইয়াছিল সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে। ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'চিত্র-চ' সুপরিচিত।

[গ্রন্থকারগণের নাম বর্ণানুক্রমিক]

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	পুথি বা প্রকাশিত গ্রন্থ	মন্তব্য
ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা।	ব্যবস্থাসেতু	Mitra : Notices, VII. 2350	স্মার্ত ক্রিয়া ও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে রচিত।
কালীকান্ত বিদ্যালঙ্কার	তত্ত্বাবশিষ্ট বা অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বাবশিষ্ট		গ্রন্থকার ছিলেন ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত নেত্রকোণা মহকুমাধীন মাঘান গ্রাম-নিবাসী। ইঁহার জন্ম হয় ১৭৩৩ শকাব্দে (১৮১১ইং)। 'তত্ত্বাবশিষ্ট' নামক গ্রন্থে ইনি রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বে' লিখিত মত অনেক স্থলে ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কালীকান্তের গ্রন্থের শুধু 'আহ্নিকাচারতত্ত্বাবশিষ্ট' অংশ কোচবিহারের রাজার আনুকূল্যে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থকার ও গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য 'সৌরভ' পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৬৫-৭২।

কাশীনাথ বিদ্যানিবাস	দ্বাদশযাত্রা-পদ্ধতি	Mitra : Notices, No. 413 ('দোলারোহণ-পদ্ধতি' নামে বর্ণিত)	
,,	সচ্চরিতমীমাংসা	বরোদার প্রাচ্য-মন্দিরে সংরক্ষিত।	
কৃষ্ণদেব স্মার্তবাগীশ	কৃত্যতত্ত্ব বা প্রয়োগসার	Mitra : Notices, IX 3132	প্রতি মাসে বিহিত উপবাস ও অনুষ্ঠা-নাদি সম্বন্ধে রচিত।
	শুদ্ধিসার	ঐ, IX. 3133	
	প্রায়শ্চিত্ত-কৌমুদী	ঐ, IX. 3134	
গদাধর ভট্টা-চার্য চক্রবর্তী	ঋগ্বেদোক্তদশকর্ম-পদ্ধতি	দ্রঃ বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ১৮০।	
চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য	ব্যবস্থাকল্পদ্রুম	প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮৮৬।	
জয়কৃষ্ণ তর্কবাগীশ	শ্রাদ্ধদর্পণ	Mitra : Notices, IV. 1653	
জানকীরাম সার্বভৌম	সংস্মৃতিসার	Sastri : Notices, II. 236	
নারায়ণ চক্রবর্তী	শান্তিতত্ত্বামৃত বা শান্তিকতত্ত্বামৃত	Mitra : Notices, II. 536, VII. 2477	অদ্ভুত ও প্রতিকূল গ্রহাদির শান্তি-প্রক্রিয়া ইহার বিষয়বস্তু।

পদ্মনাভ মিশ্র	দুর্গাবতীপ্রকাশ	এ. সো. পুথিসংখ্যা III. F. 240 ইণ্ডিয়া অফিসে এবং বিকানীরেও এই গ্রন্থের প্রতিলিপি আছে।	৭ খণ্ডে রচিত। রাণী দুর্গাবতীর আদেশ লিখিত।
পশুপতি (লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী)	প্রাবরাধ্যায়	Mitra : Notices,	
প্রাদ্যোতন ভট্টাচার্য	প্রায়শ্চিত্তপ্রকাশ	Mitra : Notices VI. 2121	
বামদেব ভট্টাচার্য	স্মৃতিচন্দ্রিকা	Mitra : Notices, IX. 3039	
মথুরানাথ তর্কবাগীশ	পাণিগ্রহণাদি-বিবেক	Mitra : Notices, No. 3164	
যাদব বিদ্যা-ভূষণ ভট্টাচার্য	স্মৃতিসার	Mitra : Notices, IV. 1642	
রঘুনাথ শিরোমণি	মলিম্লুচবিবেক	দ্রঃ বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ৮৬	একটিমাত্র প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থে হেমাদ্রি ও মাধবাচার্যের পরবর্তী কোন নিবন্ধকারের উল্লেখ নাই। রঘুনন্দন অনেক স্থলে এই গ্রন্থহইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন।

রমাকান্ত - চক্রবর্তী	স্মৃতিসংক্ষেপসার	Sastri : Notices, II. 258	
রমানাথ বিদ্যাবাচস্পতি	প্রয়োগদর্পণ	Mitra : Notices, VIII. 2773	গৃহস্থের দৈনন্দিন ধর্মানুষ্ঠানবিষয়ক।
রাঘবেন্দ্র শতাবধান ভট্টাচার্য	রামপ্রকাশ	দ্রঃ—ব. সা. প. পত্রিকা, ১৩৩৭, পৃঃ ১৩৫	ধর্মকার্যের কালনির্ণয়-বিষয়ক।
রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	তুলসীচন্দ্রিকা	Mitra : Notices, II. 546	বিষয়বস্তু — তুলসী, বিল্বপত্র, আমলকী প্রভৃতির উৎপত্তি ও ব্যবহার, বৈধহিংসা-বিচার, বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য।
তর্কবাগীশ	অশৌচচন্দ্রিকা	Mitra : Notices, IX. 3161	
রাধাবল্লভ কবিবাগীশ	স্মৃতিকল্পদ্রুম	Sastri : Notices, II. 256	
রামচন্দ্র সার্বভৌম	সময়রহস্য	দ্রঃ বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ১২৫।	

রামানন্দ বাচস্পতি	আহ্নিকাচাররাজ	Cat. Cat. I. P. 520	নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে লিখিত।
শম্ভুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ	অকালভাস্কর	Mitra : Notices, VII. 2269	১৬৬৯ শকাব্দে সম্পূর্ণ। মলমাস ও মলমাসে কৃত্যাকৃত্য সম্বন্ধে আলোচনা।
	দিনভাস্কর	ঐ, VII. 2270	শুভাশুভ দিনবিচার।
	দুর্গোৎসবকৃত্য-কৌমুদী	ঐ, VII. 2271	
	বর্ষভাস্কর	ঐ, VII. 2274	ইহাতে লিখিত আছে যে, গ্রন্থকার ছিলেন কোচ-বিহার-নিবাসী এবং তিনি রাজা ধর্মদেবদেবের আদেশে ইহা রচনা করিয়াছিলেন।
	দেবীপূজনভাস্কর	ঐ, VII. 2275	
শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার	শুদ্ধিস্মৃতি	ঐ, VII. 2344	অশৌচ-সংক্রান্ত।
সূর্যসেন	নির্ণয়ামৃত	ঐ, I. 279	

হরিদাস তর্কাচার্য	শ্রাদ্ধনির্ণয়	বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ৪৯	
	অশৌচনিবন্ধ	,,	
হরিহর ভট্টাচার্য (রঘুনন্দনের পিতা ?)	সময়প্রদীপ	Mitra : Notices, III. 1088	বিবিধ ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠানোপযোগী কালনির্ণয়।

উক্ত গ্রন্থাবলী ছাড়াও 'কৃত্যরাজ' নামক একখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়[১]। বিবিধ ধর্মানুষ্ঠানে পালনীয় বিধি ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে কতিপয় পণ্ডিত এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

১ Mitra : Notices, I. 376

শব্দকোষ

বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধসমূহে যে সকল পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান শব্দগুলির অর্থ সংক্ষেপে লিখিত হইল :—

অগ্রেদিধিষু— জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর বিবাহের পূর্বে যে কন্যার বিবাহ হয়।

অতিদিষ্ট— অতিদেশ —'Extended application, substitution' (Monier Williams).

এই ন্যায়ের দ্বারা এক স্থানে প্রযোজ্য কোন বিষয় অপর স্থলে প্রযুক্ত হইতে পারে, যেমন, গোত্র ব্রাহ্মণবর্ণে প্রযোজ্য হইলেও অতিদেশের দ্বারা ক্ষত্রিয়াদি বর্ণে প্রযুক্ত হয়। নিজের গর্ভজাত সন্তানে 'পুত্র'পদ প্রযোজ্য হইলেও সপত্নীগর্ভজাত সন্তানের পুত্রত্ব অতিদিষ্ট।

অদ্ভুত— 'অদ্ভুতসাগরে' (বারাণসী সং, পৃঃ ৪) শাস্ত্রীয় প্রমাণবলে গ্রন্থকার এই শব্দের দ্বিবিধ অর্থ বলিয়াছেন; যথা—

(১) যে ঘটনা প্রথম ঘটিল,

(২) যাহা পূর্বে থাকিলেও বর্তমানে রূপান্তরিত হইয়াছে।

শুভ- ও অশুভ-সূচক ভেদে অদ্ভুত দ্বিবিধ।

('উৎপাত' দ্রষ্টব্য)

অনুলোম— ব্রাহ্মণাদিবর্ণের ক্রমকে এই নামে অভিহিত করা হয়। সাধারণতঃ উচ্চবর্ণের পুরুষের সহিত নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের বিবাহকে অনুলোম বিবাহ বলা হয় ('প্রতিলোম' দ্রষ্টব্য)।

অপপাত্রিত (বা, অপপাত্র)—আক্ষরিক অর্থে ইহা সেইরূপ লোককে বুঝায় যে অপর বর্ণের ভোজনপাত্র ব্যবহারের অযোগ্য। 'আপস্তম্বধর্ম-সূত্রে'র (১.৭.২১.৬) ব্যাখ্যায় হরদত্ত ইহার অর্থ করিয়াছেন

'চণ্ডালাদি'। আবার ইনিই ঐ গ্রন্থের অপর এক সূত্রের (১.১.৩.২৫) ব্যাখ্যায় এই শব্দের অর্থ বলিয়াছেন 'প্রতিলোমরজকাদি'। পাতিত্যহেতু জ্ঞাতিগণের দ্বারা বহিষ্কৃত—এইরূপ অর্থও কোন কোন স্থলে দেখা যায়।

আগম— স্বত্ব বা স্বত্বোৎপত্তির কারণ। জীমূতবাহন বলিয়াছেন ('ব্যবহারমাতৃকা') —আ সম্যক্ গম্যতে প্রাপ্যতে স্বীক্রীয়তে যেন স আগমঃ ক্রয়াদিঃ, অর্থাৎ, ক্রয় প্রভৃতি স্বত্বলাভের উপায়। সাধারণতঃ, উত্তরাধিকার, ক্রয়, বিভাগ প্রভৃতিকে আগম বলা হয়। কাহারও ভোগাধীন সম্পত্তিতে উক্ত প্রকার আগম থাকিলে তাহার ভোগকে বলা হয় 'সাগম'। আগমহীন ভোগকে 'অনাগম' আখ্যা দেওয়া হয়। অষ্টপ্রকার বিবাহের অন্যতম প্রকার। এই বিবাহে কন্যার পিতা বরপক্ষ হইতে, রীতিরক্ষার্থে (কন্যাশুল্কস্বরূপ নহে), একটি বা দুইটি গাভী ও একটি কি দুইটি বৃষ গ্রহণ করিয়া কন্যাকে সম্প্রদান করেন।

আসুর— একপ্রকার বিবাহ। ইহাতে কন্যার পিতা কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয়ের জন্য বরের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয় কন্যাসম্প্রদান করেন।

উৎপাত— অশুভসূচক অদ্ভুতের নাম উৎপাত ('অদ্ভুতসাগর', পৃঃ ৪)। 'প্রকৃতেরন্যথা উৎপাত':—প্রকৃতির কোনরূপ বিকারের নামই উৎপাত। দ্যৌ, অন্তরিক্ষ ও ভূ—এই ত্রিবিধ আশ্রয়ভেদে উৎপাত ত্রিবিধ; যথা—দিব্য, নাভস ও ভূমিজ। (অদ্ভুত দ্রষ্টব্য)

উত্তরাভাস— বিচারালয়ে বিবাদীর উত্তর দোষযুক্ত হইলে উহাকে বলা হয় উত্তরাভাস; ইহা অগ্রাহ্য।

উপকুর্বাণ— যে ব্রহ্মচারী কৃতজ্ঞতাবশতঃ আচার্যকে কিছু দান করে

কন্যাশুল্ক— যে দ্রব্য বা ধনাদি গ্রহণ করিয়া কন্যাকে বিবাহে সম্প্রদান করা হয়।

ক্ষেত্রজ— একজনের স্ত্রীর গর্ভে অপর ব্যক্তি কর্তৃক উৎপাদিত পুত্র

গান্ধর্ব — এক প্রকার বিবাহ। বর ও কন্যার পরস্পরের ইচ্ছাক্রমে, নিজ নিজ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে, ইহা অনুষ্ঠিত হয়।

গোত্র— বংশপরম্পরায় প্রসিদ্ধ আদিপুরুষ যে ব্রাহ্মণ তাঁহাকেই এই নামে অভিহিত করা হয়।

তন্ত্রতা— 'অনেকমুদ্দিশ্য সকৃৎপ্রবৃত্তিস্তন্ত্রতা' ('প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব', পৃঃ ৯)। ইহা একটি ন্যায়। ইহার অর্থ, একরূপ অনেক ব্যাপারের উদ্দেশ্যে কোনও কার্যের একবার মাত্র অনুষ্ঠান; যেমন, উপর্যুপরি দুইবার ব্রহ্মহত্যা করিয়া ব্রহ্মহত্যার পাপক্ষালনের জন্য একবার প্রায়শ্চিত্তই যথেষ্ট।

দায়— Inheritance. উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধনসম্পত্তি।

দিধিষু— যে কন্যার বিবাহের পূর্বে তাহার কনিষ্ঠা ভগ্নীর বিবাহ হইয়াছে। ('অগ্রেদিধিষু' দ্রষ্টব্য)

দিব্য— বিচারালয়ে দ্বিবিধ প্রমাণ গ্রাহ্য। লিখিত, ভুক্তি ও সাক্ষী—সাধারণতঃ এই তিনটি মানুষপ্রমাণ এবং ধট (= তুলা), অগ্নি প্রভৃতি দিব্যপ্রমাণ বলিয়া অভিহিত হয় মানুষ-প্রমাণের অভাবে দিব্যপ্রমাণ গ্রাহ্য। রঘুনন্দনের মতে, দিব্য নিম্নলিখিতরূপ:—

(১) ধট, (২) অগ্নি, (৩) উদক, (৪) বিষ, (৫) কোষ, (৬) তণ্ডুল, (৭) তপ্তমাষ, (৮) ফাল, (৯) ধর্ম। ইহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে চতুর্থ পরিচ্ছেদে দিব্য-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

দৈব— এক প্রকার বিবাহের নাম। ইহাতে, অলঙ্কারাদিভূষিতা কন্যাকে পিতা ঋত্বিকের হস্তে সমর্পণ করেন। কাহারও কাহারও মতে, ঋত্বিকের দক্ষিণাস্বরূপ কন্যাকে দান করা হয়।

নান্দীমুখ— ইহাকে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধও বলা হয়। উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি সংস্কারের পূর্বে ইহা অনুষ্ঠেয়।

পক্ষাভাস— বিচারালয়ে বাদীর অভিযোগকে বলা হয় পক্ষ (plaint)। দোষযুক্ত পক্ষের নাম পক্ষাভাস।

পরিবেত্তা— জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিবাহের পূর্বে যে বিবাহ করে।

পরিবিন্ন— যে জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিবাহের পূর্বে কনিষ্ঠভ্রাতা বিবাহ করিয়াছে সেই জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম।

পুত্রিকাপুত্র— পুত্রিকার বা কন্যার পুত্র অথবা যে পুত্রিকা বা কন্যা স্বয়ং পুত্ররূপে মনোনীতা। অপুত্রক ব্যক্তি এইরূপ সঙ্কল্প করিতে পারে—আমার এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র হইবে সে মদীয় পুত্র বলিয়া গণ্য হইবে; এইরূপ কন্যার পুত্র পুত্রিকাপুত্র। আবার, অপুত্রক ব্যক্তি এইরূপ সঙ্কল্পও করিতে পারে—আমার এই কন্যাই পুত্রবৎ পরিগণিতা হইবে; এইরূপ কন্যাকেও পুত্রিকাপুত্র বলা হয়।

পৈশাচ— এক প্রকার বিবাহ, ইহা নিকৃষ্টতম। ইহাতে নিদ্রিতা বা উন্মত্তা কন্যাকে সম্ভোগ করিয়া পরে তাহাকে বিবাহ করা হয়।

প্রতিলোম— ব্রাহ্মণাদিবর্ণের ক্রমবিপর্যয়। নিম্নবর্ণের পুরুষের সহিত উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোকের বিবাহকে প্রতিলোম বিবাহ বলা হয়।

প্রসঙ্গ— 'অন্যোদ্দেশ্যেন প্রবৃত্তাবন্যস্যাপি সিদ্ধিঃ প্রসঙ্গঃ ('প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব', পৃঃ ২৭)। এই ন্যায়ানুসারে, এক উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কার্যদ্বারা অন্য উদ্দেশ্যও সাধিত হয়, যেমন, ব্রহ্মহত্যাজনিত গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্তদ্বারা ক্ষত্রিয়বধজনিত লঘুতর পাপও ক্ষালিত হয়।

প্রাঙ্ন্যায় বা পূর্বন্যায়—বিচারালয়ে বিবাদীর একপ্রকার উত্তরের নাম। ইহাতে বিবাদী প্রমাণ করে যে, বর্তমান বিবাদের বিষয়ের বিচার পূর্বেই হইয়াছে। ভারতীয় বিচারালয়সমূহে অধুনা-প্রচলিত Civil Procedure Codeএর *Res Judicata* (Sec. II) ইহার অনুরূপ।

প্রাজাপত্য— এক প্রকার বিবাহ। ইহাতে 'তোমরা একত্র ধর্মাচরণ কর' এইরূপে বরকন্যাকে সম্বোধন করিয়া এবং মধুপর্কাদিদ্বারা বরের অর্চনা করিয়া পিতা কন্যাকে সম্প্রদান করেন।

বান্ধব বা বন্ধু— পিতামহের ভগ্নীপুত্র, পিতামহীর ভগ্নীপুত্র, পিতার মাতুলপুত্র —ইহারা পিতৃবন্ধু। মাতামহীর ভগ্নীপুত্র, মাতামহের ভগ্নী-পুত্র, মাতার মাতুলপুত্র—ইহারা মাতৃবন্ধু। নিজের পিতৃ-ষসার পুত্র, মাতৃষসার পুত্র ও মাতুলপুত্র—ইহারা আত্মবন্ধু।

ব্যবহার— 'ব্যবহারমাতৃকায় (পৃঃ ২৮৩) জীমূতবাহন বলিয়াছেন, যাহা নানা সন্দেহ হরণ করে তাহার নাম ব্যবহার। বিচারের দ্বারাই বিবাদে সন্দিগ্ধ বিষয়ের মীমাংসা হয় বলিয়া বিচারকে ব্যবহার বলা হয়। কোন কোন স্থলে বিচার-পদ্ধতিকেও এই নামে অভিহিত করা হয়।

ব্রাহ্ম— এক প্রকার বিবাহ। ইহাতে পিতা কর্তৃক আহূত এবং বিদ্যা ও শীলসম্পন্ন বরের হস্তে সুসজ্জিতা কন্যাকে সম্প্রদান করা হয়।

ব্রাত্য— উপনয়নের যোগ্য বয়সে যে অনুপনীত থাকে, তাহাকে এই আখ্যায় অভিহিত করা হয়। এইরূপ ব্যক্তিকে পতিতসাবিত্রীকও বলা হয়।

ভাষা— বিচারালয়ে বাদীর অভিযোগপত্রের নাম ; ইহাকে বর্তমানে plaint বলা হয়।

মহাপাতক— স্মৃতিশাস্ত্রে পাপের নানারূপ শ্রেণীবিভাগ আছে। তন্মধ্যে ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণের স্বর্ণহরণ, গুর্বঙ্গনাগমন এবং এই সকল পাপাচরণকারীর সংসর্গ—এই কয়টি পাপ মহাপাতকশ্রেণীভুক্ত।

যৌতক— 'যু ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'যুত' শব্দের অর্থ 'যুক্ত'। পাত্রপাত্রীর যুক্ত হওয়ার সময়ে, অর্থাৎ বিবাহকালে, পাত্রীর উদ্দেশ্যে যাহা দেওয়া হয় তাহারই নাম যৌতুক। পরিণয়কালে প্রদত্ত হয় বলিয়া ইহার অপর নাম পারিণায্য।

রণ্ডাশ্রম— আটচল্লিশ বৎসর বয়সের পরে কোন ব্যক্তি বিপত্নীক হইলে তাহাকে রণ্ডাশ্রমী বলা হয়।

রাক্ষস— এক প্রকার বিবাহ। ইহাতে বর বলপূর্বক কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করে।

সপিণ্ড— চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'বিবাহে সাপিণ্ড্যবিচার' দ্রষ্টব্য

সংসৃষ্ট— সম্পত্তি-বিভাগের পরে বিভক্ত ব্যক্তিগণ পরস্পর মিলিত-ভাবে বাস করিলে তাহাদিগকে বলা হয় সংসৃষ্ট বা সংসৃষ্টী।

সুরা— মদ্যমাত্রকেই সুরা বলা হয়না। নিম্নলিখিত প্রকার মদ্যের নাম সুরা:—

(১) গৌড়ী—গুড় হইতে জাত,

(২) মাধ্বী—মধু হইতে উৎপন্ন,

(৩) পৈষ্টী—অন্নসঞ্জাত।

শেষোক্ত মদ্যেই 'সুরা' পদ মুখ্যতঃ প্রযোজ্য।

স্ত্রীধন— সাধারণ অর্থে, স্ত্রীর ভোগ্য ধনের নাম স্ত্রীধন। ইহা বিশিষ্ট কতক প্রকার ধনকে বুঝায়। কতক স্ত্রীধনে স্ত্রীলোকের যথেচ্ছ ব্যবহারের ক্ষমতা থাকে এবং অপর কতক প্রকারের ব্যবহারে তাহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী

[বর্তমান গ্রন্থ-রচনায় যে সকল গ্রন্থ আলোচনা করা হইয়াছে, উহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান গ্রন্থসমূহের নাম নিম্নে লিখিত হইল। যে সকল গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ আছে, উহাদের প্রধান সংস্করণের নাম দেওয়া গেল। এই প্রসঙ্গে আলোচিত পুথিসমূহের নাম এখানে লিখিত হইলনা; উহাদের নাম গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।]

সংস্কৃত

নব্যস্মৃতি (বঙ্গীয় নিবন্ধকারগণের নাম কালানুক্রমে লিখিত হইল।)

ভবদেব

প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ, বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি হইতে প্রকাশিত, ১৯২৭।

কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি, সং শ্যামাচরণ কবিরত্ন, কলিকাতা, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ।

শবসূতকাশৌচপ্রকরণ, সং রাজেন্দ্র হাজরা, কলিকাতা, ১৯৫৯।

জীমূতবাহন

কালবিবেক, বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯০৫।

ব্যবহারমাতৃকা, সং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়. কলিকাতা।

দায়ভাগ, সং জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কলিকাতা, ১৮৯৩।

অনিরুদ্ধভট্ট

হারলতা, বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯০৯।

পিতৃদয়িতা, সংস্কৃত সাহিত্যপরিষৎ সংস্করণ, কলিকাতা।

বল্লালসেন

দানসাগর, বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৫৩।

অদ্ভুতসাগর, সং মুরলীধর ঝা, বারাণসী, ১৯০৫।

হলায়ুধ

ব্রাহ্মণসর্বস্ব, সং দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, কলিকাতা, ১৯৬০।

শূলপাণি

শ্রাদ্ধবিবেক, সং চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, কলিকাতা, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ।

প্রায়শ্চিত্তবিবেক, সং জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, ১৮৯৩।

সম্বন্ধবিবেক, সং জে. বি. চৌধুরী, কলিকাতা, ১৯৪২।

দীপকলিকা, সং ঘরপুরে।

দুর্গোৎসববিবেক, সংস্কৃত সাহিত্যপরিষৎ, কলিকাতা।

শ্রীনাথ আচার্যচূড়ামণি

বিবাহতত্ত্বার্ণব, সং সুরেশ ব্যানার্জি, এ্যা. ভা. ই. ১৯৫১।

রঘুনন্দন

স্মৃতিতত্ত্ব, ১ম ও ২য় ভাগ, সং জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কলিকাতা

গোবিন্দানন্দ

দানক্রিয়াকৌমুদী, বি. ই. সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯০৩।

শুদ্ধিকৌমুদী, ঐ, ১৯০৫।

শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী, ঐ, ১৯০৪।

বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, ঐ, ১৯০২।

প্রাচীন স্মৃতি

আপস্তম্বধর্মসূত্র, সং বুলার।

মনুস্মৃতি, নির্ণয়সাগর প্রেস্ সংস্করণ, বোম্বাই।

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, ঐ।

বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ

অথর্ববেদ

গোভিলগৃহ্যসূত্র, সং চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, কলিকাতা, ১৯০৮।

ঐ সং সত্যব্রত সামশ্রমী, কলিকাতা।

কালিকাপুরাণ, বেঙ্কটেশ্বর প্রেস্ সংস্করণ, বোম্বাই।
দত্তকচন্দ্রিকা (কুবের), আনন্দাশ্রম সং, ১৯৪২।
দত্তকশিরোমণি, কলিকাতা, ১৮৬৭।
দেবীপুরাণ, বঙ্গবাসী সং, কলিকাতা।
বৃহদ্ধর্মপুরাণ, বি. ই. সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮৮৮-৯৭।
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বঙ্গবাসী সং, কলিকাতা।
মহাভাগবত, বেঙ্কটেশ্বর প্রেস্ সং, বোম্বাই।
হরিবংশ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা।

বাংলা

চণ্ডীমঙ্গল (মুকুন্দরাম)।
চৈতন্যভাগবত (বৃন্দাবন দাস)।
বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, ১ম ভাগ, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।
বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।
মনসামঙ্গল (বিজয় গুপ্ত)।
ঐ (বংশী দাস)।
ময়নামতীর গান।
শূন্যপুরাণ (রামাই পণ্ডিত)।

ইংরাজী

Baneıji, Gnrudas : Marriage and Strīdhana, Calcutta.
Civil Procedure Code (Act V of 1908).
Das Gupta, S. B. : Obscure Religious Cults etc., Calcutta.
De S. K. : Early History of the Vaiṣṇava Faith and Movement etc., Calcutta, 1942.

Des. Catalogue of SKT. MSS.
(Calcutta—Asiatic Society, Sanskrit College,
Vaṅgīya Sāhitya Pariṣat.
London--India Office.

Handiqui, K. K.: Naiṣadha-carita (Eng. tr.).
Hazra, R. C.: Studies in the Puranic Records etc. Dacca.
Hindu Gains of Learning Act, 1930.
History of Bengal, Vol. I., Dacca University.
Indian Law Reporter, 17 A, 313.
Indian Penal Code.
Kane, P. V.: History of Dharmaśāstra, Vols. I—V, Poona.
Karandikar, S. V.: Hindu Exogamy, Bombay, 1929.
Macdonell and Keith: Vedic Index, Vols. I, II.
Max Muller: History of Ancient Sanskrit Literature.

Mayne: Hindu Law and Usage, (10th ed.)
Mulla, D. F.: Principles of Hindu Law.

Notices of SKT. MSS.
—by R. L. Mitra, Calcutta.
by H. P. Śastrī, Calcutta.
Sarkar, Golap: (1) Tagore Law Lectures on Adoption, Calcutta, 1916.
(2) Hindu Law, Calcutta.
Siddha-bhāratī (a collection of articles by different authors), 1950.

Thakur, U.: History of Mithilā.

পত্রিকা

Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, 1935, 1951.

Indian Historical Quarterly, Vols. IX, XXI, XXXII.

Indian Culture, Vol. I, No. 4.

Journal of Oriental Institute, Baroda, Vol. VI, Nos. 2-3.

" " Asiatic Society, 1915, 1938.

" " Oriental Research, Vol. XVIII.

New Indian Antiquary, Vols. V, VI, VII (Nos. V, VI)

Our Heritage, (Calcutta Sanskrit College Journal), Vols. I, II.

শ্লোক-সূচী

[সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠার নির্দেশক। পাদটীকা তারক চিহ্ন দ্বারা সূচিত হইয়াছে।]

নাম-সূচী

[বাঙ্গালী নিবন্ধকার ও তদ্রচিত গ্রন্থাবলী এই সূচীর বিষয়ীভূত হইল। বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধগুলির টীকার এবং বাঙ্গালী নিবন্ধকারগণ-রচিত স্মৃতি ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ক গ্রন্থের উল্লেখ করা হইল না। বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টগুলি এই সূচীর অন্তর্ভুক্ত হইল না। সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠার এবং তারকা-চিহ্ন পাদটীকার নির্দেশক।]

গ্রন্থকার

গ্রন্থ

শুদ্ধিপত্র

পৃঃ	পংক্তি	আছে	হবে
১০	৪	শবস্মৃতিকা0	শবস্মৃতকা0
১৩	পাদটীকা ৪	তেজশচন্দ্র	তেজশ্চন্দ্র
১৭	১২	১৬ শতকের	১৬শ শতকের
”	পাদটীকা ১	পঃ	পৃঃ
১৮	১২	রগনন্দন-যুগ	খ। রঘুনন্দন-যুগ
২৩	পাদটীকা ৩	সোসাইটি	সোসাইটির ক্যাটাল'
২৭	১৯	বালবলভি	বালবলভী
২৯	১১	স্মর্তব্যবস্থার্ণব	স্মার্তব্যবস্থার্ণব
৩০	১০	ভট্টচার্য	ভট্টাচার্য
৩২	১৮	শুদ্ধিচন্দ্রীলোক	শুদ্ধিচন্দ্রালোক
৪৯	১৬	গুরুগৃহে	প্রচলিত গুরুগৃহে
৫৩	১	পৌনভবাঃ	পৌনর্ভবাঃ
৬৩	১২	মাতামহ	পিতামহ
৭২	২১	আশ্রমকে	আশ্রমগুলিকে
৭৩	২৪	হয়	হয়।
”	২৫	কর্তব্য	কর্তব্য।
৯০	৩	রুক্ষ	রূক্ষ
৯৭	১৪	অন্ত্যজের	অন্ত্যজের,
১০১	১১	বচনাদি	বচনাদি
১০৪	৪	পূজার স্থান	পূজার অযোগ্য স্থান
১০৯	৪	বশ্বাস	বিশ্বাস
”	১০	অনার্ষ	অনার্য
১১০	৫	বভিন্নতা	বিভিন্নতা
১১৪	পাদটীকা	নাস্তাস্মিন,	নাস্তাস্মিন

পৃঃ	পংক্তি	আছে	হবে
১১৬	৭	হইয়াছে	হইয়াছে।
১৩৭	৫	বিবাদপদ সাধারণ কথা	সাধারণ কথা—বিবাদপদ
১৪২	৪	জড়বুদ্ধ	জড়বুদ্ধি
১৭০	শেষপংক্তি	ভুর্জপত্রে	ভূর্জপত্রে
১৮৪	১০	বধবা	বিধবা
১৯৬	৫	ব্রাহ্মণ্যধর্ম	ব্রাহ্মণ্যধর্মের
১৯৭ পাদটীকা	১	বুলালের	বুলারের
২১২	৫	বানপ্রস্থ	বানপ্রস্থ্য
„ পাদটীকা	২	বিফুজ্যতে	বিযুজ্যতে
২১৫	৩	অদ্যাবিধ	অদ্যাবধি
২২১ পাদটীকা		Thaknr	Thakur
২৮৪	৫	বিবাদে	বিবাদের
২৮৭	৭	প্রাবরাধ্যায়	প্রবরাধ্যায়
২৯২	৭	স্বীক্রীয়তে	স্বীক্রিয়তে